মানুষের দরবারে

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

—প   ্রের সাহেব…

—   রাজ….

—   লিক…

   লম্বরদার (মোড়ল) সাহাব…

াথা-বিকনো গাঁয়ের পড়শীদের এই বিনম্র সম্ভাষণ
র পর্দা ছাড়িয়ে মগজ বা বুকের দিকে বিশেষ এগোয়
নি অভ্যস্ত যে, কে প্রণাম জানালো সব সময় লক্ষ্যও
াধান 'পঞ্চ'-এর প্রধান আর গাঁয়ের ভূস্বামীদের মধ্যে
ষ হিসেবে এই স্তুতি তার প্রাপ্য। ওরা ওদের কর্তব্য
লে সেটা চোখে পড়তে পারে। করলে সেটা আর
কি ? আর কর্তব্য করবে না এমন হিম্মতই বা কার ?
 বা অচ্ছুত কেউ সামনে পড়ে গেলে শশব্যস্তে সেই
ছায়ার নাগাল থেকে সরে দাঁড়িয়ে আনত হয়। তারা
রাজের ছায়া মাড়িয়ে ফেললে সেটা প্রায়শ্চিত্ত করার
রাধ।

ই সব নিচের সারির মানুষেরা তাদের যে মাথা কাটার
লাকটাকে ইদানীং যেন একটু সদাশয় আর উদার
ও দেখল। একজনের দিকে মালিক বড় বড় দু' চোখ
ন চাউনিতে শুধু ঠোঁট নয়, পরিপুষ্ট কুচকুচে কালো
গাতেও একটু বাৎসল্যের হাসি চিকিয়ে উঠল। পরের
াতি-নমস্কারের স্বীকৃতি দিল। তার পরের জনকে সদয়
া বলল। আর পায়ে পড়ি বলে যে-লোকটা নতি
, মালিক তাকে কিনা খুব মোলায়েম করে আশীর্বাদ
া, হামারা আশিস তুমহারা পর রহল্অ।
িয়ে চলে যাবার পরেও লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে

তাকে দেখছিল।

প্রবল-প্রতাপ মহারাজের এই সদয় আচরণ দেখে তারা আবার ঘাবড়েও যায়। যারা ভুক্তভোগী তারা জানে কারো স- বা ঘাড় মটকাবার মতলব আঁটলে ঠাকুর ব্রিজমোহনের গোঁ গোঁফ জোড়ায় আর চোখের তারায় মোলায়েম হাসির ঝলক দে মুখে অমায়িক বচন শোনা যায়। তখন মনে হয় মানুষটার ভিতরে এ ছুরির ফলা ঝিকমিক করছে। যার দিকে অমন নজর তার তখন হৃৎব জানে মরবে কি ঘর পুড়বে; কি সুডৌল মেয়ে বা বউয়ের ইজ্জতে পড়বে এই আশঙ্কায় কণ্টকিত। ওদের মতো লোকের ঘরে সুঠাম সু মেয়ে বউ থাকাটাও অভিশাপ। রাশভারী ভূস্বামী ব্রিজমোহনের ওপর নজর লাগল সেটা এক ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাক-পক্ষীরও জা উপায় নেই। তার ভোগের সুড়ঙ্গ-পথ নিশ্ছিদ্র। কিন্তু বশম্বদ ইয়ার-ব এমন কি নিজের দামাল ভাইপো বাবুয়ার ভোগের ব্যাপারেও এই ঠাকু সাহেব উদাসীন একটুও নয়। তাদের নজরে পড়লেও সুশ্রী মেয়ে বউয়ে ইজ্জত ঘরের মরদের হাতে থাকা কঠিন। বেশি জানাজানি কানাকানি হলে জানোয়ারদের ভোগের আগুনে ইজ্জত আহুতি দিয়ে কেউ নিঃ ফিরে আসে, মুখ বুঁজে ঘর করে বা ঘরে থাকে। তাদের মরদে বুদ্ধিমানের মতোই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। এটা তারা ওপরওয়া মার ভাবে। আরো বড় মার, এ-রকম ঘটনায় কাউকে নিয়ে নিজে মধ্যেই বেশি চেঁচামেচি হৈ-চৈ পড়ে গেলে সেই মেয়ে বা বউয়ের ঘরে ফেরা হয় না। ভোগের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা তাদে বাড়ি অর্থাৎ পতিতালয়ে চলে যেতে হয়।

দুগ্রহের মতো এমন লোকের হঠাৎ দিল বদল হয়ে এ এই গাঁওয়ের কোন গরিব অচ্ছুত বা মেহনতী মানুষ বিশ্বাস করবে! এই নরম হাব-ভাব আচরণ গাঁও-ভর মানুষের প্রতি হুঁশিয়ারির মুখে তো ভাবা যায় না। গ্রামসুদ্ধ মানুষের সে সর্বনাশের মতলব আঁট বা হয় কি করে! দু'জন পাঁচজন তো নয়, খুব ছোট, ছোট আর সব স্তরের লোকের ওপরেই তার পাথুরে বুকে যেন স্নেহের

গড়িয়েছে। আগে এই সব লোক মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে নত্তি জানালেও
দাঁড়ানো দূরে থাক, মুখের দিকে চেয়েও দেখত না। সেই লোকই কিনা
এখন প্রণাম নমস্কার রাম রাম বা গোড়-পড়ির জবাবে ডাগর দু' চোখ
তুলে তাকায়, ে হ্র ভাব উপছে ওঠে, মিঠা মিঠা হাসে, অল্প অল্প মাথা
নেড়ে পাল্টা সম্মান ে নায়, এমন কি কারো ভাগ্যে থাকলে দাঁড়িয়ে গিয়ে
তার ঘরের কুশল খবরও নেয়।

এই নিয়ে চিরদিনের ভাগ্যহীন মানুষদের নিজেদের মধ্যেই আলোচনা
হয়, জটলা হয়। ভয়ংকর এই মানী জনের হঠাৎ এমন ভোল-বদল কেন?
ইলিকশন না কি বলে তা-ও তো আর চার বচ্ছরের মধ্যে নেই শুনেছে।
এই তো গেল বছরে বেশ শোরগোলের মধ্যে সেটা হয়ে গেল। ইলিকশন
মানে ভোটের লড়াই। গাঁয়ের লোকেরা এ লড়াই আরো দু একবার
দেখেছে। বুড়োরা আরো বেশি দেখেছে। কিন্তু গেল বারের মতো উত্তেজনা
আর কখনো দেখা যায়নি। আগে আগে যা হয়েছে তাতে খুব একটা হৈ-
চৈ ছিল না। গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে কে ভোটের কাগজে ছাপ মারল আর
কে ঘরে বসে থাকল তা নিয়েও কারো খুব মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু
গেল বারে যে গরম কাণ্ডখানা হয়ে গেল তা আর কখনো হয় নি। এই
লড়াই ছিল মামা-ভাগ্নের লড়াই। ঠাকুর ব্রিজমোহনের সঙ্গে তার নিজের
ভাগ্নের লড়াই। সেই একটা সময়ে ব্রিজমোহনের নরম মুখ দেখেছিল
আর মিষ্টি কথা শুনেছিল সকলে। কেবল এই ছুপা গাঁওয়ে নয়, আশ-
পাশের গ্রামগুলোর অচ্ছুত পাড়ায় পর্যন্ত তাকে ঢুঁড়তে দেখা গেছে। আর
তার মুখে তখন আশমানের চন্দা এনে দেবার মতো আশার কথাও শোনা
গেছে। বেশি ভোে ছাপ পেয়ে গাঁয়ের মানুষদের হয়ে সে 'ছেম্‌ব্লির
মেম্‌বর' হয়ে যেে ারলে তাদের এত কালের জলের কষ্ট দূর হবে, সব
অচ্ছুত পাড়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে সে দু তিনটে করে টিপকল
বসানোর টাকা আদায় করবে, একটা দুটো পুকুর কাটার ব্যবস্থাও হবে,
চাষের মজুরির হার নিয়ে ার কোনরকম গণ্ডগোল হবে না— ...ভু হাব ...াশূন্য ভাতিজা
কত ভালো ভালো কথা। । মাস কয়েক
...বিশ্বাস করুক বা না করুক গাঁয়ের মানুষদের ভো ...ন-তখন যেখানে-
ধরে

সেখানে হানা দেওয়া কমেছে। আশ-পাশের অনেক গাঁয়ের লোকই সর্বদা তার আর তার ভূমি-সেনা দলের ভয়ে কাঁটা। গরিবেরা তাদের ক্রোধের শিকার নয়তো লোভের শিকার। তারও স্বভাব বদলেছে আর চরিত্র বদলেছে এ কখনো হয় নাকি! বিষের থলে থেকে বিষ টেনে নেওয়া সম্ভব হলে কেউটে-গোখরোর মতো ভয়ঙ্কর সাপও নাকি আবার বিষ না গজানো পর্যন্ত মিইয়ে থাকে। এই চাচা-ভাতিজারও তেমনি কিছু একটা হয়েছে মনে হয়। কিন্তু কি-ই বা হতে পারে? ছুপার বাতাস বদলে যাবার মতো কিছু তো ঘটেনি, আর পুনপু নদীর জলও এক-ই রকম বইছে।

…মাস ছ'সাত আগে পঞ্চ-এর খুব বড় একটা বৈঠক অবশ্য বসেছিল মহাবীরজীর মন্দিরের সামনের শালতলার মস্ত আঙিনায়। পঞ্চ নয়, সরপঞ্চ বলা যেতে পারে সেটাকে। এমনি বৈঠকের থেকে অনেক বড় ব্যাপার। পঞ্চের ছোট-বড় সব বৈঠকই ওখানে হয়। সেই বিচার সভায় হাজির থাকার হুকুম এলে অচ্ছুত অথবা গরিব চাষী মজুররা ভয়ে কাঁপে। কোন্ অপরাধে কার ঘাড়ে কোপ পড়বে বলে এই তলব কেউ জানে না। পঞ্চ-এর পাঁচ মাতব্বরকে পাঁচ পাঁচটা জ্যান্ত বাঘ মনে করে গাঁয়ের সাধারণ মানুষেরা। এদের আসল মোড়ল বা মাথা ব্রিজমোহন তো বটেই, কিন্তু পঞ্চ-এর বৈঠকে সে কখনো মুরুব্বির আসনে বসে না। বৈঠকের সেই আসন মন্দিরের প্রধান সেবক জনার্দন পূজারীর জন্য বাঁধা। টাকা আর প্রতিপত্তির জোরেই ব্রিজমোহন "ঠাকুর সাহেব"। গরিব গ্রাম-বাসীদের মুখে ওটা মস্ত মর্যাদার সম্ভাষণ। কিন্তু আসলে সে ঠাকুর নয় ছত্রী। সব জাতকে টেক্কা দিতে পারে এমন উঁচু বর্ণের ছত্রী নাকি। পঞ্চ-এর বৈঠকে মুরুব্বির আসন সে যে জনার্দন পূজারীকে ছেড়ে দেয় এটা তার শিক্ষা ভদ্রতা আর বিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সকলেই জানে, জাত-পাতের গুরু ঠাকুর ওই জনার্দন পূজারী ব্রিজমোহনের হাতের পুতুল। নিজে সাধু সেজে তাকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কলকাঠি নাড়ার সুবিধে। পরের দু'জন মহাবীর প্রসাদ আর জগদেও মিশির। ব্রিজ-মোহনের পরে দু'জনেই এরা শাঁসালো জোতদার। আর পঞ্চ-এর পঞ্চম মাতব্বরটি হল ইট সিমেন্ট চুন সুরকি আর লোহা লক্কড়ের শাঁসালো

কারবারী গণপত লালা। এই তিনজনও ব্রিজমোহনের পিয়ারের মানুষ এদেরও সে-ই পঞ্চ-এ টেনেছে।

···তা এবারের মতো মহাবীরজীর মন্দিরের সামনে পঞ্চ-এর এত বড় বৈঠক অবশ্য গাঁয়ের মানুষ শিগগীর দেখেনি। সেটা কোনো বিচার বিধানের বৈঠক ছিল না। সেই বৈঠকে গাঁয়ের সমস্ত মহল্লার সর্দার আর তাদের সাগরেদদের ডাক পড়েছিল। এমন কি খেটে-খাওয়া সর্দারনী আর অচ্ছুত পাড়ার বুড়ো আধ-বুড়ো মোড়লরা আর তাদের বউরাও বাদ পড়েনি। পরে অবশ্য এরকম একটা বৈঠকের কারণ সকলেই বুঝেছে। গত দু' আড়াই বছর ধরে গ্রামে গ্রামে চাষী মজুরদের ওপর ভূমি-সেনাদের অকথ্য অত্যাচারের খবর দিল্লিতে বড় সরকারের কানেও পৌঁছেছে। জর্জরিত শোষিত মানুষরাও নিরুপায় হয়ে কোথাও কোথাও পাল্টা বিদ্রোহ করেছে, লাহসুনায় একজন অত্যাচারী ভূস্বামীকে খুন করেছে। তার জবাবে ভূমি সেনারা সেখানে খুনের হোলি খেলেছে আর আগ লাগিয়ে দেওয়ালির রোশনাই ছুটিয়েছে, লুঠ আর ধর্ষণের উৎসব লাগিয়েছে। মাসাউরহি আর জাহানাবাদে চাষী মজুরদের প্রতিবাদের জবাবে ভূমি সেনারা রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে। এইসব খুনের সঙ্গে ধর্ষণেরও অবধারিত যোগ—যুবতী মেয়ে বউ ছেড়ে কিশোরীদেরও রেহাই নেই। কত জায়গায় কত হরিজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পাটনার কাছেই বানওয়ারা গ্রামে পাঁচজনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। এ-সব খবরও দিল্লির বড় সরকারের কানে তোলার লোক আছে গ্রামবাসীরা জানত না। কিন্তু দেখা গেল আছে। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে নাকি এই সরকারের একটু টনক নড়েছে। তাই তত্ত্ব-তল্লাসি শুরু হয়েছে। গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে বৈঠক বসছে, তাতে চাষী-মজুর-হরিজন প্রধানদের ডাকা হয়েছে। সরকারের কর্তা-ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত। গরিবদের নালিশ আর অভিযোগ শুনতেই তাদের আসা, তাদের অসুবিধের কথা জানতে আসা, কারো ওপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন হয় কিনা খবর নিতে আসা।

যাদের ডাকা হয়েছিল সকলেই তারা সেই সভায় গিয়েছিল বইকি। সকলকে এনে হাজির করার দায়িত্ব পড়েছিল ব্রিজমোহনের ভাতিজা

বাবুয়ার ওপর। না গিয়ে পারে! সরকারের কর্তারা তাদের অভয় দিয়ে বলেছিল, সত্যি কথা বলার জন্য কারো ওপর কোনরকম নির্যাতন হবে না এই দায়িত্ব সরকারের। অতএব যার যা বলার নির্ভয়ে বলতে পারে। জনার্দন পূজারীর আগে থাকতে শেখানো বুলি তারা নির্ভয়েই বলে এসেছে। চাষী মজুররা তাদের ন্যায্য পাওনাই পাচ্ছে, এখানকার ভূস্বামীরা তাদের ওপর সদয়, ভূমিসেনারাও গরিবদের স্বার্থই দেখে, তাদের পাওনার ওপর ভাগ বসায় না বা কম মজুরীতে কাউকে কাজ করতে বাধ্য করে না। অচ্ছুতরাও এক বাক্যে স্বীকার করেছে, এই গাঁয়ে জাত-পাত নিয়ে কোনো গোল নেই, হামলা নেই—যেটুকু সংস্কার সে-টুকুই কেবল আছে, বিপদে আপদে ঠাকুর মহারাজ মালিক আর লম্বরদার সাহেবরা আপনার জনের মতোই তাদের ওপর সদয়!

ব্যস, সেই প্রহসন সেখানেই শেষ। ওই 'মিটিন'-এর কতটুকু দাম তা গাঁয়ের গরিবরা যতটুকু জানে, ব্রিজমোহন তার থেকে বেশি ছাড়া কম জানে না। তার পরেও তার ভাতিজা চাষী মজুরদের কাছ থেকে ভূমি-সেনাদের প্রাপ্য কর আদায় করেছে। এর পরেও অচ্ছুত ঘরের দুই একটা নতুন বয়সের মেয়ে ওদের ভোগের বলি হয়েছে। ফলে ছ'সাত মাস আগের সেই 'মিটিন'-এর জন্য ব্রিজমোহন বা তার ভাতিজা বাবুয়ার গরম মেজাজ ইদানীং একটু নরম দেখছে, এ-রকম ভাবার কোনো কারণ নেই।

…তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে? এটাই সকলের কখনো নির্বাক আর আপনজনের জটলায় সবাক জিজ্ঞাসা।

ব্রিজমোহন কখনো একটু স্নেহের চাউনি বিলিয়ে, কখনো একটু সদয় হেসে, কখনো সামান্য মাথা নেড়ে আর কখনো বা দুই এক কথায় কুশল জিজ্ঞাসা করে নয়তো আশীর্বাদ জানিয়ে আনত অনুগ্রহভাজনদের আপ্লুত করে পায়ে পায়ে যে মস্ত জমিটার দিকে এগিয়ে আসছিল, সেই জমি পনেরো মাস আগেও তার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। একটু আধটু নয়, কম করে চৌদ্দ বিঘের জমি। অন্যত্র তার আরো যে-সব জমি আছে সে তুলনায় এই হিসেবের চৌদ্দ বিঘে বলতে গেলে কিছুই নয়। চাষ

আবাদের আরো ঢের জমি আছে তার। জমি ছাড়াও তার মতো অত বড় খাটাল আশপাশের চার পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে আর কোনো ভূস্বামীর নেই। সেই খাটালের দুধ দই ননী কাছাকাছির আধাশহরগুলোতে চালান যায়। এগুলি সেখানে খুব জনপ্রিয়। অনেক টাকা আসে। তাই চোখের সামনের এই চৌদ্দ বিঘে সোনা-ফলানো জমি ভারত সরকারের দখলে চলে গেল বলে আর্থিক ক্ষতিটাই তার মনস্তাপের কারণ নয়। তাছাড়া হিসেব কষলে এই আর্থিক ক্ষতিও খুব কিছু নয়। জমির মোটা-মুটি ন্যায্য দাম ধরেই সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ মিলেছে। কিন্তু নিজের হাতে থাকলে এর চার গুণ দাম পেলেও ব্রিজমোহন কি এই জমি বিক্রি করার কথা একবারও ভাবত ? উল্টে এ-রকম প্রস্তাব নিয়ে যে আসত তার ঘাড়ের ওপর মাথা থাকত কিনা সন্দেহ। ঘরের ভাগ্য-লছমীকে কেউ যদি টাকা দিয়ে কিনতে চায় এমন দুঃসাহস বরদাস্ত করার মানুষ ব্রিজমোহন নয়।

কিন্তু তাই হয়েছে। সব থেকে পিয়ারের জমি হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এ জমি ধরে রাখতে ব্রিজমোহন সাদা রাস্তায় হেঁটেছে, কালো রাস্তায়ও হেঁটেছে। এটা এই রাজ্যের অর্থাৎ বিহার সরকারের প্ল্যান হলে ব্রিজমোহন তুড়ি মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারত। টাকা ঢাললে এ-রাজ্যে কি না হয়। ভূ-স্বামীদের হাতে রেখে ভোটের দরিয়া কে না পার হতে চায় ? অবশ্য এই দরিয়া পার হতে গিয়ে এবারে তার নিজের নৌকোই ডুবেছে। সেটা ভিন্ন ব্যাপার, ভিন্ন চক্রান্ত। কিন্তু এই জমি দখলের পরোয়ানা যার হাতে সে এখানকার সরকার নয়, খোদ ভারত সরকার। গাঁয়ের যত প্রবল-প্রতাপ মানুষই হোক, তার সঙ্গে লড়াই আর কতটুকু সম্ভব ?

ওই জমির যত কাছে আসছে ব্রিজমোহন, তার বড় বড় দু'চোখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠছে।

এটা তার মস্ত মোকামের লাগোয়া জমি বলা যেতে পারে। বাড়ি থেকে পঞ্চাশ ষাট গজ এগোলেই এই সুফলা'জমির শুরু। এই পয়মন্ত জমি পনেরো মাস আগে পর্যন্ত তার দৌলতের নিশানা উড়িয়েছে।

সকলেই জানতো শীতের আঘনী ফসল, বসন্তের রবি ফসল, আর ভাদোই-য়ের হরিৎ ফসলের যৌবনে ঝলমল ওই জমির পরেই ঠাকুর ব্রিজমোহনের মোকাম। মোকামের সামনে মস্ত উঠোন, তার এক কোণে বড় আর গোল করে বাঁধানো তুলসী মঞ্চ, বারো মাসই এই মঞ্চে তুলসীর তরতাজা ঝাড়। আঙ্গনার (উঠোন) চারদিকে ইটের বড় বড় ঘর, সিমেণ্টের মেঝে, রক্তবর্ণ ঝকঝকে টালির ছাদ। মোকামের একটা দিক আবার কোটা মানে দেড়তলা। কোটার একতলার ছাদ পোড়ামাটির, দোতলার টালির। আঙ্গনার একদিকে সকলের জন্য আলাদা আলাদা বাসের ঘর, সব থেকে বড় আর ভালো ঘরটা অবশ্যই মালিক মহারাজের। আঙ্গনার অন্য দিকের ঘরগুলোতে ধান চাল সাফাই গম সরষে চাষের অন্যান্য ফসল আর আনাজ ঠাসা থাকে। গরিব বা নিচু জাতের মেয়ে বউরা অপরাহ্নে আঙ্গনায় বসে ফসল ঝাড়াই বাছাই করে দিয়ে যায়। ঠাকুরাইন হেলে দুলে এসে এসে তাদের কাজ তদারক করে, কখনো সে-ও তাদের সামনে মেচিয়ার ওপর বসে যায়। ওদের কাজের হাত তখন তৎপর হয়, আর ঠাকুরাইনের মেজাজ বুঝে তারা গলা মিলিয়ে ফসল তোলা বা ফসল ঝাড়াইয়ের গান শোনায়। এখনো এর ব্যতিক্রম হয়নি বটে, কিন্তু সামনের ওই ভরা যৌবন জমির ফসল আর পুরবাইয়ার (পূবের বাতাসের) মাতোয়ারা মিতালির ঝর-ঝর সড়-সড় শব্দ-রোমাঞ্চের যোগ-বিহনে এই গানে আগের সেই আমেজ আর আসে না। ছোলাছুলি বা হঠাৎ দমকা বাতাসে এই গরিব বউ ঝিউড়ীদের বসন আর বেসামাল হয় না। হাতের কাজ বজায় রেখে, মুখের গান বজায় রেখে বসন সামলাতে গিয়ে আর তারা হেসে কুটিপাটি হয় না, শরীফ মেজাজ ঠাকুরাইনও কারো দিকে কটাক্ষপাত করে বলে ওঠে না, এ গোরী—সামাল লে আঁচরোয়া, কোই কউয়াকা আঁখ না লাগে।

গোরী বলতে সুন্দরী যুবতী মেয়ে। ঠাকুরাইনের চোখে তখন সব সুন্দর, পৃথিবীটাই যুবতী। তাই পল্‌কা ভ্রূকুটি করে আঁচল সামলাতে বলে। কোনো কাকের চোখে পড়লে ঠুকরে শেষ করবে।

আজ সামনের সেই জমির সবুজের বাহার শেষ। সেই সঙ্গে বহুয়া

(মানী) ব্রিজমোহনের মান-ইজ্জতগার মাতোয়ারায় এখন ওই খোঁড়া-খুবলনো জমি থেকে কেবল ধুলো ওড়ে, সেই ধুলোতে মোকামের তকতকে আঙ্গনা ছেয়ে যায়, ঘর নোঙরা হয়।

কিন্তু ইদানীং ব্রিজমোহনের আচরণ বদলানোর হেতু তার এই সাধের জমি সরকারের দখলে চলে গেছে বলেও নয়। এর ফলে উল্টে তার ভিতরটা আরো হিংস্র হয়ে ওঠার কথা। তাই হয়েছে।

তার হাব-ভাব চাল-চলন একটু নরম হতে দেখা যাচ্ছে অন্য কারণে। তার মনের তলায় একটা চক্রান্তের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই চক্রান্তের পিছনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে কল-কাঠি নাড়ছে, সে লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ ঠাকুর কুন্দন সিং। শুধু লোহার গাঁও কেন, অন্য সব লাগোয়া গ্রামের লোকও তাকে লোহার মানুষ বলেই জানে। এ-দিকের সমস্ত তল্লাটের মধ্যে ভূস্বামী হিসেবে সে-ই সব থেকে বড় আর সব থেকে ধনী জাঁদরেল পুরুষ তাতে কারো সন্দেহ নেই। বছর ছাপ্পান্ন সাতান্ন হবে বয়েস, ব্রিজমোহনের থেকে কম করে দশ এগারো বছরের বড়। এরমধ্যে ওই লোহার মানুষের একটা হার্ট অ্যাটাকও হয়ে গেছে। কর্তব্যের দায়ে তখন আর পাঁচজন ভূস্বামীর মতো মুখে বিষাদ আর উৎ-কণ্ঠার প্রলেপ মাখিয়ে ব্রিজমোহনও তার মহল্লায় ছুটে গেছে। কয়েকটা দিন সেখানে থেকেও গেছে। পাটনা থেকে দু'জন বড় ডাক্তার আনিয়ে তার চিকিৎসা চলছিল। সেই ডাক্তারদের মুখেও খুব একটা আশ্বাসের কথা শোনেনি কেউ। ব্রিজমোহনও আশা করেছিল শিউজী আর কিষেণ-জীর কিরপায় ভূস্বামীদের মধ্যে এবারে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে, তার ক্ষমতার পতাকা সব-থেকে উঁচুতে উড়বে।

…তা হল না। ওই লোহার মানুষ বেঁচে গেল। বেঁচেই শুধু গেল না, দেখতে দেখতে আগের মতোই তরতাজা হয়ে উঠল। এই ছাপ্পান্ন সাতান্ন বছর বয়সেও তার মেজাজ আর চালচলন ছাব্বিশ সাতাশের মতোই।

অবস্থাপন্ন ভূস্বামীদের কেউ তেমন লিখি-পড়ি জানা লোক নয়। সে-তুলনায় ব্রিজমোহন বিদ্বান মানুষ। একটা পরীক্ষায় পাশ দিয়ে কিছু-দিনের জন্য কলেজের মুখও দেখেছিল। কিন্তু কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে তুলনায়

করলে এ-দিক থেকেও সে কিছুটা নিষ্প্রভ। কুন্দন সিং বি. এ. পাশ। দিগ্‌গজ গ্র্যাজুয়েট। আর যে ভাগ্নের কাছে গেলবারে ব্রিজমোহন অবিশ্বাস্যভাবে ভোটে হেরে গেল, সেই পবনকুমার তো একেবারে এম-এ পাশ। এ-ও যে ওই ভাগ্নের সঙ্গে কুন্দন সিংয়ের যোগসাজসের ফল তা কি ভাবতে পেরেছে? নইলে কি এমন ছাত্র ছিল ওই ভাগ্নে, তার মতোই সেকেণ্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল, আর তারপর শহরের হস্টেলে থেকে মামার টাকার জোরে মাতব্বরি করে যাচ্ছিল। ব্রিজমোহনের সব থেকে বড় ভুলটা সেখানেই হয়ে গেছে। কান ধরে তখন তাকে ক্ষেত-খামার দেখার ভার দিয়ে নিজের চোখের সামনে রাখা উচিত ছিল। তা না করে তার ইচ্ছে বুঝে লেখা-পড়া করার স্বাধীনতা দিয়েছিল।

…বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত ভাগ্নে পবনকুমার সব ছুটি-ছাটাতেই গাঁয়ে আসত। তখনো কি ব্রিজমোহন বুঝেছে দুধ-কলা খাইয়ে কাল-সাপ পুষছে সে! গ্রামে আসত, হৈ-চৈ করে ফুর্তি করে বেড়াতো, আশপাশের গাঁয়ে গিয়েও ছোট-বড় সকলের সঙ্গে ভাব জমাতো। আবার লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের মোকানেও যাতায়াত করত। ব্রিজমোহনের প্রধান চর আর অনুচর তোতারাম সেই তখনই একটু সতর্ক হবার মতো আভাস দিয়েছিল, বলেছিল, কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে ভাগ্নের বেশ ভাব-সাব দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বসে দিব্বি গপ্প-টপ্প করতে দেখে। তোতারামের ওই-রকমই বোকা-বোকা বলার ধরন, কিন্তু লোকটা যে কত তুখোড় চালাক তা ব্রিজমোহনের থেকে এখন কে আর বেশি জানে। কিন্তু তখন তার কথায় কান দেয়নি। ভাগ্নে এখানে এলে আট ক্রোশ সাইকেল ঠেঙিয়ে লোহারগাঁওয়ে যেত কুন্দন সিংয়ের ছোট ভাইয়ের কাছে পড়তে। সেই ছোটভাই তখন পাটনায় ভাগ্নের কলেজের মাস্টার। ওই মাস্টার ভাইও কলেজ ছুটি হলে লোহার গাঁওয়ে দাদার কাছে আসে। ভাগ্নের সেখানে যাবার ব্যাপারে কারো আপত্তি নেই কারণ বড় তরফের ঘরের খবর আর তার মতলব জানতে বুঝতে সুবিধে হয়।

…ব্রিজমোহনের টনক কিছুটা নড়েছিল ভাগ্নে পবনকুমার এম. এ.

পাশ দিয়ে বেরুবার আগেই। তখনই গাঁয়ের চাষী-মজুরদের প্রাপ্য ঠিক-ঠিক না দেওয়া আর অচ্ছুতদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মামা-ভাগ্নের কথা কাটাকাটি হয়েছিল। ঝগড়া আরো চরমে উঠেছিল মামাতো ভাই বাবুয়াকে অত আস্কারা দেবার জন্য। ভূমি-সেনার দল নিয়ে তাদের স্বার্থ দেখার নামে তার অত্যাচার বরদাস্ত করতে চায়নি। তারপর থেকেই ভাগ্নে মামাবাড়ি আসা ছেড়েছে। পাটনায় সেইসময় থেকেই সে চাষী মজুর অচ্ছুত হরিজনদের হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে, জায়গায় জায়গায় গিয়ে তাদের দাবি নিয়ে গরম-গরম বক্তৃতা করছে, ভূমি-সেনাদের এককথায় শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে। ছুপা গাঁওয়ের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে না হোক, একেবারে লাগোয়া গ্রামগুলোতে গিয়েও নিজের মামার আর তার ভূমি-সেনাদের অত্যাচার নিয়ে বক্তৃতার ঝড় তুলেছে। কিন্তু কখনো লোহার-গাঁও বা তার আশপাশে গিয়ে পাণ্ডাগিরি করেনি বা কুন্দন সিংয়ের গায়ে কোনরকম হুল ফোটাতে চেষ্টা করেনি। তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। অথচ কুন্দন সিংয়ের ভূমি-সেনার সংখ্যা ব্রিজমোহনের দেড়গুণ হবে।

…তখনো ছুটিছাটায় সে মামাবাড়ি আসেনি, কিন্তু ব্রিজমোহনের পাকা খবর, লোহারগাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের মোকামে সে ছুটি কাটাতে এসেছে। তখন তার ভাইয়ের কাছে পড়তে আসার কোন প্রশ্ন নেই। সেই মাস্টার ভাই পাটনার কলেজে তখন আর মাস্টারিও করছে না। ততদিনে সে দিল্লির লোকসভায় গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। সেটা রাজ্যের বিধানসভার মতো ছোটখাটো ভোটের ব্যাপার নয়। আট-দশ লক্ষ লোক নিয়ে সেই ভোটের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে নাকি বড়দরের সেনাপতির কাজ করেছে ব্রিজমোহনের এই ভাগ্নে। কপাল বটে কুন্দন সিং লোকটার, এতবড় ভোটযুদ্ধে জিতে তার ছোটভাই কিনা দিল্লির শাসক দলের মেম্বর। সেই জোরে লোহারগাঁওয়ের কুন্দন সিং আরো শক্ত-পোক্ত লোহার মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে।

…ভাগ্নের বেচাল দেখে, বিশেষ করে তার ভূমিসেনাদের বিরুদ্ধে লোক খেপানোর চেষ্টা দেখে শুধু ব্রিজমোহন কেন, ছোট-বড় সব ভূস্বামীদেরই

শিরায় রক্তে আগুন ধরার কথা। সকলেরই এই ভূমিসেনারা প্রধান বল। সব জাতের মেহনতী মানুষদের পদানত করে রাখার এরা সেরা যন্ত্র। পরোপকারের মুখোস পরে সন্ত্রাসের অস্ত্র ঘুরিয়ে ভূস্বামীদের বনিয়াদ এরাই নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন রাখে। ব্রিজমোহন কাজের অছিলায় আর ছেলেদের দেখার অজুহাতে পাটনায় এসেছে। তার দুই ছেলেই পাটনায় হস্টেলে থেকে স্কুলে পড়ে। এসেছে যখন, ভাগ্নের সঙ্গেও দেখা করেছে। মাথা গরম করে ফল হবে না সেটা বোঝা হয়েছে। তার কুশল আর পড়াশুনার খবর নিয়ে স্নেহের বকুনির সুরে বলেছে, তুহার কা মতলব, কাহে তু এইসন চলত?

ভাগ্নের ফিরে মোলায়েম প্রশ্ন, এ মামা—হামারা কইসে চলনে পর তুহারা খুশ বাঢ়ে?

—হামরা খুশিয়াকে লিয়ে তু না শোচত, বোল, ঠাকুর কুন্দন কেয়সে তুহারা আপন হইলন? তু না জানত ও কইসন্ আদমী?

এবারে তার মুখের ওপর ভাগ্নের স্পষ্ট জবাব, সে কেমন লোক খুব ভালো করেই জানি, খুব কঠিন লোক, কিন্তু তোমার থেকে ঢের সাচ্চা লোক।

এরপর এমন ভাগ্নের মুখ দেখাও পাপ। ব্রিজমোহন উঠে এসেছে।··· কুন্দন সিংয়ের মতো সে লোক-দেখানো ভাঁওতাবাজী কিছু করেনি সত্যি কথা। গরমি কালে ওটা করে লোহারগাঁওয়ের গরিব আর অচ্ছুত পাড়ায় দুটো কুঁয়া আর দুটো টিপ-কল করে দিয়েছে নিজের ভূমিসেনার তদারকিতে, একটা 'পুকুর' কেটে দিয়েছে, আর একটা পাঠশালা করে দিয়েছে যেখানে অচ্ছুতদের ছেলেমেয়েরাও ফারাকে বসে পড়তে পারে। নাম হয়েছে কুন্দন সিংয়ের, কিন্তু এসবের বেশির ভাগ হয়েছে সরকারের টাকায় এ কি ওই ভাগ্নে হারামজাদা জানে না? পাঠশালার টাকা তো এসেছে তার ওই দিল্লির ভাইয়ের সুপারিশের জোরে। উল্টে কত টাকা নিজের হারেমে ঢুকেছে তার খবর কে রাখে?···যা কিছু হয়েছে, সবই করিয়েছে তার ভূমিসেনাদের দিয়ে, এটাই তার বড়রকমের চালবাজী। এমন ধূর্তমি ব্রিজমোহনেরও মাথায় আসেনি সত্যি কথা। নইলে সরকারের

টাকায় দুটো কুঁয়া আর দুটো টিপকল তো ছুপার পঞ্চ-এর মাতব্বরেরাও করে দিয়েছিল। সেসব খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে গেল সেটা গরিবদের ভাগ্যের দোষ ছাড়া আর কার দোষ!

…আর সাচ্চা লোক কুন্দন সিং? তার কত জায়গায় বাগানবাড়ি, কত জায়গায় কটা বেনামী মোকান, আর সেসব জায়গায় কতরকম মেহফিলের হুল্লোড় হত, বিলায়তি মদের বন্যা বইতো, কত বাঈওয়ালীর পায়েলের ঝংকার উঠত, আর কত গরিব গেরস্ত ঘরের সুন্দরী বউয়ের ঘুঙট্ খসত—সে খবর তোরা রাখিস?…কুন্দন সিংয়ের যখন বিয়ে, ব্রিজমোহনের তখন বছর বারো তেরো বয়েস। নেওতা পেয়ে সেও তো গেছল। নতুন বউ নয়তো গতরে যেন ছোট্ট একখানা হাতির বাচ্চা। কানা-কানি শুনেছে, কনের খুব ছোট বয়সে কুন্দনের বাপ নাকি মেয়ের বাপকে কথা দিয়েছিল ওই মেয়েকে বউ করে ঘরে আনবে। তাকে আনতে হয়নি, কারণ সে ততদিনে চোখ বুঁজেছে। বাপের কথার মর্যাদা রাখতে কুন্দন সিং নিজেই নাকি ওই মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে। লোকে তখন বাহবা দিয়েছে। কিন্তু অমন বউয়ে মন মজবে কুন্দন সিংয়ের? দেখতে দেখতে সেই বউ ফুলে ফেঁপে আরো ঢোল হয়েছে। একটা ছেলেপুলে পর্যন্ত হয়নি। ছোট ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাই তার ছেলেমেয়ে বলে উদারতা দেখায়। আর সাঁঝ্ লাগতে না লাগতে বাইরে ফুর্তি লুঠতে বেরোয়। এই বয়সেও কি তার চরিত্রখানা ধোয়া তুলসীপাতা নাকি! সব খবর রাখে তোতারাম। সেও লোহার গাঁওয়ের লোক ছিল। অবশ্য অনেক বছর আগেই সে ছুপায় চলে এসেছে। সে ছিল একদিকে কুন্দন সিংয়ের মোসায়েব অন্য দিকে ভাঁড়। তোতারামকে সবাই মজার মানুষ ভাবে, সকলেই পছন্দ করে। কুন্দন সিংও করত, এখনো করে। তার টানে তোতারামের এখনো লোহার গাঁওয়ে যাতায়াত খুব। এই যাতায়াতের আসল উদ্দেশ্য কেবল ব্রিজমোহন জানে আর তোতারাম জানে। ব্রিজ-মোহনের চরদের মধ্যে তোতারামের মতো সেরা আর ধূর্ত কেউ না। কুন্দন সিংয়ের হাঁড়ির খবর পেতে হলে তোতারাম রঙের টেক্কা। তাকে জিগ্যেস করলে কুন্দন সিংয়ের হালের চরিত্রেরও সরা-চাপা হাঁড়ি উল্টে অনেক

কেচ্ছা বার করে দেবে।

কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে ব্রিজমোহনের লোক দেখানো সম্পর্কটা খুব আপনারজনের মতো তো বটেই, আবার বড় ভাই আর ছোট ভাইয়ের মতোও। দেখা হলে ব্রিজমোহন নত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানায়, কুন্দন সিংও তাকে বুকে টানে। ভূস্বামীদের দরকারি জমায়েতে দেখা হয়, সামাজিক আদানপ্রদান উপলক্ষেও দেখা হয়, পালা-পার্বণে পরস্পরের কাছ থেকে ভেট আসে।···পাটনায় ভাগ্নের সঙ্গে ওইরকম কথা হবার পর ব্রিজমোহন তার বগ্‌গি (ঘোড়া) গাড়িতে চেপে বিনা উপলক্ষেই কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছল। নিজেদের মধ্যে যত রেষারেষিই থাক, স্বার্থে ঘা পড়ার সম্ভাবনা দেখলে সব ভূস্বামীরাই এককাট্টা। ভূমিসেনাদের গায়ে আঁচড় পড়ার সম্ভাবনা দেখলে তো বটেই। এদের স্বার্থ আগলানোর দায় কুন্দন সিংয়ের অন্য ভূস্বামীদের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়।

প্রাথমিক জড়াজড়ি কোলাকুলি আর কুশল বিনিময়ের পর ব্রিজমোহন কাজের কথায় চলে এসেছিল।···ভূমিসেনাদের নিয়ে খবরের কাগজে নানারকম রিপোর্ট বেরুচ্ছে, বানিয়ে বানিয়ে অত্যাচারের কথা লেখা হচ্ছে, পোলিটিক্যাল ধান্দাবাজরা যা-তা বলে আর বক্তৃতা করে চাষী মজুর হরিজনদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, এ নিয়ে একটু আলোচনার জন্যেই তার রহুয়ার কাছে আসা।

চিন্তাচ্ছন্ন মুখে কুন্দন সিংও মাথা নেড়েছে। সে-ও কাগজে দেখছে, অনেক কথা কানেও আসছে বলল। সে নাকি তার ভূমিসেনাদের সমঝে দিয়েছে কোথাও বেশি বাড়াবাড়ি না হয়—হাওয়া বুঝে অন্যদেরও তাই করা উচিত। তার পরে গোল যারা পাকাচ্ছে তাদের মুখ বন্ধ করার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। শেষে একটু চুপ করে থেকে কুন্দন সিং আলতো করে জিগ্যেস করেছে, তুহার ভাঞ্জাকা (ভাগ্নের) কা খবর···ও উলটু দলোয়ামে রহলঅ শুনথ···!

এই প্রসঙ্গের অপেক্ষাতেই ছিল ব্রিজমোহন। পাকানো গোঁফে একটু মোচড় দিয়ে গম্ভীর গলায় জবাব দিল, রহুয়া (মাননীয় মহাশয়) সাচ

শুন্‌ল, লেকিন হমার উহার কু-চলন্‌ কভু না বরদাস্ত হই—রহুয়া তুম উহারকে মাফি না করব, হম এ কহত আইল তুম্‌ না শোচত ও হমারা বহনপতো।

একটু চুপ করে থেকে কুন্দন সিং নির্লিপ্ত মুখে বলল, ছোঁড়া আচ্ছা ভইলী (ভালই ছিল), লেকিন যব পতঙ্গ্‌কা পাঁখ্‌ উড়ল বাড়ে তব মুশকিলোয়াঁ—তুম্‌ থোড়াসে সমঝই দিহ···মিল্‌নেসে হামভি কহব।

কতটা বলেছে বা কি-রকম সমঝে দিয়েছে তা দুটো বছর না যেতেই ব্রিজমোহন হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। গেল বারে ভোটে সে ভাগ্নের কাছে হেরেছে কেবল ওই কুন্দন সিংয়ের জন্য তা কি দশখানা গাঁওয়ের কারো জানতে বুঝতে বাকি আছে? প্রথমে যখন শোনা গেল প্রবল-প্রতাপ মামার বিরুদ্ধে ওই ভাগ্নে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছে তখন তো তার কাছেও সেটা হাসির ব্যাপার মনে হয়েছিল। তারপর একটু একটু করে হাওয়া-বদল বোঝা গেছে।

···দস্তুর অনুযায়ী সবার আগে ব্রিজমোহন ওই কুন্দন সিংয়ের আশীর্বাদ চাইতে গেছল। আর যে-যে গাঁয়ে সম্ভব তার সভায় হাজির থেকে তার হয়ে গ্রামের মানুষদের কিছু বলার আরজিও পেশ করে এসেছিল। আশীর্বাদ অবশ্যই মিলেছে, কিন্তু লোহা-পানা মুখ করে কুন্দন সিং জানিয়েছে, তার তবিয়ত ভালো যাচ্ছে না, সভায় গিয়ে বক্তৃতা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তা না হলেও তো যতটুকু সম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়েই ফিরেছিল ব্রিজমোহন।

তারপর?

তবিয়ত খারাপের অজুহাতে কেবল ছুপা গাঁয়ের সভাতেই সে আসেনি। কিন্তু নিজের ওই ঝর্ঝরে মোটরগাড়িতে চড়ে নিজের তেল পুড়িয়ে ভাগ্নের কোন্‌ সভায় না গেছে আর তার হয়ে বক্তৃতা করেছে? এমন কি ছুপার লাগোয়া গ্রামগুলোতেও সে এসেছে, ভাগ্নের হয়ে ভাষণ দিয়েছে। ব্রিজমোহন তখনো অবশ্য ভাবেনি ভোটের লড়াইয়ে সত্যি হারবে। কারণ, লোহার গাঁয়ের যত প্রতিপত্তির মানুষই হোক কুন্দন সিং, অন্য সব গাঁয়ের লোক তাকে ভয় করলেও ভক্তি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস

কতটুকু করে ?

ভাগ্নের কাছে ভোটে হারার জন্যেও ব্রিজমোহন গরিব বা অচ্ছুত গ্রামবাসীদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করছে তা নয়। মাস পাঁচেক আগে মনে নানা-রকম অশান্তি নিয়ে সে পাটনায় তার পরম বিশ্বাসের জ্যোতিষী পাণ্ডেজীর কাছে গিয়েছিল। অনেকদিন তার খোঁজ নেয়নি বা তাকে মনেই পড়েনি এ-ও একটা অপরাধের মতো মনে হচ্ছিল। নইলে আপদ বিপদের ছায়া দেখলে আগে তো তার কাছেই ছুটে যেত। ভোটের আগে তার সঙ্গে দেখা করলে ক্রিয়াকলাপ করে সে হার বাঁচাতে পারত কিনা কে জানে। ওই জনার্দন পূজারীর কথা শুনে পাণ্ডেজীর কথা আরো মনে পড়েনি। পূজারী তার ভালোর জন্য রোজ মহাবীরজীর পায়ে ফুল চড়ায়। সে বলেছিল, এ লড়াইয়ে লম্বরদারকে (মহামান্য) হারাতে পারে এমন মানুষ জন্মায়নি। কিন্তু ভুল ব্রিজমোহনেরই। পূজারী জ্যোতিষী নয়, মুশকিল আসানও করতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাসে বলেছে।

খুব মন দিয়ে জন্ম-কুণ্ডলি দেখে পাণ্ডেজী বলেছে, এখন বছর দুই তার সময় খুব খারাপ। বিশ্বাসী লোক শত্রুতা করবে, অনেকে চক্রান্ত করবে। ব্রিজমোহনকে সে ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই ভাব-সাব রেখে চলার পরামর্শ দিয়েছে। তুচ্ছ লোকও তার ক্ষতির কারণ হতে পারে। ক্রিয়া-কলাপের জন্য টাকা গুঁজে দিয়ে আর বিপদতারণ তাবিজ-কবজ নিয়ে সে ফিরেছে। বড় রকমের চক্রান্তের আভাস সে নিজেও কি পাচ্ছে না ? কুন্দন সিং কিছু রেখে-ঢেকে বলার লোক নয়। শুভার্থীর মতো সে তোতারামকে বলেছে, ব্রিজমোহনকে একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলতে বোলো, ছুপার আর আশপাশের খুব সাধারণ কিছু লোক নিয়ে তার আর পঞ্চ-এর কাজ-কর্মের ওপর চোখ রাখার জন্য একটা গোপন কমিটি হয়েছে বলে খবর আছে। কে-যে চর আর কে নয় বলা শক্ত, বোঝা শক্ত। মহাবীর প্রসাদ আর জগদেও মিশিরকে মুখের ওপর বলে দিয়েছে, সাধারণ লোকের ভালোর জন্য পঞ্চ-এর হাতে দেওয়া সরকারের কত টাকা গাঁয়ের মানুষদের জন্য খরচ করা হয়েছে আর কত টাকার হিসেব নেই। ছুপার সাধারণ লোকদের মধ্যে কুন্দন সিংয়েরও চর না থাকলে এ-সব মোটামুটি

ঠিক-ঠিক খবর তার কানে ওঠে কি করে? কমিটি যদি হয়ে থাকে সেটা ভাগ্নের তৈরি, আর স্বয়ং কুন্দন সিংই তার মাথা, এতে কি কোনো সন্দেহ আছে? এই কারণেই খুব হত-দরিদ্র সাধারণ আর অচ্ছুতদের সঙ্গেও ব্রিজমোহনের ব্যবহার আর আচরণ এখন নরম। এমন তারা অভ্যস্ত নয় বলেই অবাক হয়। সকলের সঙ্গে প্রীতির ভাব দেখে অভ্যস্ত হলে আশ-পাশের গ্রামেও সেটা আলোচনার বিষয় হবে। যে চরদের নিয়ে তার বিরুদ্ধে গোপন কমিটি, তাদের তখন সুবিধে থেকে অসুবিধে বেশি হবে। পাটনার পাণ্ডেজীও ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই ভাব-সাব রেখে চলতে পরামর্শ দিয়েছে। ভূমি-সেনাদের নিয়ে এখন কি-ভাবে চলতে হবে, গাঁওয়ের মানুষদের সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করতে হবে, ভাতিজাকে ডেকে ভালো করে সমঝে দিয়েছে। সাপকেও এখন মিঠা বাত শোনাতে হবে, ঠেঙাতে হলে গোপনে ঠেঙাতে হবে। বলেছে, আব্ লাঠিয়া শক্তি কম পড়লঅ তো বুদ্ধিতে কাম করত।

…তিন দিন আগে রাখী-বন্ধন উৎসব গেছে। ব্রিজমোহন অনেককে রাখী পরিয়েছে, অনেক মিঠাই বিলিয়েছে। আর বিস্ময়ে আনন্দে তাদের হাবু-ডুবু খেতে দেখেছে। অন্যান্য বারের থেকে আরো ঘটা করে ভেট সাজিয়ে তার প্রধান দূত তোতারামকে পাঠিয়েছে কুন্দন সিংয়ের ডেরায়। প্রথামত কুন্দন সিংয়ের ভেটও উৎসবের দিনই ব্রিজমোহনের ডেরায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু তোতারাম এখনো লোহার গাঁও থেকে ফেরেনি। ফিরতে দেরি হবে জানা কথাই। কারণ শুধু ভেট পৌঁছে দেবার জন্যেই তো আর তাকে পাঠানো নয়। তাকে তো সাপের হাঁচি বুঝে আসতে হবে। [illegible]কালেও সে ফিরল না দেখে ভিতরে ভিতরে একটু উৎকণ্ঠায় আছে।

বয়েস পঁয়তাল্লিশ হলেও ব্রিজমোহন সুপুরুষ আর শৌখিন পুরুষ। এখন সে ঢিমে-তালে বাড়ির কাছাকাছি একটু পায়চারি করতে বেরিয়েছে। তার পরনে মিহি ধুতি, গায়ে মুগার ফতুয়ার ওপর রেশমী চাদর, পায়ে হরিণের চামড়ার চওড়া ব্যাণ্ড লাগানো হাল্কা কাঠের চপ্পল। নিজের ওই জমির মাঝা-মাঝি এসে দাঁড়িয়ে গেল। চাউনি আরো ক্রুর কঠিন। দু'চোখে

সাদা আগুন ঠিকরোচ্ছে।···বাইরে বুঝতে দেয় না, ভবিষ্যতে এখানকার একটি মানুষই তার বদলা নেবার আসল লক্ষ্য, তার বড় শিকার। এখানকার এই সরকারি কাজের ভার নিয়ে আছে যে, সে সিনিয়র জিওলজিস্ট শাওন ভার্মা। আগে এই জমিরই এক-ধারের কাঁচা ক্যাম্পে থাকত। এখন সেখানে তার জন্য ছুটো পাকা ঘর আর টালির ছাদের স্থায়ী ক্যাম্প হয়েছে। অনেকটা জায়গা ছেড়ে এক সারিতে আরো ছটা পাকা ঘর তোলা হয়েছে। সেখানে তার অধীনের ভদ্র কর্মচারী আর টেকনিশিয়ানরা থাকে। জমিতে এখনো গোটাকতক কাঁচা ক্যাম্প মাথা তুলে আছে। ওগুলো সরকারের মাইনে করা দক্ষ শ্রমিক আর কারিগরদের জন্য।

···পাকা ক্যাম্পগুলো তৈরি হবার পর ব্রিজমোহনের মনে যেটুকুও আশা ছিল তা-ও নির্মূল। সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে-জন্য ওই জমি নেওয়া, তা বরবাদ হয়ে গেলে অর্থাৎ তামার আকরের (কপার-ওর) সন্ধান না মিললে নামমাত্র মূল্যে সমস্ত জমি আবার তাকেই ফেরত দেওয়া হবে। নাম-মাত্র মূল্যে কারণ ওই জমিকে আবার সুফলা করে তুলতে হলে তো অনেক সময় লাগবে, অনেক মেহনত করতে হবে। দফায় দফায় সরকারের লোক এসে নানা রকমে সয়েল-টেস্ট করার সময়ও ব্রিজমোহন বোঝেনি এ-জমি তার হাত-ছাড়া হতে যাচ্ছে। জিগ্যেস করতে তারা শুধু বলেছে, এই জমিতে তামার খনি মেলা সম্ভব কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তা এমন পরীক্ষা তো সমস্ত বিহারে কত হচ্ছে তার লেখা-জোখা নেই। তামাম ভারতে বিহারের মতো অত রকমের খনির জায়গা আর কোথায় আছে? কিন্তু তা বলে কিছু-কিছু মাটি খুঁড়ে সয়েল [illegible] কি সর্বত্র খনির হদিশ মিলছে! হ্যাত্ তেরি বহন্ কে-[illegible]

প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য এই লোকের অর্থাৎ শাওন [illegible] যায়নি। জমি সরকারের দখলে চলে যাবার পর তাকে [illegible] কিছু লোককে কাঁচা ক্যাম্প করে এখানে থাকতে দেখা গেছে। তখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষারই পর্যায়। মেশিন টেশিন ব[illegible] জমির একটা দিক খুঁড়ে দেখা হচ্ছে, আর প্যাক করে-করে মাটির [illegible] পাটনায় পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ক্রমশ খোঁড়ার পরিধি বাড়ছে, [illegible] আ[illegible] বাড়ছে, লরিতে যন্ত্রপাতি

আশা বাড়ছে।

পঙ্ক-এর দোস্ত আর অনুগত বন্ধু মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশির তার মাথায় ঢুকিয়েছে ওই শাওন ভার্মা কোমর বেঁধে তাদের দলে এলে এই বিপদ কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। পাটনায় ছোটাছুটি করে দুই একজন সরকারী কর্মচারীর কাছ থেকেও ব্রিজমোহন এই আভাসই পেয়েছে।··· কাজটা খুবই কঠিন, তবু সাহস করে কল-কাঠি নাড়লে ওখানে কাজের ভার নিয়ে বসেছে যে-লোক, শুধু সে-ই পারে সমস্ত প্ল্যান বান-চাল করে কাজ বন্ধ করতে। ড্রিলিং মেশিনে কত গভীর পর্যন্ত খোঁড়া হল সেই হিসেবে কারচুপি করে, প্রত্যেক পর্যায়ের মাটির স্যাম্পল ঠিক-ঠিক না পাঠিয়ে সময় বুঝে সে যদি ঘোষণা করে ওই জমিতে তামার আকর মিলবে না—তাহলেই কেবল কাজ বন্ধ হতে পারে। এ-পর্যায়ে কাজ বন্ধ হলে ব্রিজমোহনের লোকসানের থেকে লাভ ঢের বেশি। কারণ তখন পর্যন্ত অতবড় জমির আট ভাগের এক ভাগেও হাত পড়েনি, জলের দরে গোটা জমি ফেরত পেলে তো প্রায় সবটাই লাভ!

নাম জানার আগে পর্যন্ত ব্রিজমোহন ভেবেছিল বছর আঠাশ উনত্রিশের ওই মিষ্টি-মুখ ছেলেটা বাঙালী। তার চাল-চলন হাসি কথা-বার্তার ধরন সবই খাঁটি বাঙালীর মতো। এখনো এ-দিককার বেশিরভাগ ভাড়াটে শ্রমিক মজুররা তাকে পরদেশী বাবু বলে ডাকে। নাম শোনার পর তার সম্বন্ধে অনেক খবরই নিয়েছে ব্রিজমোহন। পাটনার লোক পাটনায় জন্ম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তার বাস আর লেখাপড়া সবই কলকাতায়। এই [illegible]কে হাত করার জন্য কলকাতায় তার বাপের খোঁজও নিয়েছে [illegible]ন—যদি কোনো যোগাযোগের সূতো বেরোয়। সুবিধে হয়[illegible]বাপ সেখানকার এক হিন্দী খবরের কাগজের দপ্তরে লেখার কাজ করে।

কিন্তু গ্রামের সব থেকে শাঁসালো মাতব্বর যদি দোস্তি করতে চায় কতটুকু আর অসুবিধে? বিশেষ করে তোতারাম যেখানে তার চর অনুচর আবার দূতও। ছেলেটা শরাবের সমজদার হলে আরো সুবিধে হত। কিন্তু ও-সব ছোঁয়ও না। তবু তোতারামের মারফৎ সাদর নেওতা পেয়ে সে

সাগ্রহেই এসেছে। আসবে না কেন, গ্রামের প্রধান ভূস্বামী সহায় থাকলে স্থানীয় শ্রমিক মজুর পেতে সুবিধে, সরঞ্জাম পেতে সুবিধে, আর নির্বিঘ্নে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও সুবিধে। এখানে এনে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেবার আগে শাওনের ওপরঅলা এবং প্রধান মুরুব্বি প্রকাশ দীক্ষিত কিছু দরকারী উপদেশ দিয়ে রেখেছে। গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে যতটা সম্ভব ভাব-সাব রেখে চলবে, কোন রকম জাত-পাতের গণ্ডগোলের ধারে কাছে ঘেঁষবে না, আর ইয়ং ম্যান বিয়ে করোনি—কোনোরকম অ্যাফেয়ারের আঁচড় গায়ে লাগতে দেবে না, এ-সব গ্রাম খুব ডেঞ্জারাস জায়গা মনে রেখো, গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে পারলে এরা ছাড়ে না।

প্রকাশ দীক্ষিত কড়া রিজিওন্যাল অফিসার, কিন্তু ভালমানুষ। মাঝ-বয়সী। কাজের জন্যেই শাওনকে তাঁর পছন্দ। এই লোকের সুপারিশেই এই বয়সে সিনিয়র জিওলজিস্ট হতে পেরেছে। তাঁর অফিস এখন পাটনায়, সেখানেই থাকেন তাঁর তত্ত্বাবধানে এখন বিহারের অনেক জায়গায় কাজ হচ্ছে। জিপ নিয়ে সর্বত্র ইনসপেকশনে যান। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন ছুপার কাজও দেখতে আসেন। যেদিন আসেন সেদিনই ফেরেন।

শাওন ভার্মার মানুষ চিনতে একটু সময় লাগে। যাকে যেমন দেখে তাকে তেমনি ভাবে। গোড়ায় ব্রিজমোহনকেও বেশ ভালো মানুষ আর দিলের মানুষ মনে হয়েছিল। তার থাকা খাওয়ার সুবিধে অসুবিধে নিয়ে ভদ্রলোক ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মাঠের ক্যাম্পে না থেকে তার বাড়িতে থাকা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল।

তারপর তার মতলব বোঝা গেছে। প্রথমে ব্রিজমোহন তোতারামের মারফৎ টোপ ফেলেছে। তারপর মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশিরকে দিয়ে সেই টোপ আরো লোভনীয় করে তুলতে চেষ্টা করেছে। তারাও বিফল হওয়ায় নিজে এগিয়েছে। মতলব বোঝার পর শাওন ভার্মার উদ্‌বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু সবিনয়ে সকলকে সে একই জবাব দিয়েছে। তার কোনো হাত নেই, করারও কিছু নেই। স্যাম্পল যাচাইয়ের পর পাটনার অফিস থেকে যেমন যেমন নির্দেশ আসছে সে তাই করে যাচ্ছে। পাটনা অফিস থেকে সপ্তাহে একবার দু'বার করে তার ওপরওয়ালা

নিজে এসে সব তদারক করে যাচ্ছেন, স্যাম্পল নিয়ে যাচ্ছেন আর কাজের হুকুম দিচ্ছেন।

ব্রিজমোহন অবশ্য তারপরেও মিষ্টি ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে। আর এখনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু ওই জবাবের পর দুঃখ করে বলেছিল, তুমি এমন মিঠা মানুষ ভার্মা সাহেব যে এ ক'দিনের মধ্যেই আমার আপনার লোক হয়ে গেছ···কথাটা রাখলে শুধু আমার কেন, তোমার নিজেরও ভালো হত।

বিনয়বচনের আড়ালে সেই প্রথম লোকটার ক্রুর মূর্তি উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে। বাইরে বোঝা না গেলেও শাওন ভার্মা ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ ঘাবড়েছিল। এরপর প্রকাশ দীক্ষিত ইন্সপেকশনে আসতে তাকে সব না বলে পারেনি। শুনে অতদিনের অভিজ্ঞ মানুষটাও স্তব্ধ খানিক। তারপর বলেছে লোকটার কত প্রতিপত্তি আমি জানি, তুমি যা বলেছ ঠিকই বলেছ, তার সঙ্গে খুব সদ্ভাব রেখেই চলতে চেষ্টা কোরো, আর বারবার ওই কথাই বুঝিয়ে দিও যে তুমি কেউ নও—কেবল হুকুম তামিল করে যাচ্ছ।···ফাঁক পেলে আমিও তার সঙ্গে আলাপ করে রাখতে চেষ্টা করব।

আলাপ করেছেন। শাওন তার কাছে ঠাকুর সাহেবের কত প্রশংসা করেছে। বলেছেন, আপনার সাহায্য পেলে ভারত সরকার আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আর শেষে বলেছেন, শাওন ভার্মা খুব কাজের ছেলে আর ভালো ছেলে, কিন্তু অল্প বয়েস···আর একটু মুডি···আপনি এখানে তার গার্জেনের মতো হয়ে গেছেন শুনে আমি নিশ্চিন্ত।

ফিরে এসে ওকে হেসে বলেছেন, সেয়ানে সেয়ানে এক-প্রস্থ কোলাকুলি হয়ে গেল দু'জনের কারোই বুঝতে বাকি নেই।···যাক্, এর পর ওই লোক তোমার সোজাসুজি কোনো ক্ষতি করতে সাহস করবে মনে হয় না। তুমি যতটা পারো ওর সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চলো—

ব্রিজমোহনের তীক্ষ্ণ চোখজোড়া প্রথমে শাওন ভার্মার পাকা ক্যাম্প ঘর দুটোর দিকে ঘুরে এসেছে। দরজা বন্ধ মানে সাইটের কাজ দেখতে বেরিয়েছে। দু' চোখ জমির চারদিকে চক্কর খেতে লাগল। কিন্তু অতবড় জমিতে এখন কলকব্জা যন্ত্রপাতি ড্রিলিং মেশিন মাটি তোলার ক্রেন

জেনারেটার ইত্যাদির ছড়াছড়ি। স্থানীয় মজুরের সংখ্যাও কম নয়, সরকারের উঁচু হারে বাঁধা মজুরীর লোভে অনেকেই ক্ষেতির কাজ ছেড়ে এখানে এসে ভেড়ার জন্য হাঁ করে আছে। সরকারের কাজে এ-সব জায়গায় শ্রমিকের অভাব হয় না। হয়ওনি। এ-বেলায় ছুত-অচ্ছুতের একসঙ্গে কাজ করতে কারো দ্বিধা নেই।

জমির ওপর শ্যেন চক্ষু চালিয়ে ব্রিজমোহন যাকে খুঁজছে সে শাওন নয়। একটি মেয়ে। না, সে এখানকার কোনো মজুরনি টজুরনি নয়। অচ্ছুত হলেও অনেক উঁচু দরের মেয়ে। ছুপার সকলে, বিশেষ করে মরদরা ওই মেয়েকে খুব ভালো করে চেনে। শুধু মরদরা কেন, সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেলে ষাট-সত্তর বছরের বুড়োদেরও কি বাসনার আগুন বুকের তলায় ধিকি ধিকি জ্বলে না? এ সময়ে অনেক দিনই ওই মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে ব্রিজমোহন। রোজ সকালে দুপুরে বা বিকেলে একবার করে সে আসেই, আর কখন আসে সে-খবরও ব্রিজমোহনের কানে ঠিক ঠিক পৌঁছয়। শুধু সকাল দুপুর বা বিকেল কেন, সন্ধ্যার পরে বা রাতেও ওই পাকা ক্যাম্প ঘরেই এই মেয়ের আনাগোনার খবর ব্রিজমোহনের অগোচর নয়। তখন অবশ্য শাওন ভার্মার অসুখ। পক্সের গুটিতে গা ছেয়ে গিয়েছিল, তাকে সেবা যত্ন করার তাগিদে আসা।

···আজ এ সময়ে আসেনি। এলে একা আসে না। সঙ্গিনী জুটিয়ে দল বেঁধে আসে। যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। দেখে বেড়ায়। সরকার যেন ওই মেয়েকেও এখানকার কিছু তদারকির ভার দিয়েছে—এমনি হাবভাব।

তিতলি।

তিতলি মানে প্রজাপতি।···গত এক বছর ধরে তার সঙ্গে ওই ক্যাম্প ইন-চার্জ ও শাওন ভার্মার ভাব-সাব যে হারে বেড়ে চলেছে, ব্রিজমোহনের কাছে সেটা খুব দুশ্চিন্তার কারণ না হোক অসহ্য ক্রোধের কারণ বটেই। আজ দু'বছরের বেশি হয়ে গেল, ছুপার সকলের সেরা ওই মেয়ের ওপর তার চোখ। দু বছর ধরেই তাকে অধীর অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। হচ্ছে। কারণ কি একটা সংস্কারের দরুন একুশ পূর্ণ হবার আগে হীরা মল্লা ওই মেয়েকে ছাড়বে না। ব্রিজমোহনের ধারণা, সংস্কার টংস্কার কিছু না,

সকলের চোখে ওই মেয়েকে আরো লোভনীয় আরো দামী করে তোলাই উদ্দেশ্য। হীরা মল্লা সম্পর্কে তিতলির পিসি, বাপ বলদেও মল্লার দূর সম্পর্কের বোন। বলদেও মল্লা আধা-পাগল, কারো সঙ্গে কথা বলে না, দিন রাত মদে চুর হয়ে নিজের ঘরে সেঁধিয়ে থাকে। সাড়ে তিন বছর বয়সে তিতলির মা বাসন্তীয়া মারা যেতে ও হীরা মল্লার হেপাজতে মানুষ। এসব হীরার মুখেই শুনেছে ব্রিজমোহন, বাসন্তীয়াকে কখনো চোখে দেখেনি। রূপের ডালি আর গুণের ডালি ছিল নাকি সেই মা। গুণ বলতে গান। তার গানে বনের পশুপাখি ভুলত নাকি। তিতলি মায়ের রূপ পেয়েছে, কিন্তু গুণ পাওয়ার জন্য সেই ছেলেবেলা থেকে অনেক মেহনত আর অনেক খরচ করতে হয়েছে হীরাকে। তার সবটুকু উশুল করতে হবে না? হীরা মল্লার সাফ কথা। আর তিতলি শুধু রূপ আর গুণ নয়, সেই রসের ডালিমটিও হয়ে উঠেছে। হীরা মল্লার মতলবের আভাস ব্রিজমোহন পেয়েই গেছে। তাই নিশ্চিন্ত। তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মানুষ এই গ্রামে বা আশপাশে আর কে আছে? তার প্রতীক্ষারও মিয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। এটা শ্রাবণ মাস। কার্তিকের গোড়াতেই দেয়ালি। তার দিন কয়েক আগে তিতলির একুশ পূর্ণ হবে। দেয়ালির উৎসব সপ্তাহের মধ্যেই ওই রূপ-গুণ আর রসের ডালি তার ভোগ দখলে আসবে। ছুপা থেকে কত দূরের কোন মোকানে তিতলিকে রাণীর হালে এনে রাখবে ব্রিজমোহন তা-ও স্থির করেই রেখেছে।

দুশ্চিন্তা খুব নেই কারণ হীরা মল্লা কঠিন মেয়ে। কিন্তু ওদের এই মিতালি কি করে বরদাস্ত হয়। ভাবলে দোষ অবশ্য শাওনের নয়। সে সেধে ওই মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে যায়নি, আর এমনিতেও লোকটা চুপচাপ গোছের। কিন্তু তিতলি যদি প্রজাপতির মতো রূপ ছড়িয়ে রং ছড়িয়ে তার কোনো খেয়াল-খুশির ডালে এসে বসে আর সেই ডাল যদি রক্ত-মাংসের কোনো মরদ হয়—তাহলে তার মধ্যেও রং ধরবে না রসের বন্যা বইবে না এমন মরদ কি দুনিয়ায় আছে? এটুকু বুঝেও ব্রিজমোহনের সমস্ত রাগ ওই শাওনের ওপর। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তার এত সাধের জমিটা খাচ্ছে, আর চোখের সামনে দাঁড়িয়েই তিতলির ভাবের দোসর হয়ে

উঠছে।

…ঘরে ব্রিজমোহনর বন্দুক আছে একটা। ব্যবহার করার দরকার পাড়ে না, ওটা কেবল ইজ্জত আর প্রতিপত্তির প্রতীক। কিন্তু ব্রিজমোহনের রক্তে যখন আগুন ধরে, ইচ্ছে হয় বন্দুকটা এনে লোকটার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়।…ভাতিজা বাবুয়ার হেপাজতে বন্দুকের মতোই আরো ভয়ংকর জিনিস আছে। জমির ফয়েসলায় না আসার জন্যেই কাকাকে জিগ্যেস করেছিল, চুপচাপ লোকটাকে খতম করে দেবে কি না।

আগে হলে বা সরকারের লোক না হলে ব্রিজমোহন দ্বিধা করত না। কিন্তু এখন সময় বড় মন্দ। ভয়ংকর রকমের শোরগোল পড়ে যাবে।… ওর মুরুব্বি সেই প্রকাশ দীক্ষিতকে খুব সহজে লোক মনে হয়নি। ওর মুখ থেকে সব জেনে শুনে আর বুঝেই সেধে আলাপ করতে এসেছিল। কিছু ঘটলে সে সোজা ব্রিজমোহনের দিকেই আঙুল তুলবে।

—নমস্কার ঠাকুর সাহাব, ভোর ভৈল রহুরাকা দরশন মিলল, দিনোয়া বড়িয়া বিতি—

ডাক-পিওন চলতরাম। হিন্দী ভাষী। কিন্তু রইস লোকদের সঙ্গে যথাসাধ্য ভোজপুরী চালাতে চেষ্টা করে। ভোর বলতে এখন সকাল সাড়ে দশটা পার। চলতরাম ওর ঠিক নাম কিনা কেউ জানে না। কিন্তু চিঠি বিলি করতে করতে চলার থেকে বসেই বেশি। পান তামাকু বা চিলিম পেলে তো কথাই নেই, তখন মশগুল হয়ে বসে। এর কথা তাকে বলে, তার কথা একে। এই গুণে ঠাকুর সাহেবেরও সে খাতিরের মানুষ।

—নমস্কার, খুশ রহ। চোখের ইশারায় সামনের জমি দেখিয়ে মুচকি হেসে জিগ্যেস করল, তুহার ডাক বিলি হো গইল?

ওখানেই দু'বেলা গোছা গোছা ডাক বিলি করে চলতরাম। এই মুচকি হাসির অর্থ বোঝা তার কাছে জলভাত ব্যাপার। ভোঁদা ইঁদুরের মতো মুখ আর চোখ করে জবাব দিল, ও জমিন তো আভি সাহারা (মরুভূমি) লাগলঅ, দুফর আওর সাঁঝোয়ামে ফিন আ-কর ডাক বিলি করব।

মনের মতো জবাব বটে। একজনের সঙ্গে একটা মেয়েকে না দেখে

কজন যন্ত্রপাতিতে ভরা ওই জমি ওর চোখে সাহারার মতো খাঁ খাঁ,
ই দুপুরে আর সন্ধ্যেয় এসে ডাক বিলি করবে।

ব্রিজমোহনের পাকানো গোঁফ জোড়া দিয়ে হাসি উপছে পড়ছে।—
ারা ও ক্যাম্প ইন-চার্জ সাহাবকা রং-ঢং কইসন চলতৈ?

—হায় মালেক, কা কহি, রং-ঢঙকা জোয়ারিসে এ ভাদুয়ামে (ভাদ্র
সে) ফাগন আ গইলঅ।

ব্রিজমোহন হাসি মুখে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলে গেল, কোনো
র থাকলে যেন দুফরে বা সাঁঝে পান-তামাক খেতে আসে। চলতরাম
কুতেই কৃতার্থ। খবর না থাকলেও খবর তৈরি করে নিয়ে যেতে
ক্ষণ?

ঘরে ফিরে দেখে যার জন্য ভিতরটা উদগ্রীব হয়েছিল সেই তোতারাম
ওয়ায় একটা ছোট মাচিয়ার ওপর বসে। কিন্তু সেখানে তখন আরো ছ'
ত জন লোক মহারাজার দর্শনের আশায় বসে আছে। এটা প্রায়
মিত্তিক ব্যাপার। কেউ খুব ছোট জোতদার, ঋণের টাকা শুধতে না
ায় দর্শনের কর্তব্য করে যায়, কারো ওপর তার মস্ত খাটাল দেখাশুনা
র সেখানে লোক খাটানোর ভার, কেউ গঞ্জে মহারাজের দুধ-দই-ননী
ক্রির দালাল, কেউ চাষীদের মোড়ল, কেউ সবিনয়ে পুরনো আরজি
ণ করিয়ে দিতে এসেছে, কারো বা নতুন আরজি বা প্রত্যাশা নিয়ে
সা। সকালে বা বিকেলে দাওয়ার ওপর গোটাকতক ছোট মাচিয়া আর
টা দুই বড় চার-পাইয়া পাতা থাকে। মর্যাদা অনুযায়ী আগন্তুকরা কেউ
ক আসনে অর্থাৎ ছোট মাচিয়ায় বসে, সাধারণেরা দুতিন জন করে
চার-পাইয়ায় বসে। আরো নিম্ন শ্রেণীর বা অচ্ছুত দর্শনার্থী এলে তারা
য়ার উঠোনে বসে। সভা ভাঙলে উঠোনে গোবর গঙ্গাজলের প্রলেপ
ড়।

উঠোনে কেউ ছিল না, সকলেই দাওয়ায় বসে। আঙ্গনায় মহারাজের
পড়তেই মাচিয়া আর চার-পাইয়া ছেড়ে সকলে উঠে দাঁড়ালো, আনত
। সেই ফাঁকে ব্রিজমোহনের দু' চোখ এক লহমার জন্য তোতারামের
র ওপর। এটুকুর অর্থ তোতারাম ভালোই জানে। অর্থাৎ এদের

সামনে একটিও দরকারি কথা নয়। খুশি মুখে সকলকে একবার দেখে নিয়ে মহারাজ তার স্পেশাল মাচিয়ায় বসতে বসতে মাথা নেড়ে সকলকে আসনস্থ হবার পরোয়ানা দিল। দু-একজনকে কুশল প্রশ্ন করে কৃতার্থ করল, তারপর চাউনি যেন এই সবে তোতারামের মুখখানা আবিষ্কার করল।—কা রে তোতারাম, লোহার গাঁওসে আনেমে তুহার তিন রোজ লাগলঅ বা?

—কা করে মহারাজ, তোহার খাতিরকে লিয়ে ঠাকুর কুন্দন সিং হমারাকে এইসন কম-কমসে (জাপ্টে জাপ্টে) প্রেম দরশাইলে কি হমারকে ছোড়াওত (ছাড়াতে) দুফরসে সাঁনঝ হো গইলঅ।

সকলে হাসছে। ব্রিজমোহনের মুখেও আত্মপ্রসাদের হাসি। জিগেস করল, কুন্দন সিংকা হাল কইসন বা?

—কা কহি মহারাজ, উনকা ঝাণ্ডা আসমানসে উপর উড়ত।

—কুন্দন সিংকা রখসা-বন্ধন (রাখী বন্ধন) উপহার ছবুয়াকা হাতো য়াসে হামে দে গেইলঅ···হমারা ভেট-উপহার উনকা পসনমে আইল কি না?

—পসন! বিশোয়াস না হই, তোঁহার উপহার দেখিকে ঠাকুর কুন্দন সিংওয়াকা দোনো আঁখিয়া কটরাসে নিকল করকে নাকিয়াতক পৌঁছ গইলঅ, ওকরা আধা ঘণ্টা বাদ আপনে হাতোয়া দোনা আখিয়াকে জায়গামে বইঠা দেলেঃ।

আর যারা উপস্থিত তারা যা বোঝার ভালোই বুঝছে আর হাসছে। ভেট দেখে যার এই অবস্থা হয় তার ঝাণ্ডা কেমন আসমানের ওপর ওড়ে বোঝো।

—এ তোতা তুহার বাতিয়ামে লাগাম দিহ! আর কা কা চিজ দেখ্লী?

—দেখনু বারগা বহুল রহলঅ···আর যব হংগামে পর জোতত্তিয়া হাওয়াই জাহাজকি মাফিক গণগণ করত্তিয়া (বলছে জোয়াল পরালে ওরা হাওয়াই জাহাজের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে ছোটা শুরু করল)—আর দেখ্লী খাটাল খাটালে গোরু ভঁইষ বামারে (অচেল) দুধ দি

ফতিয়া, সর দহি দুধ খাইকে ধিয়ান-পুতান (ছেলেপুলেরা) সব মস্তিমে
নাওর মৌজমে রহতিয়া।

শুনে যেন খুশি ব্রিজমোহন।—বহুত আচ্ছা···তব তুকে খাইকে
লিয়ে কা কা চিজ দিহলঅ ?

—পাওভর ছাতুয়া ছটাক ভর নমক, এত্যা এত্যা বড়া রামলাড্ডু
(পেঁয়াজ) —এত্যা এত্যা বড়া হারা হারা মরচাই। মুখখানা এবারে বেশ
সীরিয়াস, কেমন করে ছাতু মেখে তা খেল দেখাতে দেখাতে বলল, এই-
ঠাকে মুঠা ভরকে সানত সানত (ছানতে ছানতে) রহলী আর যব এইসা
করকে মুঠরা বাঁনধকে মু সে দহলী, তব এইসন মজগর (মজা) লাগত
হলঅ যাইসন পুরি জিলাবি ঝলক মারত।

এবারে সকলে জোরেই হেসে উঠল, কেবল তোতারাম বাদে। ব্রিজ-
মোহনের উদ্দেশ্য ষোল-কলায় পূর্ণ, এই জন্যেই তোতারামকে ছাড়া তার
চলে না। লোহার গাঁওয়ের যে বিরাট ভূস্বামীর এত নাম এত ডাক,
আসলে সে কেমন লোক আর তার কেমন দিল বোঝো এখন। ফাঁক
পেলেই কুন্দন সিং-এর সঙ্গে নিজের তফাতটা এইভাবে তোতারামের
মারফত সকলকে বুঝিয়ে দিতে ছাড়ে না। যারা এসেছে এর পর তাদের
নিয়ে ব্রিজমোহনের বিশেষ আগ্রহ নেই। দু' চার কথায় তড়িঘড়ি
সকলকে বিদায় করে তোতারামের দিকে ঘুরে বসে জানতে চাইলো তার
ফিরতে এত দেরি হল কেন আর সেখানকার খবর কি ?

তোতারাম জানান দিল, খবর বিশেষ ভালো না, আর দেরি হবার
কারণ, রাখী-বন্ধনের পরদিনেই ভোজির (বৌদির) প্রথম বাৎসরিক
শ্রাদ্ধের দিন পড়েছে বলে কুন্দন সিং থেকে যেতে বলল, আসলে সে কি
করছে না করছে আমার মারফত মহারাজকে সেটা জানানোর মতলব।

ব্রিজমোহন মাচিয়ার ওপর নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসেছে। —কেন,
সে কি করেছে ?

—গাঁয়ের সমস্ত অচ্ছুতদের আর শুধু গরিব মানুষদের ডেকে ভূমি
সেনাদের দিয়ে এন্তার লাড্ডু আর মিঠাই বিলিয়েছে—ওই দিনে তার
দোকানের সামনে হাজারের ওপর অচ্ছুত ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী আর

গরিব মানুষ জমায়েত হয়েছিল···আর একবার যখন কুন্দন সিং নিজে
-হাতে কয়েকজন অচ্ছুত বুড়ো-বুড়ীকে মিঠাই বিলি করেছিল তখন তা
ফটক খিঁচে নেওয়া হয়েছে, বোধহয় খবরের কাগজে ছাপা হবে।

ব্রিজমোহনের ফর্সা মুখ রাগে লাল। ধুরন্ধর লোকটার এসব শয়তানি
চট করে মাথায় আসে বটে। এক বছর আগে তার ওই হাতি মার্কা ব
মারা গেছে বলে তো তার দুঃখের শেষ নেই, বেঁচে থাকতে কোনদিন গা
টিপে দেখেছে কিনা সন্দেহ। আর আজ তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে এই লোক
দেখানো ঘটা। এদিকে অচ্ছুত আর গরিবের রক্ত-মাংস নিঙড়েই তো
তার এত দৌলত।

—আর ?

—আর তার ভূমিসেনারা কি কাজ নিয়ে আছে তাই দেখালো।

—কি কাজ নিয়ে আছে ?

—ভূমিসেনাদের দিয়ে লোক খাটিয়ে অচ্ছুতদের জন্য আরো একটা
কুঁয়া আর একটা পুকুর কাটিয়ে দিচ্ছে। আব লিখিপড়ি জানা ভূমি
সেনারা তার পাঠশালে পড়ানোর কাজও করছে। তোতারাম আরো
জানান দিল, লোক দিয়ে কুন্দন সিং তাকে পাঠশালা দেখতেও পাঠিয়ে
ছিল। আগে থেকে শেখানো ছিল নিশ্চয়, তাই তোতারাম গিয়ে দে
ভূমিসেনা মাস্টাররা অচ্ছুত পড়ুয়াদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আদ
করে পড়া শেখাচ্ছে।

রাগে ব্রিজমোহনের মুখ দিয়ে একটা অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে আস
ছিল। তারপর গুম খানিক।

তোতারাম এর পর দু' দফা খারাপ খবরের ফিরিস্তি দিল। গত দু
বছরের মধ্যে হরিজনদের ওপর যত অত্যাচার হয়েছে দিল্লিতে তার খাতা
খোলা হয়েছে। সে খাতায় ব্রিজমোহনের নামও আছে, আর দ্বিতীয় হল
ভূস্বামীদের নিমকমটেকস (ইনকামট্যাক্স) আর দৌলত ফাঁকির লিস্টিতে
ব্রিজমোহনের শির সবার ওপরে। কুন্দন সিং খুব মিঠা করে মহারাজকে
জানাতে বলেছে, সে মুশকিলে পড়লে তারও দুখ হবে, তাই এখন খুব
ঠাণ্ডা মাথায় চলা দরকার, আর নিজের বুদ্ধিতে না চলে পাকা লোক

দিয়ে তার দৌলতের হিসেব যেন খুব সাফ রাখে।

ব্রিজমোহন গর্জন করে উঠল, সব ঝুট ! অগর কুছ অহত তো ওকরাকে (ওর) ভাইয়াকা দুশমনি তু না জানথৈ ?

তোতারাম অপরাধী মুখ করে মাথা নেড়ে সায় দিল, হাম তো জানথ মালিক···।

তাকে বিদায় করে ব্রিজমোহন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল। তাব ধারণা, কুন্দন সিং ভাঁওতা দিচ্ছে, ভয় দেখিয়ে তাকে বে-সামাল করছে, শান্তি নষ্ট করছে। না, অচ্ছুত বা হরিজনদের ওপর অত্যাচার ব্রিজমোহন কখনো ঢাক পিটিয়ে করেনি। আর ছ' মাস ধরে ভাতিজা বাবুয়ারও সে রাশ টেনে ধরে আছে। হরিজন অচ্ছুতদের ওপর অত্যাচারের প্রমাণ কেউ করতে পারবে না। কুন্দন সিং নিজে নিশ্চয় অচ্ছুত-দের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে বলেই এখন তাদের ওপর নানা-ভাবে দরদ দেখিয়ে ট্যাঁড়া বাজাচ্ছে।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটাই তার দুশ্চিন্তার কারণ। আয় অনুযায়ী ট্যাক্স যা দেয় সেটা কিছুই নয়। আর দৌলতের হিসেবও খুব আট-ঘাট বেঁধে করে রাখেনি এটাও সত্যি কথা। কিন্তু পাটনার ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরকে ডিঙিয়ে তার নাম দিল্লি দপ্তরের লিস্টিতে উঠবে কেন আর কি করে ? কেউ উড়ো খবর দিতে চাইলেও সে তো পাটনার দপ্তরে দেবে। হ্যাত তেরি বহনকে···[illegible] আর ছেড়ে

ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও এই দ্বিতীয় ব্যাপারটা মনের তলায় কাঁটার মতো একটু খচখচ করতেই থাকল। যদিও কুন্দন সিংয়ের দৌলতের হিসেব খুব সাফ আছে এ সে একটুও বিশ্বাস করে না। কিন্তু তার পার পাবার রাস্তা খোলা আছে বলেই সে এই নিয়েও তাকে সতর্ক করার নামে অনায়াসে হুমকি দিতে পেরেছে।

···ভালোই করেছে। এই বিপদের সম্ভাবনার দিকটা সে তেমন ভাবেনি।

অচ্ছুত পাড়ার একেবারে শেষ মাথায় দুটো ছাপরা ঘর। এর পঞ্চাশ ষাট গজের মধ্যে আর কোনো ঘর নেই বা কারো বাস নেই। ঘর দুটো ছাড়িয়ে বিশ তিরিশ গজ উত্তরে গেলেই জঙ্গল শুরু। জঙ্গলটা প্রথম থেকেই ঘন নয় খুব। কিন্তু যত ভিতরে ঢোকা যায় ততো গহীন। শাল পলাশ মহুয়া আর সাবাই ঘাসের গভীর জঙ্গল। সমস্ত বিহারের পাঁচ ভাগের এক ভাগই বনভূমি। সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু এ-দিকের এই জঙ্গলটার ওপর সরকারের তেমন নজর নেই। বছরে দু'বছরে এক-আধবার বনবিভাগের লোক এসে অনেক গাছ উজাড় করে কাঠ নিয়ে যায় আর সাবাই ঘাস কেটে নিয়ে যায়। সাবাই ঘাস দিয়ে কাগজ তৈরি হয়। বন-বিভাগের লোক এসে ওই জঙ্গলে হানা দিলে একটি মাত্র লোকের শান্তির ব্যাঘাত ঘটে, পাগলামি বাড়ে, মাথায় খুন চাপে। সে ওই দুই ছাপরা ঘরের বাসিন্দা বলদেও মল্লা।

তিতলি মল্লার বাপ। আর হীরা মল্লার দূর সম্পর্কের ভাই। হীরা মল্লার থেকে সাত আট বছরের বড়। বছর সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বয়েস। দিন রাতের বেশিরভাগ সময় মদের নেশায় চু[illegible]। কিন্তু তখনো আর এই বয়সেও তার গায়ে অসুরের শক্তি। আর তেমনি ক্ষ্যাপা মেজাজ। নেশা করলে বুকে থুতনি ঠেকিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে। মুখ তুললে দু'চোখ জবার মতো লাল। বনবিভাগের লোক জঙ্গলে হানা দিলে ভয়ে তিতলির মুখ শুকোয়। বাপ কখন জানি একটা খুন-খারাবী কাণ্ড করে বসে। বাপ ওই জঙ্গলটাকে নিজের খাস সম্পত্তি ভাবে। কাউকে জঙ্গলে ঢুকতে বা ওখান থেকে বেরুতে দেখলে মেজাজ বিগড়য়। বেখেয়াল বাপ যখন-তখন ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় এমন কি মদ-মাতি (মত্ত) অবস্থায় গভীর রাতেও ওই জঙ্গলে চলে যায়। একটা লানটেন পর্যন্ত সঙ্গে থাকে না। অন্ধকারেই যায়। ওই

জঙ্গলটা যেন তার আরামের আর বিশ্রামের জায়গা। তিন বছর বয়সে মা মারা যাবার পর আট ন' বছর বয়েস পর্যন্ত ভাগাভাগি করে তিতলি তিন জায়গায় থাকত। কখনো বাপের কাছে ওই পাশের ছাপরা ঘরে, কখনো মায়ের নিজের অনেক ছোট বোন এক মৌসীর কাছে, আর কখনও হীরা ফুফুর কাছে। বেশিরভাগই থাকত মৌসী আর ফুফুর কাছে। কারণ তখন পর্যন্ত বাপের এমন উন্মাদ দশা না হলেও নেশার মাত্রা চড়লে তার মেজাজ অনেক সময়েই বিগড়োতো। এমনিতে এত ভালবাসে, কিন্তু সেই মত্ত অবস্থায় মারের চোটে এক-এক দিন আধ-মরা করে ফেলত ওকে। একবার তো গলা টিপে মেরেই ফেলেছিল প্রায়। তিতলি তখন মৌসী বা ফুফুর কাছে না পালিয়ে গিয়ে করবে কি ? পরে অবশ্য বাপু নিজেই ওকে আনতে যেত। তখন তার চোখে জল দেখত। বলত আর কক্ষনো মারবে না। কিন্তু নেশা চড়লে ভুলে যেত। ওই বয়সেই তিতলি বাপের মেজাজ বুঝতে শিখেছিল। তার নেশা চড়তে দেখে বা চাউনি দেখে আগে থাকতে বিপদের আভাস পেত। নিঃশব্দে তখন বাড়ি ছেড়ে পালাতো। তাছাড়া মৌসী বা ফুফু নিজে থেকেও এসে ওকে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখত। ফুফুর থেকে মৌসীকেই অবশ্য তিতলির ঢের বেশি ভালো লাগত। মৌসী ওকে নিজের মেয়ের মতোই ভালো বাসত। ওর ওপর দখল নিয়ে মৌসীআর ফুফুর মধ্যে রেষা-রিষি আর ঝগড়া দেখে তিতলি মজাই পেত। মৌসীর সোয়ামী আর ছেলে আছে, ফুফুর কেউ নেই (কেন নেই বড় হয়ে তিতলি সেটা খুব ভালো করেই জানে)—ফুফু কোমর বেঁধে তার সঙ্গে এসে ঝগড়া করত, তোর তো সবই আছে, এই মেয়েটার দিকে আবার নজর দিস কেন ?···ভাবতে গেলেও তিতলির বুকের ভিতরটা টনটন করে —কলেরা হয়ে সেই মৌসী অকালে মারা গেল। তিতলি আজ ভালো করেই জানে মৌসীর ওই মৃত্যু তার জীবনে কত বড় দুর্ভাগ্য।

সে যাক, বাপের কাছে থাকতেই তিতলি কত দিন আর কত রাতে দেখেছে মানুষটা যখন তখন ওই জঙ্গলে মাঝরাতে বেরিয়ে গিয়ে সকালে ফিরছে। শীত বরষা বা গরমী কাল কোনো সময় কামাই নেই। গরমের সময় জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের ছড়াছড়ি, মহুয়া পাকলে ভালুকের উৎপাত

বাড়ে সকলেই জানে। কিন্তু বাপুর ভয়-ডর নেই, আর আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত কোনো অঘটনও হয়নি। জঙ্গলে যখন ঢোকে, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা থাকে অবশ্য, কিন্তু নেশায় চুর হয়ে থাকলে ওই ডাণ্ডা আর কি বা সহায়। তোতা-চাচা বেশ মজার কথা বলে। সাপুয়া বা ভালু নাকি ওর বাপুর রক্তে নেশার গন্ধ পায়, মাতোয়ালা হবার ভয়ে তারা কামড়ায় না বা কাছে ঘেঁষে না।

তিতলি সেদিন বিকেলে এসে দেখে, যে ঘরটায় বাবা থাকে, বাইরে থেকে সেটার শিকল তোলা। অর্থাৎ বাপু জঙ্গলে গেছে।

ছেলেবেলায় বলদেও মল্লাকে স্ব-জাতের মানুষেরা দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ গোছের একজন ভাবত। জাতের পেশা নৌকো বাওয়া। কিন্তু তাকে কোনদিন ওই পেশার দিকে এগোতে দেখা যায়নি। খুব ছেলে-বেলা থেকে তার গান বাজনার দিকে ঝোঁক, আবার লেখা পড়ার দিকেও। পাঠশালায় পড়েছে, আড়াই ক্রোশ হেঁটে যাতায়াত করে চার পাঁচ বছর স্কুলেও পড়াশুনা করেছে। সব থেকে বেশি ঝোঁক ছিল যাত্রা গানের দিকে। দশ ক্রোশ দূরেও ভালো কোনো নোটঙ্গী দল এসেছে শুনলে তাকে বাড়িতে আটকে রাখা যেত না। মারো ধরো সে পালাবেই। নিজেরও সুন্দর গানের গলা ছিল, কোথাও কারো কাছে তালিম নেয়নি, শুনে শুনে শেখা। নিজেই আবার ছড়া বেঁধে নিজের খেয়াল খুশির সুরে গাইতো। তাও সকলের ভালো লাগত, কান পেতে শুনত। জাতের লোকেরা ভাবত কালে দিনে এই ছেলে বিশেষ একজন হবে।

সেই পথেই এগোচ্ছিল। স্কুলের পড়া বন্ধ হতে যাত্রা-পালাই তার ধ্যান জ্ঞান। বই যোগাড় করে তার মধ্যে ডুবে থাকত। রামায়ণ মহা-ভারতেই তো কত পালার ছড়াছড়ি, ভাগবতে কিষণজী আর বলরামের কত লীলা, বেহুলা-লখিন্দর চাঁদ সওদাগর সাবিত্রী সত্যবান—বলদেওর কাছে এ তো সবই জীবন্ত চরিত্র। পালা তো আর পাঁচরকমের হয় না, তাই পালা লেখার থেকে এ-সব পালার জন্য নতুন নতুন গান বাঁধার দিকেই ঝোঁক বেশি। নিজে গান বাঁধত, নিজে সুর দিত। নিজে গাইত। জোয়ান বয়সের আগেই স্বজাতের মধ্যে সে গর্ব করার মতো একজন হয়ে উঠেছিল।

··· নিজের এই জগৎ সৃষ্টির শুরুতেই বলদেওর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেল একটা। গলাতে কি একটা রোগ দেখা দিল। গুটি গুটি দানায় গলার ভিতরটা ছেয়ে গেল। অবিরাম কাসি আর যন্ত্রণা। অনেক টোটকা টাটকি করল, অনেক তাবিচ কবচ পরল, কিন্তু গলা আর সারে না, গলার আওয়াজও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শেষে শহরের নাম করা বয়েদের কাছে গিয়ে ধন্না দিতে হল। গলার ঘা আর গুটি যদি সারল, সেই স্বর আর ফিরে এলো না। গলার আওয়াজই কিরকম ফ্যাসফেঁসে হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই রাগ বেশি, গোঁ বেশি, মান অভিমান বেশি। এই আঘাতের ফলে নিজের ওপর আক্রোশ, শিউজী কিষণজী হনুমানজীর ওপর আক্রোশ, যারা তাকে ভালবেসে সহানুভূতি দেখাতে বা উপদেশ দিতে আসে, তাদের ওপরেও ক্ষিপ্ত।

এই আক্রোশে জোয়ান বয়সের আগেই সে মদ ধরেছিল।

···ক্রমে একসময় ভবিতব্য মেনে নিয়েছে। রোজগার না করলে মদের যোগানই বা আসে কোথা থেকে। বছর দুই বাদে আবার কাজে মন দিয়েছে। গলায় গান না থাক, সুর তো আছে, দেখা গেল গান বাঁধার ক্ষমতা আগের থেকে বেড়েছে বই কমেনি। নিজের মাথা খাটিয়ে ছকে-বাঁধা পালার রস অদল-বদল করেও আসর জম-জমাট করে তুলতে পেরেছে। বছর কয়েকের মধ্যে আবার সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। নিজের গানের ভূমিকাই শুধু গেছে। কিন্তু তার বাঁধা পালায়, তার বাঁধা সুরের গানে এক-একটা নোটঙ্গী দল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বড় বড় নোটঙ্গী দল তার কাছে সেধে এসেছে। বলদেও মল্লার কোনো পিছু টান নেই, কারো ওপর মায়া মমতা নেই। যে দল বেশি টাকার টোপ ফেলবে আর দামী মদের বোতল এগিয়ে দেবে—সে সেই দলের কর্ণধার।

বলদেও মল্লার প্রধান শত্রু মদ। দ্বিতীয় শত্রু নিজে। নিজে বলতে তার দুর্জয় ক্রোধ।

এই দুই শত্রু তাকে খেয়েছে। তার সর্বনাশ করেছে। অথচ তার মতো দরদী শিল্পী শুধু নিজের জাতের মধ্যে কেন, সমপর্যায়ের অন্য সমাজের মধ্যেও দ্বিতীয় নেই। আর শান্ত থাকলে তার বুক-ভরা ভাল-

বাসার স্পর্শ তিতলিও ছেলেবেলায় কি একেবারে পায়নি? ওর খাওয়া-পরার দিকে চোখ, স্বাস্থ্যের দিকে চোখ, কখনো এতটুকু অসুখ হলে তার সে কি উৎকণ্ঠা আর উদ্‌বেগ। খুব ক্বচিৎ হলেও এখনো তিতলির মনে হয় তার দিকে চেয়ে বাপুর দুই বিমনা চোখে স্নেহ উপছে উঠছে, সেই স্নেহ বুঝি জল হয়ে গাল বেয়ে নেমে আসবে।

...তবু এই বাপুকে তিতলি ঘৃণাই করে। সময় সময় মনে হয় এত ঘৃণা পৃথিবীতে সে আর কাউকে করে না। এই রাগ আর বিতৃষ্ণার সবটুকুই মায়ের কারণে। তিতলির জীবনে মা আর কতটুকু ছিল? সাড়ে তিন বছর। মায়ের মুখও মনে পড়ে না, কখনো-সখনো ভারি সুন্দর একখানা মুখ কল্পনায় আসে, আর সময় সময় কিছু কিছু ধু ধু দৃশ্য চোখে ভাসে। সেই কল্পনার মুখ ওকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে খুব মিষ্টি সুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতো। ...কোথায় যেন বেশ বড় আর সুন্দর বাড়িতে ও থাকত। সে বাড়িতে খুব গম্ভীর গোছের একজন বয়স্ক লোকও থাকত. ওর সঙ্গে কত মজা করত, খেলা করত, সেই লোকটা মেঝেতে উপুড় হয়ে ঘোড়া হত, আর তিতলি তার পিঠে চেপে হ্যাট-হ্যাট করত আর খিলখিল করে হাসত। ...সে কি তার মামাবাড়ি.. আর সেই লোকটা তার মামা? কারণ, আট-ন' বছর বয়েসের সময় তিতলি তার ফুফু আর মৌসীর কাছে শুনেছিল, দু'বছর বয়সে ওকে নিয়ে তার মা বাসন্তী (সকলে বলত বসন্তীয়া কি মিষ্টি নাম মায়ের!) বাবাকে ছেড়ে এক মামার কাছে চলে গেছল। তারপর আরো দেড় বছর বাদে অর্থাৎ তিতলির সাড়ে তিন বছর বয়সে এক সন্ধ্যায় তার মা ওকে এই বাপুর কাছে রেখে সেই রাতেই আবার চলে গেছল। এর দিন তিন চার বাদে সেই মামাবাড়ি থেকে মায়ের মৃত্যুর খবর এসেছে।

.. তিতলি ফুফু আর মৌসীর কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছে মামাবাড়ির সেই লোক এই রকম ঢ্যাঙা রোগা বা তার এই গোছের মুখ কিনা—যে ওর সঙ্গে খেলা করত, ঘোড়া হয়ে ওকে পিঠে তুলত। কিন্তু এই কৌতূহলের জবাবে ফুফু বা মৌসী কিছুই বলতে পারত না।

...কিন্তু অনেক পরে, মৌসী মারা যাবারও অনেক বছর পর থেকে এ

পর্যন্ত তিতলি তার মায়ের সম্পর্কে অনেক জেনেছে। ফুফুর মুখে শুনেছে। যত জেনেছে যত শুনেছে, বাপের ওপর রাগ আর ঘৃণা ততো বেড়েছে। কান বিষিয়েছে, মন বিষিয়েছে।

মা বাসন্তীর সতেরো বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ফুফু কেন, বেঁচে থাকতে মৌসীও বলত রূপে গুণে এমন মেয়ে হয় না, জাত বর্ণ দেখতে গেলে একটু উঁচু পর্যায়ের মানুষ ছিল মায়ের বাবা। তাছাড়া কাঠের ব্যবসায় তার অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। মৌসীর অন্তত বাপের বাড়ির গর্ব খুব ছিল। বলত তার বাবা গোঁড়া মানুষ হলে এ বিয়ে হত না। বাবার গুণী জামাইয়ের সাধ ছিল। জামাইয়ের গুণ দেখেই খুশি মনে তার হাতে মেয়ে দিয়েছিল।

হ্যাঁ, মায়ের পঞ্চমুখে প্রশংসা ফুফুও করত। তার মুখে শুনেছে তিতলির জন্মটাই নাকি এক আশ্চর্য ব্যাপার। তোর বাপ তো যতক্ষণ মাথা ঠিক থাকে পালা লেখে গান বাঁধে আর সুর লাগায়—আর বাকি সময় পেট-ভর শরাব ঠেসে মাতোয়ালা হয়ে থাকে—বালবাচ্চা হবে কি?

···বিয়ের চার বছর গড়িয়ে যায়, ছেলেপুলে হয় না, এ-দিকে মায়ের নাকি একটা বাচ্চার দারুণ সখ। শিউজীর মন্দিরে পুজো দিচ্ছে, মানত করছে, তাবিজ কবচ নিচ্ছে—কিন্তু কিছুই হয় না। একদিন মা স্বপ্ন দেখল ত্রিশূল হাতে জটাজুটধারী সাধু, তার অঙ্গ দিয়ে জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে—সে মাকে বলছে, বাচ্চা পেতে হলে তোর মরদকে তিন মাহিনা শরাব না ছুঁয়ে থাকতে হবে।

···এরপর বাপুর সঙ্গে মায়ের লড়াই। মা এমনিতে খুব ভালো কিন্তু সে নাকি দারুণ জিদ্দি মেয়ে ছিল। স্বপ্নের কথা শুনে বাপু প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। শেষে বিরক্ত হয়েছে, রাগ করেছে। তিন মাস ছেড়ে তিন দিনও সে মদ না খেয়ে থাকতে পারবে না। ওদিকে মাও নাছোড়। তিন মাসের জন্য মদ না ছাড়লে বাপুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, বাপের বাড়ি চলে যাবে। বাপু মাকে বুঝিয়েছে ওটা তার মনের চিন্তা, মা ভাবত অত বেশি মদ খায় বলেই বালবাচ্চা হয় না। মা অবশ্য তাই ভাবত, আর ফুফুকে সেকথা বলতও। বাপুর ধারণা ওই চিন্তা থেকেই মা অমন স্বপ্ন

দেখেছে। কিন্তু মা কোনো কথা শুনবেই না, তিন মাসের জন্য শরাব ছাড়তেই হবে। বাপু দু'দুবার চেষ্টা করেও পারেনি। দু'তিন দিন পরেই আবার আকণ্ঠ মদ গিলে মাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্য গায়ে হাত তুলেছে পর্যন্ত। মা তখন শেষ রাস্তা বেছে নিয়েছে। বাপু একদিন ঘরে ফিরে দেখে মা নেই। নেই তো নেই, কোথাও নেই। ফুফু বলে, মদ খেয়ে বাপু মায়ের ওপর অত্যাচার করত, শরাব পেটে পড়লে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। কিন্তু এমনিতে মাকে দারুণ ভালও নাকি বাসত। ভালো অবস্থায় মাকে চোখে হারাতো। মায়ের গানের গুরু বলতে গেলে তো বাপুই। বিয়ের আগেও মায়ের গানের ঝোঁক ছিল খুব, সুরেলা জোয়ারী গলা ছিল। কিন্তু মায়ের আসল শিক্ষা আর তালিম সব বাপুর কাছে। ফুফুরা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে, দারুব নেশায় বেএকতিয়ার হয়ে ঘরে ফেরার পরেও মাকে গানের তালিম দেবার ব্যাপারে কামাই নেই। আর তখন ভুলচুক হয়ে গেলে বাপু চড় মেরে মায়ের গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিত। অন্য সময় নেশা করেও গায়ে হাত তুললে মা ফুঁসে উঠত, কিন্তু তালিমে ভুল করে ও-ভাবে মার খেলেও কিছুই বলত না।

…যাক, সেই মা ঘর ছাড়া হতে বাপুর মাথায় প্রথমে খুন চেপেছিল। বাপের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যায়নি বুঝেছে। আক্রোশে ক'টা দিন শরাব ছাড়া আর কিছু পেটেই দেয়নি। শেষে আর থাকতে না পেরে মাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য শ্বশুর বাড়ি এসেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে তিন মাস মদ খাবে না। মা বিশ্বাস করেনি। অমন প্রতিজ্ঞা বাপু আরো কবারই করেছে। মা বলেছে, মুখের কথায় হবে না, বাজনা ছুঁয়ে আর সরস্বতীয়া মাইর নাম করে শপথ করতে হবে তিন মাস শরাব খাবে না।

বাপু শপথ করেছে। সত্যিই খায়নি। কিন্তু ওই তিন মাস তার হাতে মাকে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ভাবা যায় না। নেশার পিয়াস মাথায় চড়লে বাপু পাগলের মতো হয়ে যেত। তখন কি মার মারত মাকে, মেরে এক একদিন আধমরা করে ফেলত। কিন্তু মা মুখ বুঁজে এই অত্যাচার সহ্য করত। বাপুর নেশার কষ্ট কমানোর জন্যে কতভাবে চেষ্টা

করত ঠিক নেই—বয়েদের কাছ থেকে এ জন্যে ওষুধও নিয়ে আসত। রেগে গিয়ে বাপু এক-একদিন সেই ওষুধ মায়ের মুখে ছুঁড়ে মারত।

…তিন মাস কাটার আগেই মা বুঝেছিল পেটে বাচ্চা আসছে। কিন্তু তিন মাসের আগে বাপুকে কিছুই জানতে দেয়নি।

এই করে তিতলির জন্ম। এই আদরের নাম বাপুই নাকি রেখেছিল। তিতলির একটা পোশাকী নামও আছে। কেশর। কিন্তু অপরে ছেড়ে এই নাম সে নিজেই ভুলতে বসেছে।

ও আসার পর আনন্দের চোটে বাপু নাকি বলেছিল মদ আর খাবেই না। কিন্তু তিন মাস বাদে মৌজের জন্য একটু আধটু খেতে শুরু করে আগের থেকেও ভয়ংকর শরাবী হয়ে উঠল। ডবল মদ খেতে লাগল। আর নেশা চড়লেই তার বাদশাই মেজাজ। পানের থেকে চুন খসলে মাথায় রক্ত চড়ে। মারের চোটে তখন হাড় কালি। আর এত শরাব খেলে পালা লেখা গান বাঁধা আর সুর বাঁধার কেরামতি কমতে বাধ্য। নোটঙ্কী দলের কর্তারাও তার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। বাপুর রোজগার কমতে লাগল। এমনিতেই মাকে খুব কষ্ট করে সংসার চালাতে হত। তার ওপর তিতলি আসাতে খরচ বেড়েছে। কিন্তু বাপুর রোজগারের বেশির ভাগ তো নেশাতেই চলে যেত। সেই রোজগারও কমছে অথচ নেশা বাড়ছে। বাপুর নিজের প্রতিভার গুণে আর মায়ের গানের টানে বাড়তি কিছু বড়লোক সমজদারের আনাগোনা ছিল। এদিক থেকে বাপু কোনো সংস্কারের ধার ধারত না, তারই শিক্ষায় আর তালিমে বহু এমন মন-মাতানো গান গায়, সে কি কাউকে না শুনিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজে গাইবার জন্যে? নিজে শোনার জন্যে? এই পয়সাঅলা সমজ-দারদের কয়েকজনকে নিয়ে বাড়িতে প্রায়ই গানের বৈঠক বসত। মাও আপত্তি করত না, খুশি মনেই অতিথিদের গান শোনাতো। লজ্জারই বা কি আছে, ওই সমজদারদের বহুরাও তো গান শুনতে আসত, দারুণ তারিফ করত, আর তেমনি ভালও বাসত।

…কিন্তু মা বাসন্তী দেখত, রোজগারে টান পড়লেও বাপুর নেশার রসদের অভাব হত না। বুঝতে পারত, রসদ বাপুর ওই রহুয়া দোস্তরাই

যোগাতো।

···পনেরো ষোল বছর বয়সে হতে হীরা-ফুফুর মুখে মায়ের জীবনের মর্মান্তিক পরিণামের কথা শোনার পর থেকেই বাপুর ওপর তার কান বিষিয়েছে, মন বিষিয়েছে। বাপুকে সে ভীষণ ঘৃণা করে।···তার অত্যাচারে উৎপীড়নে পাগল হয়েই তিতলিকে নিয়ে মা বাসন্তীয়া ঘর ছেড়েছিল, বাপকে ছেড়ে চলে গেছল। তিতলির তখন বছর দেড়েক মাত্র বয়েস। দুধটুকুও জুটত না। নেশার আগুন মাথায় চড়লে বাপু মাকে কোনদিন হয়তো খুন করেও ফেলতে পারত। কারণ মায়ের মেজাজও তখন ভীষণ তিরিক্ষি। বাপুকে কথার আগুনে ঝলসে দিতে চাইতো। ফুফু নিজেও বানোয়ারা গ্রামে গিয়ে মায়ের ওপর বাপুর সেই অকথ্য অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছে, আর অত মারের পরেও মায়ের তেজ দেখেছে। বাপু নাকি তখন বানোয়ারা গ্রামেই থাকত।

...ফুফুর মুখ থেকেই তিতলি অনেক পরে জেনেছে ওকে নিয়ে বাবার কাছ থেকে পালিয়ে মা মামাবাড়ি যায়নি, এখানে বা মৌসীর কাছেও আসেনি। বাবার সেই বড়লোক দোস্তদের একজনের আশ্রয়ে ছিল, মায়ের গান শুনে মুগ্ধ হত যারা তাদের একজন। বাপু তার বা মায়ের নাগাল পেতে চেষ্টা করেছিল কিনা বা কতটা চেষ্টা করেছিল ফুফু জানে না। মাস দুই তিনের জন্য নিজেই সে এরপর কোথায় চলে গিয়েছিল। তারপর বানোয়ারা গ্রাম ছেড়ে বাপু বরাবরকার মতো এই চুপা গাঁওয়ে চলে এসেছে। তখন থেকেই তার মাথায় গোলমাল দেখা দিতে শুরু করেছে। হাতে টাকা এলে শরাব ছাড়া আর কিছু বড় খেত না। টাকা না থাকলে আরো ক্ষেপে যেত। কিন্তু টাকা এখানে বসেও বাপু মন্দ রোজগার করেনি। তার খ্যাতি তো সর্বত্র ছড়িয়েছিল। তখন পালা-টালা আর লিখত না, কিন্তু মন দিলে তখনো চমৎকার গান বাঁধতো, সুর লাগাতো। তাই নোটঙ্গী দলের অনেকে তার কাছে আসত। কিছু রোজগার হত। তাছাড়া এখানে দু-একজন ভক্তও জুটেছিল। তাদের মধ্যে তোতারাম একজন। তার বাস ছিল লোহার গাঁওয়ে। এখানে এসে ঠাকুর ব্রিজমোহনের নেক নজরে পড়ে গেছল। তার আশ্রয়েই থেকে

গেছে, তার কাজকর্ম দেখে শোনে। ঠাকুর ব্রিজমোহনের ছিকরেটারি বলে নিজের পরিচয় দেয়। অনায়াসে গরিব বড়লোক সকলের ঘনিষ্ঠ আর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, এমন একটি চৌকস লোক ব্রিজমোহনের দরকার ছিল। লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ কুন্দন সিংয়েরও সে স্নেহের পাত্র তার ঘরের খবর মনের খবর রাখে—এ জন্য ব্রিজমোহনের কাছে তার সব থেকে বেশি কদর। তোতারামের গান বাজনার খুব সখ ছিল, আর তিতলির বাপের নাম ডাকও শোনা ছিল। এই সুবাদেই তার আনাগোনা আর বাপুর ভক্ত হয়ে ওঠা। তোতারামের গান-বাজনার নেশা অবশ্য অনেক দিনই গেছে, তার বদলে গাঁজাভাঙের নেশা অনেক প্রিয় হয়ে উঠেছে। তবু কেবল এই একজন ভক্তই বাপুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি। আসে, দেখাশোনা করে বাপু অসুস্থ হয়ে পড়লে ব্রিজমোহনের নাম ভাঙিয়ে বয়েদ (চিকিৎসক) ধরে নিয়ে আসে। বাপু রেগে গিয়ে মারতে এলে বা গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে চাইলেও তোতা-চাচা রাগ করে না—বেরিয়ে এসে হাসে।

···বাপুকে ছেড়ে চলে যাবার ঠিক দু'বছর পরে—তিতলির যখন সাড়ে তিন বছর বয়েস—মা বাসন্তীয়া একদিনের কয়েক ঘণ্টার জন্য এই ছুপা গাঁওয়ে বাপুর কাছে এসেছিল। তার আসার খবর ফুফু বা মৌসীও জানতো না। পরদিন জেনেছে।···এক সন্ধ্যার অন্ধকারে তিতলিকে নিয়ে এসেছিল।

তাকে বাবার কাছে রেখে যাবার জন্যই এসেছিল। মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তা করেই মা আর ওকে নিজের কাছে রাখতে চায়নি। ওকে রেখে রাতের অন্ধকারেই আবার চলে গেছে।···পরদিন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিতে মেয়ের হাত ধরে বাপু মৌসীর কাছে হাজির। তখনই মৌসী আর ফুফু জেনেছে, মা এসেছিল, মেয়েকে রেখে আবার চলে গেছে।···না, সাড়ে তিন বছর বয়সের এ-সবের কোনো স্মৃতিই তিতলির কল্পনাতেও নেই। সে হয়তো তখন ঘুমোচ্ছিল। বাপু তখনকার মতো ওকে মৌসীর কাছে রেখে চলে গেছল।

···আট ন' বছর বয়সে তিতলি মৌসীর মুখে শুনেছিল, এর পনেরো

বিশ দিন বাদে মায়ের মৃত্যুর খবর এসেছিল। মায়ের মারী (বসন্ত) রোগ হয়েছিল, তাইতে মারা গেছে।

…আর ষোল বছর বয়সে জেনেছে মৌসী সত্যি কথা বলেনি। আর জেনেছে মা ওকে নিয়ে যেখানে ছিল সেটা ওর মামা-বাড়ি নয়। যার কাছে এই দু'বছর ছিল সে-ও তার মামা নয়। আর জেনেছে, মায়ের মৃত্যুর খবর পনেরো বিশ দিন বাদে আসেনি, এসেছিল ওকে বাবার কাছে রেখে যাবার তিন দিনের মধ্যে।

…আর জেনেছে, তার মা বাসন্তীয়া মারী রোগে মারা যায়নি। মা আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েই এখানে এসে ওকে বাপুর কাছে রেখে গেছে।

সব ফুফু বলেছে। তাকে আর মৌসীকে খবরটা জানিয়েই বাবা পাগলের মতো বেরিয়ে গেছল। তারপর মাস দেড় দুই তাকে আর কেউ ছুপা গাঁওয়ে দেখেনি। আবার যখন ফিরেছে তখন অনেক ঠাণ্ডা। এন্তার মদ খেত, কিন্তু নেশা চড়লে মাথায় আগুন জ্বলত না। গুম হয়ে থাকত। এখনো বেশিরভাগ সময় যেমন থাকে। মেয়ের কথা ভেবেই হয়ত কাজেকর্মে মন দিতে চেষ্টা করেছে। কিছুকালের জন্য পেরেওছে। এই সুযোগেই বাপুকে নিয়ে ফুফু নোটঙ্গী দল খুলেছিল। বেশ ভালোই করছিল। কিন্তু তারপর আবার বাপুর মাথা বিগড়তে শুরু করেছিল। সারাক্ষণই মদে ডুবে থাকে, থাকতে চায়। থাকেও। তিতলির দশ এগারো বছর বয়সের মধ্যে এই দলও ভেঙে গেছে।

বাপুর ধারে কাছে এখন আর কেউ ঘেঁষে না। এক তোতারাম আর তিতলি ছাড়া। ফুফুও তাকে এড়িয়েই চলে। বলে, যাব কি, দেখলেই তো টাকা চাইবে। কিন্তু তিতলির ধারণা, যে কারণেই হোক বাপুকে ফুফু একটু ভয়ই করে। নোটঙ্গী দল চালিয়ে ফুফু কত টাকা জমিয়েছে কোনো ধারণা নেই। হয়তো ভালো টাকাই হবে। নইলে এখনো এত সচ্ছলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে কি করে? তার কাছে যে ক'টা মেয়ে নাচ-গানের তালিম নিতে আসে তারা বলতে গেলে গরিবেরই মেয়ে। কি আর দিতে পারে। এছাড়া ফুফুর অন্য পথে কিছু উপার্জন আছে। সুদে টাকা খাটায়। কিন্তু

এই উপার্জনও বড় চালে থাকার মতো কিছু নয়। অথচ এই এলাকার মধ্যে ফুফুকেই লোকে কিছু পয়সার মানুষ ভাবে। লোকে কেন, বাপুও ভাবে। খেয়াল হলে হঠাৎ-হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। খুব কমই অবশ্য। কিন্তু ফুফু তখন তটস্থ হয়ে থাকে। বাপু সোজা মেয়ের ঘরেই চলে আসে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে কোথাও কিছুর ত্রুটি আছে কিনা। তারপর ওকে জিগ্যেস করে, ভালো খাওয়া-দাওয়া জামা-কাপড় সব পাচ্ছিস তো?

জাঁদরেল ফুফুর ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে তিতলির মজা লাগে আবার অবাকও হয়। ওর জবাবের ওপর যেন তার বাঁচা-মরা। তিতলি অবশ্য সব-সময়েই বলে ফুফু ওকে দারুণ ভালো রেখেছে। বাপু চলে যাবার পর ফুফু ঠেস দিতে ছাড়ে না, বলে রাজকন্যের হালে মেয়েকে রাখা হয়েছে, তবু যাচাই করা চাই, এত যখন দরদ নিজের কাছে নিয়ে রাখলেই তো পারে!

তিতলির মুখেও তখন সাফ কথা।—এ রকম শোনার পরেও তুমি এই দায় ঘাড়ে নিয়ে আছ কেন, পাঠিয়ে দিলেই তো পারো?

ফুফুর তক্ষুনি নরম মুখ আর মাখন-গলানো কথা।—তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না জানে বলেই তো তোর বাপের এত লম্বা-লম্বা কথা—তুই রাগ করিস কেন, তুই আমার কতখানি জানিস না?

…তিতলি মোটামুটি জানে। আঁচ করতে পারে। পারে বলেই ফুফুর ওপর তার এতটুকু টান নেই, মায়া নেই।…যে মেয়েগুলো ফুফুর কাছে নাচ গান শিখতে আসে, তাদের ভবিষ্যতের বেসাতি কি হবে তিতলি তা খুব ভালো করেই অনুমান করতে পারে।…তিতলির খাওয়া-পরা সাজ-পোশাক গান-বাজনার দিকে ফুফুর প্রখর নজর। সে-দিক থেকে রাজকন্যার হালেই তাকে রাখা হয়েছে। তার জন্যে ফুফুর অনেক খরচ হয় সত্যি কথাই। কিন্তু সেই কবেকার নোটঙ্গী দলের জমানো টাকা থেকেই তার জন্য এত খরচ হচ্ছে তিতলি বিশ্বাস করে না।…কোথা থেকে টাকা আসে। কোথা থেকে আসে ইদানীং তিতলি তা-ও আঁচ করতে পারে।…ঠাকুর ব্রিজমোহনের প্রশংসায় ফুফু সর্বদা পঞ্চমুখ। তার

মতো হিম্মত আর দিলের মানুষ দশখানা গাঁও ঢুঁড়লেও নাকি একজনকেও পাওয়া যাবে না। তোতাচাচা তার দয়ায় আর পিয়ারের মানুষ সে এ-কথা বলতে পারে—কিন্তু ফুফু বলে কেন? স্বার্থ না থাকলে এই ফুফু কি মুখের কথাও খরচ করতে চায়?

…ভাবনাটা আরো টেনে বাড়ালে তিতলির মাথা গরম হয়ে যায়। রক্তে আগুন জ্বলে।…বাপুই বা কোন্ জোরের ওপর ভরসা করে মেয়েকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা হয়েছে কিনা দেখতে আসে? তার নিজের তো এক-পয়সা রোজগার নেই, গান-বাঁধা আর সুর-বাঁধা সেই কবে থেকে বন্ধ। তাহলে তার নেশার টাকা কে যোগায়? কাঁচা শরাবের বোতল তিতলি খুব ভালো চেনে। অচ্ছুতপাড়ায় থাকে, চিনবে না কেন? তাছাড়া মাসির ঘরেও ও-রকম দু'চারটে বোতল মজুত থাকে। থানাদার হাবালদার বা ফুফুর চোখে সে-রকম বিশিষ্ট কেউ এলে তাদের আপ্যায়নের জন্য ঘরে রাখতে হয়। কিন্তু বাপুর ওই ঘরে ঢুকলে দু'চারটে খালী দামী বিলায়েতী বোতল হামেশাই গড়াগড়ি খেতে দেখে। এ-দেশের তৈরি যে-সব দামী জিনিস বড়লোকেরা খায় তাকেই ওরা বিলায়েতী বলে। তোতাচাচার মুখেই শুনেছে এ-সব জিনিসের অনেক দাম।…এ-সব জিনিস ওর আধা-উন্মাদ বাপুকে কে পাঠায়, কেন পাঠায়?…বাপুর ওই দুটো ছাপরা ঘরের একটা ভেঙেচুরে এখন মাটির সঙ্গে মিশতে চলেছে। কিন্তু অন্যটা, যেটাতে বাপু থাকে সেটা বরষাতের আগে প্রতি বছর মেরামত করা হয়, নতুন করে ছাওয়া হয়। এটা হয় তোতাচাচার তদারকিতে। তিতলি জিগ্যেস করলে বলে তোর ফুফু টাকা দেয়। কিন্তু ফুফু কত দেবার মেয়ে সেটা ওর থেকে ভালো আর কে জানে?

তাহলে কে দেয়?

কেন দেয়?

বাপু কোন্ জোরের ওপর দাঁড়িয়ে ফুফুর ওপর চোখ লাল করে মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবর নিতে আসে?

তোতাচাচা এখনো বাপুর কাছে আসে কেন? কেবল গুরুভক্তি?

রাগে দুঃখে এক-এক সময় তিতলির বুকের ভিতরটা ফেটে যেতে

চায়।···ঠাকুর ব্রিজমোহন বড় হিম্মত আর মস্ত দিলের মানুষই বটে। তোতারামের মাথা কিনেছে, ফুফুর মাথা কিনেছে, বাপুর মাথাও কিনেছে।

আবার হিহি করে নিজের মনে হেসেও ওঠে এক-এক সময়।··· সকলের সব আশার ফানুস আশমানেই চুপসে যাবে। কারো নাগালের মধ্যে আসবে না।···ওর নাম তো তিতলি।···পরজাপতি। তিতলির পরমায়ু কতটুকু? ক'দিন বাঁচে?···মা বাসন্তীয়া বড় দেরিতে বাঁচার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। ওর দেরি হবে না। সেই দিন আসুক। ও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত বলেই অনায়াসে এমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছে। এই মাটির দুনিয়ায় আর পরোয়া করে চলার মতো কে আছে?

···বাপুকে ঘৃণা করে, কিন্তু আশ্চর্য, মাঝে মাঝে এসে তাকে না দেখে গিয়েও পারে না।···গুণ তো ছিল। অনেক গুণই ছিল। সেই গুণে ওর মা-কেও বশ করেছিল। কিন্তু শরাবে মাথা খেয়ে দিয়েছে। মাথা গেলে আর থাকে কি? এই মাথার মানুষের সামনে শরাবের বোতল নাচালে সে পৃথিবী বিকিয়ে দিতে পারে।

ঘরের শেকল তোলা দেখে তিতলি ঢিমেতালে ফিরে চলল। ঘর বন্ধ মানে বাপু জঙ্গলে। পনেরো বিশ গজ এগোতেই পিছন থেকে হাঁক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—এ তিত্‌লিয়াঁ—রুখ্‌ যা।

তিতলি ঘুরে দাঁড়ালো। জঙ্গলের দিক থেকেই শ্লথ পায়ে বাপু আসছে। শুখা গাছের মতো এখনো মস্ত কাঠামোর মানুষ। এক হাতে লোহার ডাণ্ডা। তিতলির সন্ধিৎসু চোখ তার অন্য হাতের দিকে। ওর ধারণা, নেশার রসদে টান পড়লে বা বৈচিত্র্যের খোঁজে বাপু নেশার শেকড়-বাকড় বা গাছ-পাতার তল্লাসীতে যায়। জঙ্গলে তো কত কিছুই থাকে। কিন্তু তার অন্য হাত খালি।

সামনে এলো। দু'চোখ ভেজা-ভেজা রকমের টকটকে লাল।—তু কাঁহা চলথ?

তিতলি জানান দিল, এমনি এসেছিল, দরজা বন্ধ দেখে চলে

যাচ্ছিল।

—তো আ যা···

তিতলি মাথা নাড়াল। এই বাপকে বেশিক্ষণ বরদাস্তও করতে পারে না।···সাঁনঝ ভৈলী, অব চলনু···

কি মনে পড়তে লাল চোখ আরো লাল। গলাও চড়ল।—তোতা গোঁহার গাঁওমে ঘুমকে আগইল কি নহী?

—হম না জানলী···

বাপুর মেজাজ আরো তিরিক্ষি।—ওকরাসে দেখনেসে কহ দিবি ও শ্বশুরকা মু হম্ না দেখবু!

ক্রুদ্ধ পায়ে নিজের ডেরার দিকে চলল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তিতলি উল্টো দিকে পা বাড়ালো। রসদে টান পড়েছে বলেই বাপুর এই ঝাঁঝ। রসদ কোথা থেকে আসে আর কেন আসে আঁচ করতে পারে বলেই তিতলির মুখও খানিকক্ষণের জন্য গনগনে লাল।··তিতলির আয়ু কম, কিন্তু তার আগে ওই ব্রিজমোহনের পরমায়ু কিছুটা ছেঁটে দিয়ে যেতে পারলে মনে আর কোনো খেদ থাকত না।

ফুফুর ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে তোতারাম আড্ডা দিচ্ছে। তিতলিকে দেখে খুশির উচ্ছ্বাসে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, আ যা মেরে মুনিয়া, হম তোঁহারি লিয়ে বৈঠল রহল।

ঘরের মাঝামাঝি এসে তিতলি দু' হাত কোমরে তুলে চোখে চোখ রেখে জবাব দিল, ডাণ্ডাসে ঠাণ্ডা করত্ বারে (করার জন্য) তুঁহারে খাতির বাপু আঙ্গনামে খারত্ বহল।

ছোট চোখ জোড়া একটু বড় আর গোল করার চেষ্টা তোতারামের। জানতে চাইলো, ঘর তো বন্ধ ছিল, গুরুজীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল। রাস্তায় ফেরার পথে শুনে নিশ্চিন্ত। মন্তব্য করল, তব্ ঠিক হ্যায়।

তিতলি তক্ষুনি বুঝে নিল কেন সব ঠিক হ্যায়। যে রসদের টানে বাপুর ওই গরম মেজাজ, ঘরে গেলেই সে তা পেয়ে যাবে আর ঠাণ্ডা হবে। অর্থাৎ তার 'চীজ' সে ঘরে রেখেই এখানে এসেছে। কিন্তু তোতারামের ওপর তিতলির বড় একটা রাগ হয় না, বরং ভালো লাগে,

মজাও পায়। বেচারা তোতাচাচা, অন্যের মন যুগিয়ে চলার পরিণামেই এমন মজাদার মানুষটার জীবন কেটে যাচ্ছে। গম্ভীর মুখে জিগ্যেস করল, লোহার গাঁওসে কব্ আইল ?

—আজ দুফরমে।

হাসি গেলার চেষ্টায় তিতলির গম্ভীর মুখে লালচে আভা। তার পরের প্রশ্ন, লোহার গাঁও থেকে ফিরতে এত দেরি হল কেন, সেখানে দুলারীর সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা, আর দুলারীর আপনা আদমী সত্যি ঘরে ফিরেছে কিনা।

শুনে তোতারাম দু' চোখ গোল করে রোগা লম্বা দেহটা টান করে বসল। তিতলি কি বলছে ঠিক-ঠিক মগজে ঢুকছে না যেন।—দুলারী লোহার গাঁওমে!···কব গইলী ?

—রথ্‌সাবন্ধনকা দুফরে···

ফ্যাল ফ্যাল করে আরো খানিক ওর দিকে চেয়ে তোতারাম হীরা মল্লার দিকে ফিরল।—সাচ্ হীরা দিদি ?

হাসি গোপন করার চেষ্টায় হীরা মল্লা গালে হাত দিয়ে আর একদিকে চেয়ে ঘরের কিছু দেখছে। মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ, সেই রকমই শোনা যাচ্ছে।

এই ফাঁকে তিতলি আরো একটু গম্ভীর হতে পেরেছে। না থেমে গড়গড় করে সমাচার শুনিয়ে গেল।···লোহার গাঁওয়ের রহুয়া কুন্দন সিং-এর রাখীবন্ধনের ভেট নিয়ে যে লোকটা ব্রিজমোহনের কাছে এসে ছিল, ফেরার সময় তার সঙ্গে দুলারীর ডগরে (পথে) দেখা হয়েছিল। সে বলেছে, খুব সম্ভব দুলারীর মরদ ঘরে ফিরেছে, তাদের কানে এই-রকম একটা কথা এসেছে, তবে একেবারে ঠিক-ঠিক জানে না। শুনে দুলারীর নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত তর সয়নি, বাপের কথায় কান না দিয়ে বয়েল গাড়ি ভাড়া করে আধে ঘন্টির মধ্যেই লোহার গাঁওয়ে রওনা হয়ে গেছে—এখনো ফেরেনি।···তবে তোতাচাচা সেখানে গিয়ে দুলারীর সঙ্গে দেখা করতে যায়নি ভালোই হয়েছে, দুলারীর সেই আধা-পাগল মরদ যদি সত্যি ঘরে ফিরে থাকে, সে হয়তো তোতাচাচার মাথা ফাটিয়ে দিত, আর

সেটা খুব আফসোসের বাত্ হত।

তোতারামের লম্বা শরীরটা মাচিয়ায় দুলছে, সে যেন একটু শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। এই সমাচার শুনে তার দেহের খাঁচা থেকে প্রাণের আধখানাই বেরিয়ে গেছে বুঝি। গলা দিয়ে দুটো অস্ফুট শব্দ বেরুলো, দুলারী বেইমান··· !

দুলারী এই গাঁয়ের প্রৌঢ় পাঠশালার মাস্টার চুনীলালের মেয়ে। ঘরে মা নেই, আর বাপ পাঁচতালে থাকে বলে মেয়ের সময়ে বিয়ে হয়নি। চুনীলাল বি এ পাশ, লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের পাঠশালার মাস্টারজী ছিল, কৌশল করে সেখান থেকে তাকে ছাড়িয়ে এনে ব্রিজমোহন বেশি মাইনে দিয়ে এখানকার পাঠশালায় ঢুকিয়েছে। সে-জন্য নাকি চুনীলালের ওপর কুন্দন সিংয়ের খুব রাগ। ভয়ে আর সে লোহার গাঁওয়ের পথ মাড়ায় না। দুলারীর তখন একুশ বছর বয়েস। বেশ কালো আর মোটা-সোটা, কিন্তু মুখখানা মিষ্টি। এখানে আসার পর তোতারামের দিক থেকে প্রায় বছরখানেকের চেষ্টায় দুলারীর সঙ্গে তার ভাব-সাব এবং বিয়ে পাকা। আরো দশ বছর আগের কথা, তোতারামের তখন বছর তিরিশ বয়েস। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন আগে তোতারাম এমন একখানা কাণ্ড করে বসল যে চুনীলাল মাস্টার ভাবী-জামাইকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়ালো, আর বিয়ে তো বন্ধ করলই।

দোষের মধ্যে তোতারামের অল্প বয়েস থেকেই ভাঙের নেশা। ভাঙের মৌজ এলে তার হাত দুটো ডানা হয়ে আকাশে ওড়ে। সেই সময়েই দিল্লীর বড়ে সরকার থেকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর নাস-বন্দীর হিড়িকের ঢেউ গ্রামে গ্রামেও ভেসে এসেছে। ওই সরকারী লোকদের ধরা-করার ফলে এ-ব্যাপারে ছুপা গাঁওয়ের হাল ধরেছে পাঠশালার মাস্টারজী চুনীলাল। শিক্ষিত, বি-এ পাশ, তার ওপর নিজের একটা মাত্র মেয়ে, নাস-বন্দীর সপক্ষে প্রচারে নামার যোগ্যতা গাঁয়ে আর কার আছে? এ নিয়ে চুনীলাল একটু বেশিই মেতে উঠেছিল। সংস্কারান্ধ গ্রামবাসীদের এটা খুব পছন্দ হয়নি। তারা বলত, মাস্টারের বউ নেই তাই এক মেয়ে, থাকলে আরো কত ছেলে-মেয়ের বাপ হত কে জানে। কানে এলে

চুনীলালও ফুঁসে উঠত, তার বিবেচনা আছে বলেই এক বউ মরার পর অন্য বউ হয়নি, বিবেচনা না থাকলে অন্য বউ আসত আর গণ্ডায় গণ্ডায় বাল-বাচ্চা হত। এ-ব্যাপারে ভদ্রলোকের উৎসাহ একটু প্রবল হয়ে উঠেছিল সেটা সত্যি।

…ভাঙের নেশার ঝোঁকে আর নেশার বন্ধুদের উৎসাহে এই নাস-বন্দী নিয়ে তোতারাম একটা গান বেঁধে ফেলেছিল। না পারার কি আছে, সে হল গিয়ে বলদেও মল্লার শিষ্য। আর সেই নেশার মৌজেই দোস্তদের সঙ্গে বাজা ধরে সকলকে নিয়ে ঢোলক বাজিয়ে সেই ছড়ার গান বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবী শ্বশুরকে শুনিয়েছিল। তাইতে হৈ-চৈ পড়ে গেছল। আর তাইতেই ভাবী শ্বশুরের রাগে বিয়ে বরবাদ।

সেই গানের ছড়াটা হল :

'বাপ্ তবাহে বেঝাসে
দেশ তবাহে নেতাসে
জমিন গা-ই চক্‌বন্দীসে
(আরে ভাই) শ্বশুরা গা-ই নাস-বন্দীসে।'

সাদা কথায়, বাপ নষ্ট হয় তার ছেলের জন্যে, দেশ নষ্ট হয় নেতার জন্যে, জমিন নষ্ট হয় মাপ-জোক আল বাঁধার জন্যে, আর শ্বশুর বে-ইজ্জত হয় নাস-বন্দীর ধুয়া ধরে।

…ভাঙের নেশায় ঢোল বাজিয়ে ভাবী শ্বশুরেব ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে এই গান তোতারাম গেয়েছিল।

তারই ফলে ভাবী শ্বশুরের দুর্জয় ক্রোধে বিয়ে নাকচ।

…রাগে দুঃখে অভিমানে দুলারী ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল। ওই বয়সের মেয়ে ঘর ছাড়লে সমাজ তাকে আর ঘরে ফেরার ছাড়পত্র দেয় না। কিন্তু দুলারী চলে গেছল লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিংয়ের আশ্রয়ে। সে তাকে ছেলেবেলা থেকেই জানত। তোতারামের এ-দিকে দুঃখে আর অনুশোচনায় অর্ধমৃত দশা।

মাস দুইয়ের মধ্যে কুন্দন সিং চুনীলাল মাস্টারের পাঠশালা ছেড়ে যাবার বদলা নিয়েছে। তার লোক এসে চুনীলালকে খবর দিয়েছে, রহুয়া

কুন্দন সিং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্বজাতের এক ছেলের সঙ্গেই তুলারীর বিয়ে দিয়েছে। তার সাহস থাকে তো লোহার্ গাঁওয়ে এসে এ নিয়ে হামলা করুক। শুনে চুনীলালের অবস্থা কাহিল। মা-মরা একমাত্র মেয়েকে সে প্রাণ দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু লোহার গাঁওয়ে যাওয়ার হিম্মত তার নেই। তার ওপর মেয়ে চিঠি লিখেছে, তার এখানে এসে কাজ নেই, রহুয়া কুন্দন সিং পছন্দ করবে না তো বটেই, জামাইকে নিয়েও একটু ভাবনার ব্যাপার দেখা দিয়েছে—তার মতি-গতির ঠিক নেই।

আর মাস তিনেক না যেতে যে-খবর, চুনীলালের মাথায় হাত। কুন্দন সিং তার ওপর রাগ পুষে যে ছেলের সঙ্গে তুলারীর বিয়ে দিয়েছে, সে আধা-পাগল। বলা নেই, কওয়া নেই, ঘরবাড়ি ছেড়ে সে কোথায় চলে গেছে, কবে ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কি ফিরবে না কেউ জানে না। তুঃখে বাপের বুক ভাঙার দশা শুনে তুলারী ফিরে এসেছে। তার কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁতুর, হাতে গলায় কিছু গয়না। চুনীলালমাস্টার মেয়েকে দেখে হাউ-হাউ করে কান্না। মেয়েই বরং বেশ শক্ত আর ঠাণ্ডা। বাপের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সে-ই বুঝিয়েছে, তার জামাইয়ের মাথায় একটু ছিট থাকলেও সে লোক খারাপ নয়, সে তু'দিন আগে হোক পরে হোক নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু দশ বছরের মধ্যেও আসেনি।

তার এখনো সধবার বেশ। এখনো বাপকে বলে জামাই ঠিক আসবে। বেশিরভাগ সময় সে এখানে বাপের কাছেই থাকে। মাঝে মাঝে দিন-কতকের জন্য নিজের ঘর আর সামান্য জমি-জমা যা আছে দেখতে যায়। আর এখানে বাপের কাছে যখন থাকে রহুয়া কুন্দন সিংয়ের একজন বিশ্বস্ত বুড়ো মানুষ তার বাড়ি-ঘর আর ক্ষেতির তদারক করে।

···সেই পরস্ত্রী তুলারী এখনো তোতারামের প্রেয়সী। বাপের অনুপস্থিতিতে গোড়ায় গোড়ায় তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তুলারী নাকি ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসত। বাপ তো বাড়িতে কমই থাকে, সরকারের সমাজসেবার বায়ু এখনো তার মাথায় চেপে আছে। বিনা পয়সায় কত রকমের কাজ করে, তু'চার দিন পাঠশালা ছুটি থাকলে

কোথায় কোথায় বক্তৃতা করতে আর সেবার কাজ দেখতে চলে যায়। বড় ছুটিতে তো পাটনায় গিয়েই বসে থাকে, সেবা-প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তাদের সেখানেই ঘাঁটি। সাচ্চা কর্মী হিসেবে তারা তাকে খাতির করে, তাকে নিয়ে সরকারী অফ্‌সারদের সঙ্গে দেখা করে নানা রকম সাহায্যের জন্য তদবির করে।

এদিকে তোতারামের ধৈর্যের শেষ নেই, আর দুলারী অনেক সময়েই একলা থাকে বলে সুযোগ সুবিধেরও অভাব নেই। দুলারী এখন ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে না, আর ভিতরে ভিতরে একটু নরমও হয়েছে। যা-ই হোক, লোকটাকে এক-সময়ে পছন্দ তো করত। কিন্তু সেটা কক্ষনো বুঝতে দেয় না। দরকার পড়লে অনায়াসে তাকে চাকর বাকরের মতোই খাটায়। রেগে গেলে দূর-দূর করে তাড়ায়। কিন্তু তোতারাম কোনো কিছুই গায়ে মাখে না। দুলারীকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলে আর তার জন্য কিছু করতে পারলে মহা শান্তি। এ নিয়ে গাঁয়ে কথা যে কিছু ওঠে না এমন নয়, কিন্তু দুলারী কাকে পরোয়া করে। লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ কুন্দন সিং তার পিছনে, তোতারাম ছেড়ে অনেককেই সে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসার হিম্মত রাখে। বাপের অনুপস্থিতিতে রাতেও নাকি তোতারামকে অনেক অনেক দিন চুনীলালের ডেরার সামনে ঘুরঘুর করতে দেখেছে। তোতারামকে জিগ্যেস করলে সে অস্বীকার করে না, বলে ভাঙের নেশায় কখন কোন্ দিকে বা কার ডেরার দিকে যায় দিনের বেলায় তা কি আর মনে থাকে? আর, দুলারীকে কারো কিছু জিগ্যেস করার সাহসই নেই। সোয়ামীর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে বত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল এখন, তার মেজাজের ভয়ে পড়শীরা ছেড়ে বাপসুদ্ধু কাঁপে।... দুলারীর সঙ্গে জনার্দন পূজারীর মেয়ে সীতিয়ার গলায় গলায় ভাব—যদিও দুলারী ওর থেকে কয়েক বছরের বড়। দু'জনের উনিশ-বিশ একই অদৃষ্ট। তোতারামকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে হাসি-মস্করাও হয়। দুলারী সীতিয়াকে প্রায়ই নাকি বলে, লোকটার জন্য দুঃখ হয়, ওর জন্যে যেমন হোক একটা মেয়ে যোগাড় করে দে না, সিঁথির সিঁদুর তুলে আমি তো ফের আর ওকে বিয়ে করতে পারি না—পিয়ার না হাতী, মেয়ে পেলে বিয়ে

করার জন্য এখনো পাগল হয়ে আছে—পায় না বলেই এখানে ছোঁক-ছোঁক করে আসে।

দিদিয়ার মুখ থেকে লছমী শুনে হেসে গড়িয়ে তার সহেলি তিতলিকে এই গল্প করে।

···ছুলারী সত্যিই লোহার গাঁওয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। কিন্তু তার নিপাত্তা পাগলা মরদ ফিরে এসেছে শোনার গল্পটা তিতলির এহ মুহূর্তে বানানো।

তোতারাম ঢ্যাঙা শরীরটা মাচিয়া থেকে টেনে তুলল। —অব্ চলনু, নিদ আহ্লী

এই শোকার্ত মূর্তি দেখে তিতলি এখনো হাসি চেপে আছে। কৌতুকের ছলে এবার হীরা মল্লা বলল, এ সাঁঝোঁয়ামে তোঁহার নিদ আইল! কা রহুয়া কুন্দন সিং তোঁহার শোনে কা লিয়ে কুছ খাস বন্দোবস্ত না করল?

ঝিমুনো চোখ ছুটো টান করে তোতারাম একবার তিতলিকে দেখে নিল। তারপর আধা-আধি হীরা মল্লার দিকে ফিরে ছোট জবাব দিল, কা কহি হীরা দিদি, ভোজরাজ ওইসন বিস্তরোঁমে কভু না শুত্লি—

হীরা মল্লা যথার্থ উৎসুক একটু। —কাহে তোতাজী?

এবার অল্প টানা গলায় বড়লোক কুন্দন সিংয়ের মোকানে রাজসিক শোয়ার কথা বলে গেল তোতারাম।—হমাকে শুতে খাতির খাইলম্মে (ঢেঁকিশালে) পুয়াল (খড়) বিছাল দিয়ল, গই-অ, হম ওইপর শুত গইনি ···বাতমে হম্ দেখলি কি চাঁদকে চমক হমারা তরফ আ৷রহল বট্টে···উকরা সাথ্ ছম্ছম্ ছম্ছম্ করকে এক পরছাই (ছায়া) আইল্·· ছুঁপকে সে হমরা বগলমে শুত্ গইলী···হম্ আপন্ হাত খুব ধীরসে ওকরা (ওর) দেহপর রখ্লী, তব্ উ ঝটক্সে উঠকে চল্ দিয়নস্। অব্ হম্ নজর উঠাকে দেখলী, ও শ্বশুরী একঠো বকরী রহে···।

তিতলি ছু' চোখ বড় করে শুনছিল, শেষ হতে হাসির দমকে মাটিতে বসে পড়ার দাখিল, পেটে হাত চেপে হাসতে হাসতে ফুফুর পালঙ্কে বসে পড়ল, হাসি আর থামেই না।

ঝিম-লাগা চোখ ছুটো টান করে তোতারাম হাসির বন্যা দেখল

তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঢ্যাঙা শরীরটাকে বাইরে টেনে নিয়ে চলল।

হাসছিল খুব হীরা মল্লাও। নিজে না হেসে অমন রগড়ের কথা তোতারামই বলতে পারে।

হাসির চোটে তিতলির সত্যি পেটে ব্যথা ধরে গেছে। সোজা হয়ে বসে সে গায়ের ওড়না দিয়ে ভালো করে নিজের মুখ মুছে নিচ্ছিল। পরিতুষ্ট মুখে পালঙ্কের নিচে থেকে হীরা মল্লা একটা সুন্দর বড় ঝুড়ি টেনে বার করল।

ঝুড়ি বোঝাই নানা রকমের ফল, শুখা মিঠাইয়ের ঠোঙা, আর চমৎকার একখানা শাড়ি।

অবাক চোখে তিতলি পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ালো। ঝুড়ির জিনিস-গুলো দেখছে। ফুফু হাসি মুখে জানান দিল, ইয়ে সব তোতা পহুঁছা দে গইল।

কার জিনিস কে পৌঁছে দিয়ে গেল তিতলির বুঝতে বাকি নেই।··· ব্রিজমোহনের ভেট। তোতারাম এখানে ছিল না বলেই আগে পাঠাতে পারেনি। খুব বিশ্বস্ত লোক ভিন্ন অচ্ছুত-ঘরে এ-রকম ভেট পাঠায় কি করে।

তিতলির দু'হাত কোমরে। হাসছে মিটিমিটি। একবার ফুফুকে দেখছে, একবার জিনিসগুলোকে।

পরের মুহূর্তে হীরা মল্লা দিশেহারা।

তিতলির পায়ের আচমকা এক লাথিতে ফল আর জিনিসে বোঝাই অতবড় ঝুড়িটা দেড় হাত দূরে উল্টে পড়ল। ফলগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল, কিছু গড়িয়ে গেল। ঠোঙা থেকে কতগুলো মিঠাই মাটিতে অমন সুন্দর শাড়িটার ওপর।

দুমদাম পা ফেলে তিতলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুটা জ্ঞাতসারে কিছুটা বা নিজের অগোচরে রিজিওন্যাল অফিসার প্রকাশ দীক্ষিত শাওন ভার্মার সম্বন্ধে ব্রিজমোহনকে একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন। বলেছিলেন, খুব ভালো ছেলে আর কাজের ছেলে, কিন্তু অল্প বয়েস··· আর একটু মুডি। যেমন দেখেছেন তেমনি বলেছেন। দায়িত্ব পড়লে ছেলেটা যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়, তখন নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না। কিন্তু অন্য সময় কি ভাবে, মনের কোন্ রাজ্যে তার বিচরণ, কেউ হদিস পায় না। প্রকাশ দীক্ষিত অনেক দিন ধরে তাকে দেখছেন, এমন নির্ভরযোগ্য ছেলে তার হাতে বেশি নেই। কিন্তু খামখেয়ালি। পাটনায় থাকতে হয়তো পরপর তিনদিন অফিসে এলো না। খোঁজ নিয়ে জানলেন, কেন আসেনি কেউ জানে না। দু'তিন দিনের ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত কাজে জয়েন করে দিলেও চলে। সেই দরখাস্ত আসতে দেখলেন, লেখা, ওই ক'টা দিন তার পক্ষে কাজে আসা সম্ভব হয়নি। কেন তার কোনো উল্লেখ নেই। ডেকে জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছিল, আসনি কেন?

বিড়ম্বিত মুখ।—ভালো লাগছিল না সার ....

এ-রকম জবাব তিনি আগেও পেয়েছেন কিন্তু রাগ করতে পারেননি। এবারেই তাঁর চেষ্টায় প্রমোশন পেয়ে শাওন সীনিয়র জিওলজিস্ট হয়ে ছুপায় ক্যাম্প-ইন-চার্জ হয়ে বসেছে। কিন্তু জুনিয়র জিওলজিস্ট ছিল যখন, দু'দুবার তাকে নিয়ে ভদ্রলোককে মুশকিলে পড়তে হয়েছে। কথা নেই, বার্তা নেই চাকরি রিজাইন করে বসেছে। কারণ? কারণ, কাজে যতটা মন দেওয়া দরকার ততটা দিতে পারছে না, তাই নিজেকে এ-কাজের উপযুক্ত ভাবতে পারছে না। প্রথমবার তো ওই রকম রেজিগনেশন লেটার পেয়ে ছেলেটার মাথার ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হয়েছিল। দু'বারই বকে-ঝকে সামনেই তার চিঠি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে কাজে বসিয়ে দিয়েছেন, কাউকে জানতে না দিয়ে ধামাচাপা দিয়েছেন।

একটু নয়, ছেলে-বেলা থেকেই এই ছেলে কি-রকম মুডি তাঁরও ধারণা নেই।

....পাটনায় জন্ম, কিন্তু জ্ঞানবয়েস থেকেই সে কলকাতায় বাবা-মায়ের কাছে। আর বলতে গেলে প্রায় জ্ঞানবয়েস থেকেই নিজের মা-কে অসুস্থ দেখে এসেছে। শ্বাসকষ্টে আর অ্যানিমিয়ায় ভুগতে দেখেছে। শুনেছে মায়ের হার্টের কিসব ভাল্‌ব-টাল্‌ব খারাপ। বাবা হিন্দী দৈনিক কাগজের নিউজ এডিটার। দিন-রাত পরিশ্রমের চাকরি। যাও সময় পান নিজের লেখাটেখা নিয়ে থাকেন। বাড়িতে শাওনের সারাক্ষণের দোসর মা। বেশি কথা বলার অভ্যাস দু'জনের কারো না, কিন্তু তার মধ্যেই দু'জনের গাঢ় মিতালী। বাঙালির স্কুলে পড়ে, চারদিকে বাঙালির পরিবেশে মানুষ, তার হাবভাব স্বভাব খাওয়া-দাওয়া সবই বাঙালির মতো। কিন্তু কোথায় যেন সকলের থেকে সে একটু বিচ্ছিন্ন। একাত্ম হয়ে কারও সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারেনি। আবার অন্য দিকে বিহারের বা পাটনার কাউকে সে চেনেই না, চরিত্রগতভাবে কারো সঙ্গে কোনো যোগই নেই।

...তেরো বছর বয়সে মা মারা গেছে। শ্বাস কষ্ট আর বাতাসের অভাব—সে যে কি ভীষণ কষ্ট, মায়ের সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে শাওন তা দেখেছে। মনে পড়লে বুকের হাড়পাঁজর দুমড়ে যায়। না, শাওনের বুকে কোনো দোষ নেই, বাবা ডাক্তারও দেখিয়েছেন। সব ভালো। ...তবু মাঝে-মাঝে এ-রকম হয় কেন? নিঃশ্বাস নিতে-ফেলতে কষ্ট। মনে হয় যথেষ্ট বাতাস নেই। ফুসফুসে যতটা বাতাস টেনে নিতে পারলে শান্তি, ততো যেন কম পড়ছে, আর তাই ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে। আবার এ-ও জানে, মায়ের সেই কষ্টের বিভীষিকা ওর ভিতর থেকে মুছে যায়নি বলেই এই যন্ত্রণা।

বছর আঠারো যখন বয়েস, শাওন কলেজে পড়ে, তখন বাবা একবার ওর বিয়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন। বাঙালির পরিবেশে বড় হলেও ওদের পরিবারে এ-বয়সের বিয়েটা অস্বাভাবিক কিছুই না। মনের দিক থেকে শাওন তখন এত নিঃসঙ্গ যে বাবার কথায় নিজেরও বিয়ে করার লোভ একটুও হয়নি এমন নয়। কিন্তু সেই লোভ বাতিল করেছে, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় প্রথম কুড়িজনের মধ্যে হয়ে স্কলারশিপ পেয়ে

প্রেসিডেন্সি কলেজে ফ্রি পড়তে পাচ্ছে। জিওলজি অনার্স। এতে ওকে ভালো করতেই হবে। তাই বি-এস-সি পাশের আগে বিয়ে নয়। বাবাকে বলতে তিনিও জোর করেননি।

কিন্তু আরো একটা বছর যেতে বাবা নিজেই বিয়ে করলেন। একটি বয়স্কা স্বাস্থ্যবতী স্কুলের টিচার তার মা হয়ে এলো। ওরা ব্রাহ্মণ, এই মা-ও তাই। তাই সামাজিক বিধিনিষেধও কিছু ছিল না। এই মা-কে যতটুকু জেনেছে, ভালো ছাড়া খারাপ একটুও মনে হয়নি। আর বাবাকেও খুব দোষ দেয়নি শাওন, দীর্ঘকাল ধরে রুগ্ন স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছেন, সে-ও চলে যাবার পরে এখানে সংসার বলে কিছু নেই। আগে থাকতেই একজন রাঁধুনী ছিল, তার হেপাজতে সব কিছু, তার মর্জিতে বাপ-ছেলের দিনযাপন।

কিন্তু আশ্চর্য, এই মা ঘরে আসার পর থেকেই শাওনের দম-বন্ধ করা বাতাসের অভাব যেন বাড়তেই থাকল। এক-এক সময় এমন হয় যে ফুল স্পিডে পাখা চললেও মনে হয় ভিতরটা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। দিনে-দিনে এই কষ্ট দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। নিজেই বুঝছে এ-ভাবে চলতে পারে না।

উপায় ঠিক করতে সময় লাগল না। কলেজে মাইনে লাগছে না, বই-পত্র কিনতে হচ্ছে না, স্কালারশিপের টাকা প্রায় পুরোই জমছে। হিন্দু হস্টেলে সাদরেই ঠাঁই পেল—খাইখরচ শুধু দিতে হবে, রুমচার্জও লাগবে না। খাওয়ার খরচ দিয়ে স্কলারশিপের টাকার থেকে আর বিশেষ বাঁচবে না, হস্টেলে থাকলে হাতখরচও কিছু লাগবেই, আর পরীক্ষার ফী-টিও লাগবে। তাই ঠিক করেছিল একটা টিউশনি করবে। হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট দেখে স্কুলের ক'টা ছেলে তো পড়ানোর জন্য ওকে ধরেছিল। টিউশনি একটা অনায়াসেই পাবে।

ব্যবস্থার কথা শুনে বাবা অনেকক্ষণ নির্বাক। ছেলে বলেছে, হস্টেলে থাকলে তার পড়াশুনা ভাল হবে, বাড়িতে মন বসছে না। যা-ই বুঝুন, তিনি বাধা দিলেন না। একটাই কেবল অনুরোধ করলেন, টিউশনির চেষ্টা যেন না করে, প্রতি মাসে তার হস্টেলের খাওয়ার খরচ তিনি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবেন।

নতুন মায়ের বিষণ্ণ মুখ। কিন্তু শাওনও বাঁচতেই চায়।

বি-এস-সি পরীক্ষায় জিওলজিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেল। এম-এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তারপর জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে চাকরির পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতেও সে একেবারে প্রথম।

তেইশ বছর বয়েস থেকে চাকরি। চাকরির গোড়া থেকে তার প্রকাশ দীক্ষিতের সঙ্গে যোগাযোগ এটা ভাগ্য। তিনি ওর কেরিয়ার জানেন, কাজের নিষ্ঠাও দেখে আসছেন। তাঁর বিশেষ সুপারিশে আঠাশ বছর বয়সে সিনিয়র হিসেবে প্রমোশন, আর তারপর এক বছর ধরে ছুপার এই কপার ওর এক্সকাভেশনের সাইট-এ ক্যাম্প-ইন-চার্জ।

যেখানে লাইট পর্যন্ত আসেনি, সন্ধ্যার পর হ্যাজাক ভরসা, এমন গ্রামে কাজ নিয়ে একটা লোক কতক্ষণ কাটাতে পারে? সকাল তুপুর বিকেল কাজের মধ্যে এক-রকম কেটে যায়।···তারপর? গ্রামে এসে পড়েছে বলে শাওন আর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে এমন নয়। নিঃসঙ্গতা তার জীবনের দোসর। এখানে বরং সঙ্গ দেবার নামে শহরের মতো বন্ধুবান্ধবের অবাঞ্ছিত হামলা নেই। তখনো পাকা ঘরের স্থায়ী ক্যাম্প হয়নি, মাঠের ত্রিপলের ক্যাম্পে খাওয়া-দাওয়া, রাত্রিবাস, সকালে আবার এই ক্যাম্পই তার অফিস। অন্যদের তুলনায় তারটা স্পেশাল ক্যাম্প, মস্ত বড়। মাঝামাঝি স্ক্রিন টানিয়ে তু'ভাগ করা হয়েছে। অন্য দিকটায় টেবিল চেয়ার পাতা অফিস ঘর, দরকারী ফাইলপত্র রাখার একটা গোদরেজের বড় আলমারিও আছে।

গোড়ায় গোড়ায় মন্দ লাগত না। সমস্ত দিনের কাজের পর মুখহাত ধুয়ে বাইরে ডেকচেয়ার পেতে খোলা আকাশের নিচে বসে থাকত। ঘরের হ্যাজাক নিভু-নিভু করে রাখত। চাঁদ দেখত, তারা-ভরা আকাশ দেখত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে এক-একটা উদ্ভট চিন্তা ভূতের মতো মাথায় চেপে বসত।···এই সব কাজ, খনি আবিষ্কার, সভ্য জগতের জন্য অসংখ্য রকমের সরঞ্জাম আবিষ্কার—এ-সব কোনো কিছুরই যদি তাগিদ না থাকত—তাহলে কি হত? এতবড় আকাশের নিচে ও একজন বসে আছে, যার নাম মানুষ, যার বেঁচে থাকাটাই যেন জীবনের সব থেকে বড়

ব্যাপার আর দরকারী ব্যাপার। অন্যের কথা জানে না, কিন্তু শাওন নামে একজন যদি বেঁচে না থাকে তাহলে কি হয়। এতবড় পৃথিবীতে কার কতটুকু ক্ষতি হয়? উল্টে লাভের চিন্তাই একটু মাথায় আসে, মরে গেলে মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া কি সম্ভব? মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বুকে বাতাস কম। মায়ের সেই মৃত্যু মনে পড়লে আতঙ্ক। না, মরে যাওয়ার থেকে না জন্মানোই অনেক ভালো ছিল।

এ-রকম যেদিন হয়, এত পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম হয় না। সকালে মেজাজটা বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কাজে দ্বিগুণ মন দিতে চেষ্টা করে। অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘাটতি নেই। জমি খোঁড়া খুবলোনোর কাজ চলতে থাকে, ওর ভিতরেও তখন একটা খোঁড়া খুবলোনোর ব্যাপার চলতে থাকে।

তখন নিজের ওপর অসহিষ্ণু, সামনে যারা সকলের ওপর অসহিষ্ণু। আরো যন্ত্রণা, কারণ এই অসহিষ্ণুতার বাইরে কোনো প্রকাশ নেই।

এ-ধরনের নিঃসঙ্গতা আর যন্ত্রণার মধ্যেই একজনের সঙ্গে যোগাযোগ। একটি মেয়ে।

এমন যোগাযোগ শাওন ভার্মার কাছে অন্তত বিস্ময়কর রকমের নতুন। কারণ একটি মেয়ে কোনো পুরুষের জীবনে কি বা কতটুকু তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মনে হতে লাগল অনুভূতির স্বাদ বড় বিচিত্র। দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, সামনে এলে ভাল লাগে, কথা শুনতে ভাল লাগে, কথা কইতে ভাল লাগে। আর কথা তো নয়, যেন ভোরের এক চঞ্চল সোনালি পাখির ছন্দে বাঁধা মিষ্টি কাকলি। এখানে এসে পর্যন্ত ভোজপুরী ভাষার কথা অনেক শুনে আসছে। শহর আর গঞ্জের কাছের গ্রাম বলে এই ভাষার মধ্যে কিছু হিন্দী উর্দুর গোঁজামিল মিশেছে, আর বাংলার সঙ্গে এই ভাষার মিলমিশ তো বেশ লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু এই চঞ্চল মেয়ের মুখে এ-ভাষা যখন বেপরোয়া গোছের উচ্ছল হয়ে ওঠে: সে যে কি মিষ্টি নিজের কানে না শুনলে শাওন কল্পনা করতে পারত না।

গোড়ার দিকে শুধু ছুপার নয়, আশপাশের গাঁয়ের মেয়েপুরুষ দল বেঁধে দেখতে এসেছে, মাটির নিচে থেকে খনি বেরুনো ব্যাপারখানা কি।

শুনেছে বেরোয়, চোখে কখনো দেখেনি। কিন্তু দেখতে এসে ক্রমে হতাশ হয়েছে কতটা খুঁড়লে 'তামুয়া' বেরুবে, কত দিন ধরে কত নিচ পর্যন্ত খুঁড়লে বেরুবে অথবা বেরুবেই কিনা—কাজ যারা করছে তারাও সঠিক করে বলতে পারছে না। যন্ত্রপাতি এনে কুলি মজুর এনে কেবল মাটি খোঁড়া দেখতে কতদিন ভালো লাগে, কতদিনই বা উৎসাহ থাকে?

দেখার হিড়িক অনেকটা কমে যেতে দূর থেকে আরো কয়েকটি সঙ্গিনীর সঙ্গে মেয়েটা শাওনের চোখে পড়ল। পরনে হাঁটুর নিচ অবদি চুমকি বসানো রঙচঙে ঘাগরা, গায়ে কোমর পর্যন্ত টকটকে লাল আঁট জামা, দু'পায়ে রূপোর পায়েল গোছের কি—রোদে ঝিকমিক করছে। মাথার ঝাঁকড়া চুল পিঠের আধা-আধি ছড়ানো। এক হাতে অনেকগুলো সোনালি নক্সাকাটা কাচের চুড়ি। চোখে পড়লে চোখ আটকাবেই। মুখ, গলা, দুটো হাত আর হাঁটুর নিচে থেকে পা পর্যন্ত যেটুকু দেখা যাচ্ছে, যেন সোনালি আভা ঠিকরোচ্ছে এমনি রং।

এ-রকম কাউকে দেখলে দৃষ্টি সকলেরই প্রসন্ন হয়, শাওনেরও হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়।

পরে এক দেড় মাসের মধ্যে এই মেয়েকে এখানে আরো দিনতিনেক টহল দিতে দেখেছে। সঙ্গে একজন বা দুজন সমবয়সী মেয়ে। কিন্তু ওই একজনের পাশে আর কেউ চোখে পড়ার মতো নয়। শাওন কিছুটা কাছে থেকেও দেখেছে।···দেখার মতোই বটে মেয়েটা। কিন্তু আশপাশের কে দেখছে না দেখছে মেয়েটার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। যেখানে যেখানে কাজ হচ্ছে, গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কোমরে দু'হাত তুলে নিবিষ্ট মনে দেখছে, এটা সেটা জিগ্যেসও করছে। শাওনের মজাই লেগেছিল, হাবভাব দেখলে মনে হবে সরকারই তাকে এই গোছের তদারকি দায়িত্ব দিয়েছে। কাজের লোকেরাও মেয়েটাকে বেশ চেনে মনে হল। কারণ, যাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদেরই হাসি-হাসি খুশি-খুশি মুখ।

কিন্তু দু'দিন বাদে ওই মেয়েকে যে-লোকের সঙ্গে টহল দিয়ে বেড়াতে দেখল, শাওনের ভিতরটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। তোতারাম। যার সঙ্গে শাওনের বাইরে অন্তত খুব ভাবসাব এখনো। প্রথম আলাপেই এসে তার

ভাষায় বলেছিল, দুনিয়া ভর লোক আমাকে তোতারাম বলে ডাকে, কারণ আমি তোতার মতো বুলি কপচে বেড়াই, নিজের মগজ থেকে কোনো কথা বেরোয় না—নিজের মগজ বলে আমার কিছু নেই-ই। আধঘণ্টার মধ্যে লোকটাকে শাওনের বেশ ভাল লেগে গেছল, মজার লোকই মনে হয়েছিল তাকে। এখনো তার সম্পর্কে ধারণা খুব বদলায়নি, কিন্তু এই লোকের মারফতই ব্রিজমোহন জমি খালাস পাবার জন্য তার সামনে ঘুষের টোপ ফেলেছিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সেটা নাকচ করার ফলে সে হেসে হেসে বলেছিল, ব্রিজমোহনের কথা এ-ভাবে ঝেড়ে ফেলার কথা নয় পরদেশীবাবু, তুমি আর একটু ভেবে দেখো।

···শেষে ব্রিজমোহন স্বয়ং সেই টোপ ধরানোর জন্য আসরে নেমেছিল। সব শুনে চতুর ওপরওয়ালা এই লোকের সঙ্গেও তাকে ভাবসাব রেখে চলতে বলেছিল বটে, চলছেও তাই, কিন্তু মন থেকে এই লোককে তারপর বরদাস্ত করা কতটুকু সম্ভব? তোতারাম সেই লোকের মোসায়েব আর মেয়েটা তার সঙ্গেই দিব্বি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই বা ভাল লাগে কি করে?

এর পরের দিনটা অঝোরে বৃষ্টি গেছে। ফলে তার পরের দিন আকাশ পরিষ্কার হলেও এত বড় জমির বেশির ভাগ কাদায় প্যাচপেচে। শাওন সকালে যথাসময় কাজে এসেছে আর ব্যস্ত থেকেছে। তার পায়ের হাঁটু-উঁচু গাম বুট আর পরনের খাকি ট্রাউজার কাদায় মাখামাখি। গায়ের মোটা বিবর্ণ জামাটারও যত্রতত্র কাদা লেগেছে। দড়ির মই বেয়ে তাকে একটা গভীর খাদে নামতে উঠতে হয়েছে। এমনিতেও জামাপ্যাণ্ট ছেড়ে কয়েক পরত ধুলো-মাটির প্রলেপ পড়ে। আজ কাদামাটিতে মাখামাখি। জানা না থাকলে কে দক্ষ মজুর অথবা টেকনিসিয়ান আর কে বা ক্যাম্প-ইন-চার্জ অথবা উঁচু পর্যায়ের কর্মী হদিস পাওয়ার উপায় নেই। এর মধ্যে শাওনের মুখ ভরা দুদিনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

শ্লথ পায়ে আর এক দিকের তদারকিতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে সুরেলা গলায় বাধা পড়ল। শাওনকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থমকাতে হল।

—···এ ভাইসাব, শুনত তো···

সেই মেয়ে। যে এলে চারদিকের এই হাঁ-করা জমিতে হাসির রং ধরে, বাতাসে বসন্তের দোলা লাগে। কাছে এসে কোমরে দু'হাত তুলে দাঁড়াল এটা স্বভাবও হতে পারে, যৌবনসচেতন অভিব্যক্তিও হতে পারে।

—তুম্ এ খনিয়া সরকারকা আদমী ভৈল?

শাওন মাথা নাড়ল। সেই এই খনির কাজের সরকারী লোকই বটে।

—তো লোগন্‌কা বড়া সাহাব কাঁহা? হম্ ওক্‌রাকে (তাকে) খোঁজত…

যে-ভাবে বলল, বড় সাহেবের থেকেও উঁচু পর্যায়ের কেউ মনে হবে। এখানকার ভোজপুরী-ভাষীরা বলতে না পারলেও হিন্দীর মতো বাংলাও মোটামুটি বোঝে লক্ষ্য করেছে। জানতে চাইলো, বড়সাহেবকে কি দরকার?

সুন্দর মুখে বিরক্তির আভাস। —কা জরুরত ওকরাকে কহব - যা পুছত্ জবাব দিহ!

শাওনের মজাই লাগছে। গম্ভীর। জানান দিল, বড়সাহেব এখানেই কাজে ব্যস্ত, কি দরকার জানলে আমিও তার হয়ে কথা বলতে পারি।

আয়ত নিবিড় কালো দু' চোখ তার মুখের ওপর তুলে ঘটা করে গোল করল একটু। লালচে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চিকিয়ে উঠল। ও যে, কোনো মরদের সামনে পড়লে সে একটু বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চায়, আর কথার ছলে যতটা পারে আটকে রাখতে চায়, সেটা জেনে বেশ অভ্যস্ত তাই বুঝিয়ে দিল। তারপরেই গম্ভীর প্রশ্ন, তোহার বড়া সাহাবকা সাথ্ মিলনেকে অফিস-টাইম কওন তক্—এ কহব কি নহী?

শাওন জবাব দিল, দুপুর দেড়টা থেকে তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ক্যাম্প অফিসে দেখা হতে পারে। আঙুল তুলে দূরের সব থেকে বড় ক্যাম্পটা দেখিয়ে দিল।

একবার সে-দিকটা দেখে নিয়ে এই মেয়েও এবার বাংলা ফলাতে চেষ্টা করল। পল্‌কা একটু কৃপা কটাক্ষ হেসে জিগ্যেস করল, বড়েসাবকা সাথ্ তুমার দেখা হব?

শাওন মাথা নেড়ে জবাব দিল, হব।

—রহুয়াকা কহ দিয়, এক লেডি দুফর তিনো বাজে মিলনে আহবা

—সাহাবসে জরুরী বাতাবাতি রহলঅ।

শাওন বিনীত মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, বড়সাহেবের ওপর কোনো সরকারী ফরমাস আছে?

এ প্রশ্নও বুঝল শুধ্ না, রসিকতা যে তা-ও বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটি। দু'বার মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, হুঁ—অছে। সমঝ্লঅ?

দুপদাপ পা ফেলে এগোতেই বাধা পড়ল। পিছন থেকে শাওন জিগ্যেস করল, বড়সাহেবের কাছে লেডির পরিচয় কি দেব?

ঘুরে দাঁড়াল। দু'হাত কোমরে।—কহ, উহার কই এক মালকান আহল্বা—

ঝটিতি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ালো। মুখেচোখে হাসির ঝলক। সুডোল হাত নিজের মুখের কাছে তুলে দু'তিনবার নেড়ে কিছু নিষেধ করল। অর্থাৎ, সত্যিই এ-সব কিছু বোলো না।

শাওন অন্য দিনের মতোই বেলা বারটা নাগাদ তার টেণ্টে ফিরল। মেয়েটার মুখ থেকে-থেকে চোখে ভাসছিল, আর তার কথাগুলো রিন্-রিন্ করে কানে বাজছিল। এ-রকম অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। এই বয়সের মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিন মিনিট কথা বলার সুযোগ হয়নি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেয়েটা এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না, চেয়ে-চেয়ে কেবল দেখতে ইচ্ছে করে।···এই মেয়ের হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করার দরকার পড়ল কেন ভেবে পেল না। ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গেই অবশ্য নয়। এখানকার বড় সাহেবের সঙ্গে। এখানে ক্যাম্প-ইন-চার্জকেই বড় সাহেব বলে ওরা।···কারো বেচাল ব্যবহার নিয়ে নালিশটালিশ করবে? কিন্তু কেন যেন তা-ও মনে হল না শাওনের। কেন মনে হল না জানে না, কেবল মনে হল, এই মেয়ের মুখে কারো নামে পলকা নালিশ মানায় না। অথচ তাই হওয়া সম্ভব, নইলে তার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার, আর কি কারণ থাকতে পারে?

ক্যাম্পে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। পায়ের গাম বুটজোড়া আর কাদামাটিতে মাখামাখি খাকি প্যাণ্ট শার্ট দেখেই হয়তো মেয়েটা ওকে খনিয়া-সরকারের আদমী ভেবেছে, নইলে

ধুলোকাদা আর দুদিনের না-কামানো মুখের যে অবস্থা, তাকে কুলি-মজুর শ্রেণীর কেউ ভাবারই কথা। ক্যাম্পে ফিরে রোজই বেশ করে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। আজ আগে দাড়িটা কামিয়ে নিল। দু'বার করে সাবান মেখে চান করল। কেউ আসবে বলে ঠিক নয়, নিজের পরিতৃপ্তির জন্যও দরকার ছিল। স্নানের পরের পোশাক ধপধপে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি। বিকেলেও এই বেশেই সাইটে বেরোয়, কারণ তখন কেবল তদারকির কাজ। খাওয়া-দাওয়ার পর ডেকচেয়ারে গা ছেড়ে আধঘণ্টার বিশ্রাম। দেড়টা নাগাদ পার্টিশনের ও-ধারে অর্থাৎ ক্যাম্প অফিসে বসে। অফিসে লোকজনের আনাগোনা বিশেষ নেই। এ-সময় ফাইলের কাজ সারতে হয়, ডেলি রিপোর্ট লিখতে হয়, কোন্ পর্যায়ের কত ছুট্ শ্রমিক কাজে লাগল, তার হিসেব দেখতে হয়, ইত্যাদি।

অফিস ক্যাম্পে এসে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে হাতঘড়ি দেখছিল। আড়াইটের পরে হঠাৎ কি মনে হতে ফাইল বন্ধ করল। আর একটা সম্ভাবনা মাথায় আচমকা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। এত রূপ আর এমন যৌবনোচ্ছল মেয়ে কমই দেখা যায়। শাওন অন্তত আর দেখেনি।··· দু'দিন আগে এই মেয়েকেই ওই সাইটে অন্তরঙ্গ খুশি মুখে যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল সে তোতারাম—যার মারফৎ ব্রিজমোহন প্রথম ঘুষের টোপ ফেলেছিল। পরে ওই চেষ্টা করে সে নিজেও ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে কি টাকার থেকেও অমোঘ টোপ হিসেবে তারাই ওই মেয়েকে তার কাছে পাঠাচ্ছে? তা না হলে চেনা নেই জানা নেই, ওই মেয়ের এখানকার বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কি দরকার পড়ল? ভাবতে পারছে না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবু অস্বস্তি। বিধাতার অনবদ্য শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এমন অপচয়ও সম্ভব!

তিনটে বাজার পাঁচ-সাত মিনিট আগে রতন বেয়ারা একটু উৎসুক মুখে ভিতরে এলো। রতন বাঙালি, বছর তিরিশ বয়েস। বিশ্বাসী আর চালাক চতুর। কলকাতায় অনেক বছর ধরে ওদের বাড়িতে চাকরের কাজ করেছে। পরে শাওন প্রকাশ দীক্ষিতকেই ধরে ওকে সরকারী বেয়ারার চাকরিতে ঢুকিয়ে পাটনায় এনেছিল। সেখান থেকে এখানে। সে একাধারে

বেয়ারা আর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড।

জানান দিল, খুব সুন্দর একটা মেয়ে···যাকে কয়েকদিন এই মাঠে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়, বলছে তার আসার কথা ছিল।

—নিয়ে এসো।

শাওন এখন সতর্ক। তাই গম্ভীরও। কিন্তু ওই মেয়ে ভিতরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নীরস ক্যাম্পের শ্রী ফিরে গেল। চেয়ার ছেড়ে শাওন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।—আইয়ে মালকান্···।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেছে। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি অবাক। পরের কয়েক মুহূর্ত নির্বাক, বিমূঢ়। কোনো দিব্যাঙ্গনার মুখে বিস্ময়ের এমন কারুকার্যও কি শাওন আর দেখেছে ?

—হায় রাম! এটুকুও মিষ্টি অথচ প্রায় আর্তনাদের মতো শোনালো। —খনিয়াকা বড়া সাহাব তুম হইলন !

শাওনের মুখে এবারো হিন্দি বুলি।—জী মালকান্, আইয়ে, বইঠিয়ে, ফরমান জারি কিজিয়ে—

চেয়ে আছে। হঠাৎ অসহিষ্ণু একটু। মাথা ঝাঁকালো।—হাম চলথ, তোহারকে বহুত্ সেয়ানা লাগলঅ, দুফরমে তুম্ এইসন্ ধোকাবাজী করলঅ !

হিন্দি ছেড়ে শাওন এবার বাংলা ধরল, কারণ তার হিন্দির দৌড় বেশি নয়। মৃদুগম্ভীর গলায় জবাব দিল, আমি তো বলেছিলাম, কি দরকার আমাকে বলা যেতে পারে।

প্রায় ঝাঁঝিয়েই উঠল মেয়েটা, হাঁ হাঁ তুম কহলে, লেকিন এ না কহলঅ তুম হো বড়া সাহাব !

শাওনের তখনো এই মেয়ের সম্পর্কে সংশয় যায়নি। তাই রসের ছোঁয়াটুকু এখনো গম্ভীর—না, বলে ভালই করেছি, ক্যাম্পে ফিরে আরশীতে নিজের সুরত দেখে নিজেকে বড়সাহেব মনে হচ্ছিল না।··· যাক, আপনি বসুন, কি জরুরী কথা আছে বলুন—

এ-কথা শোনার পর মেয়েটার অসহিষ্ণু মুখে কৌতুকের ফাটল ধরল।

আয়ত চোখে বিস্ময়ের ঘটা। —আপ! নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বলে উঠল, তুম হামে আপ কহলঅ!...কা বাবু, হমারাকে তোহার নজর মে দারগাজী লাগলী যে 'আপ' কহলঅ? জিন্দেগী মে পহলিবার 'আপ' শুনলী। শুনকে এইসন লাগলঅ যেইসন মেডক্ (ব্যাং) তাজ (মকুট) পহিনলে! নহী বাবু নহঈঁ—ম্যায় তি-ই-ই-ত্‌লি-হুঁ—হামে তু-তু-তু কহো। বলার পরেই হাসির ঝর্ণা।

শাওনের দু'কান ভবে যাচ্ছে, দু'চোখ ভরে যাচ্ছে। কিন্তু মনের তলায় খটকা। তিতলি মানে প্রজাপতি সে জানে। তিতলি...তিতলি...তিতলি —নামের সঙ্গে কোনো মেয়ের এমন মিল আর কি হয়! একটু নরম অথচ গম্ভীর মুখেই বলল, ঠিক আছে, তিতলিই বলব...বোসো—কি দরকার বলো।

তার মুখের ওপর তিতলির কৌতূহল-ছোঁয়া সদয় চাউনি। সামনের চেয়ারটার দিকে এগিয়েও থমকালো একটু।—এ বাবু, হাম অছুত্‌ ঠেরে...

শাওনের সংশয় ফিকে হয়ে আসছে কেন জানে না। গম্ভীর সুরেই ফিরে রসিকতা করল, এই চেয়ারে বসলে তোমার জাত যাবে?

থতমত খেতে দেখল একটু। এটুকুও চোখ ফেরানো যায় না এমনি সুন্দর। এক ঝলক হেসে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। বসার ধরন দেখে শাওনের মনে হল না অছুত বলে এই মেয়ে নিজেকে ছোট মনে করে। কর্তব্যবোধেই জানান দিয়েছে মনে হয়।

—তোতাচাচা ঠিক কহলঅ তুম আচ্ছা আদমী ভৈল।

ওই নাম আর মন্তব্য শুনে শাওন সতর্ক একটু।—তোতারাম তোমার চাচা লাগে?

হেসে উঠল। এই হাসির মধ্যে জটিলতা আছে ভাবা যায় না।—চাচা লাগি, লেকিন ওকরা তোহার মাফিক উঁচা জাত—আব্‌ সমঝ লো ও কইসন চাচা লাগি। আবার হেসে উঠল।—অগর্‌ চাচা ও ঠাকুর ব্রিজমোহনোয়াকা চাম্‌চোয়া না হ'—ত, ওকরা (ওই লোক) কসিস রহত (বুঝতে চেষ্টা করত) অছুত্‌ ভাইয়াকা এ বেটী (আঙুল দিয়ে নিজের বুক

দেখিয়ে) কস্‌মকস্‌ যবনোয়া (জীবনখানা কেমন) ।

শাওনেরই কান লাল হবার উপক্রম । এই মেয়ে না হলে এটুকু আলাপের মধ্যে নিজেকে নিয়ে এ-রকম রসিকতা নোংরা মনে হত । এখন তা আদৌ মনে হচ্ছে না।…তোতারামকে ব্রিজমোহনের চামচে বলল, কিন্তু এই মেয়ে নিজে কি তা এখনো বুঝতে বাকি । একটু গম্ভীর মুখেই প্রসঙ্গ বদলালো ।—এবারে কি দরকারে এসেছ বলে ফেলো ।

জবাবে হালকা গলায় তিতলি তার দেশোয়ালি ভাষায় হড়বড় করে যা বলে গেল, কান খাড়া করে শুনে শাওন যেটুকু বুঝল, বেশ অবাক হবার মতোই । তার বক্তব্য, আমি নিজের কোনো দরকারে তোমার কাছে আসিনি পরদেশীবাবু, তোতাচাচার মুখে সেদিন যা শুনলাম তাতে তোমার জন্য একটু চিন্তা হয়েছিল, তাই চুপিচুপি তোমাকে একটু সাবধান করে দিতে এসেছি । তোতারাম বলছিল পরদেশীবাবুর অল্প বয়েস, সাচ্চা আদমী, তাই কোনরকম বিপদের কথা না ভেবেই ব্রিজমোহনের জমিন ফিরে পাবার আশা বরবাদ করে দিয়েছে, আর নিজের লাভের কথাও ভাবতে রাজি হয়নি…এই বড়াসাহেবের কপালে শেষ পর্যন্ত কি আছে শিউজী জানে । ব্রিজমোহনের এই পিয়ারের জমিন সরকার কেড়ে নিয়েছে বলে ছুপার অচ্ছুত আর গরিবরা কে না খুশি, ওই লোককে জব্দ দেখলে ওদের সকলেই খুশি হয়, তাই তোতাচাচার মুখে একথা শুনে পরদেশীবাবুর জন্য ওদের একটু ভাবনা হচ্ছে, আর এইজন্যেই তিতলির তাকে একটু হুঁশিয়ার করে দিতে আসা ।

মুখের দিকে তাকিয়ে শুনলে একটি কথাও অবিশ্বাস করার মতো নয় । মুখের দিকে তাকিয়েই শুনল শাওন । তবু ভিতরটা সন্ধিৎসু । পরোক্ষে এই মেয়েও কি ব্রিজমোহনের হয়ে তাকে হুমকি দিতেই এলো ? জিগ্যেস করল, ব্রিজমোহনের দালাল হয়েও তোতারাম তোমাকে এ-কথা বলতে গেল কেন ?

জবাবে আবার সেই সরল তরল হাসি । জবাবের মর্মও রসালো ।—বড়সাহাব হলেও তোমার বুদ্ধি দেখছি বাচ্চার মতো পরদেশীবাবু—এখানকার মরদরা আমাকে কাছে পাওয়ার মওকা পেলে ছাড়ে না,

দিলখুশ বাতাবাতি করে আটকে রাখতে চায়। ব্রিজমোহনকে আমি কত ঘৃণা করি সে জানে, খুশ্-মনে আমাকে এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সে এ-সব মন-ভরি কথা শোনাবে না তো কাকে শোনাবে? সে কি ভেবেছে? ওই শুনে আমি সোজা তোমার কাছে চলে এসে হুঁশিয়ার করে দেব!

সংশয়ের ছায়া সরছে। তবু সতর্ক। পদ-মর্যাদার গাম্ভীর্যটুকু ধরে আছে। শাওন বলল, ব্রিজমোহন জানে আমার ক্ষতি করলে বা আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারলেও এটা সরকারের কাজ—দু'দিন না যেতে আমার জায়গায় আর একজন এসে বসবে—আবার দেখা হলে তোতারামকে তুমি এ-কথা বলে দিতে পারো—

পর্দা ফাঁক করে রতন গলা বাড়াল। সাহেব ঠিক সাড়ে তিনটেয় চা খায়। চা রেডি। কিন্তু এক পেয়ালা আনবে কি দু' পেয়ালা ঠিক বুঝতে পারছেন না। সাহেবের কাছে আর কেউ থাকলে তাকেও চা দেবার রীতি। কিন্তু এখন যে বসে সে মেয়েছেলে, তাই সাহেবের নির্দেশের আশায় পর্দা সরিয়েছে। তিতলি এ-দিক ফিরে বসে, সে ওকে দেখতে পেল না। সাহেব সামান্য মাথা নাড়তে রতন যা বোঝার বুঝে নিল।

শাওন আবার সোজা তাকাল। পাল্লায় ভাল লাগার দিকটা নিচে নামছে। একটু হেসে বলল, সরকারী কাজে বড় সাহেবের অভাব কখনো হবে না, খনির কাজও থেমে থাকবে না—তোমার তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই তো?

কাজল-টানা ভ্রমর-কালো দুই চপল চোখ তার মুখের ওপর নিশ্চল একটু। যে-রকম চাউনি চোখের ভিতর দিয়ে মুখের ভিতর দিয়ে অনেকটাই চলে যায়। তারপরেই হেসে উঠল। সেতারের গোটা দুই মিষ্টি ছাড়া-ছাড়া ঝঙ্কারের মতো। জবাব দিল, উঁহু, চিন্ত জরা বাড়্হলস্‌, আগে বড়া সাহাবকা বারে (জন্য) চিন্তা করত্ রহলী, আব্ তোহার খাতির (জন্য) গভীর চিন্তিত হই।

—কেন?

—তোঁহারকে সাচ্চা আদমী লাগল, লেকিন (দু' আঙুল টিপে

দেখিয়ে) জরাসে কাচ্চাভি···

পর্দা ঠেলে রতন ভিতরে এলো। হাতের ট্রে-তে দু' পেয়ালা চা, আর একটা ডিসে খানকয়েক বিস্কুট। পেয়ালা দুটো দু'জনার সামনে আর বিস্কুটের ডিস মাঝখানে রাখতে তিতলি হাঁ করে প্রথমে রতনের দিকে চেয়ে রইল। সে চলে যেতে শাওনের দিকে।—পিয়ালিমে চায়ে হমারি খাতির (জন্য) ?

নিজের পেয়ালা কাছে টেনে নিয়ে মাথা নেড়ে শাওন বলল, কেন, চা খাও না ?

একটু মাথা হেলালো। অর্থাৎ খায়। কিন্তু কাজল-টানা চোখে বিস্ময় উপছে পড়ছে যে-কারণে সেটা তার পরের কথায় বোঝা গেল।—এ বাবু, হম শুনলী তুম্ ব্রাঁভন্?

—তাতে কি ?

চোখের বিস্ময় এবারে গলা দিয়ে ভেঙে পড়ল, তুম ব্রাঁভন আর হম্ অছুত হই, মন্ওয়ামে না আইলঅ তোঁহার পেয়ালামে চা পিয়ব, পিরিচমে বিস্কুট খাইবু !

মেয়েটাকে ভারী সুন্দর একটা তাজা বুনো ফুলের মতো লাগছে শাওনের, যাকে নিঃসঙ্কোচে চোখ তাকিয়ে দেখা যায়। দেহতট উপছে পড়া যৌবনটুকুই শুধু বড় আকর্ষণ হলে শাওন তা পারত না। তার অন্তর্মুখী স্বভাব। রসবোধও তাই। কিন্তু মেয়েটার এ-কথার পর অনায়াসে সেটুকু মুখর হয়ে উঠতে চাইল। হতে পারল। ছদ্ম-গম্ভীর চাউনি তার মাথা থেকে প্রায় কোমর অর্থাৎ টেবিল পর্যন্ত নেমে আবার মুখের ওপর ওঠে এলো। একটু সামনে ঝুঁকল।—তোমার হাত দেখি ?

কিছু না বুঝে অবাক হয়ে তিতলি দুটো হাতই তার দিকে মেলে ধরল।

লালচে হাত আর চম্পাকলির মতো আঙুলগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়ে শাওন আবার সোজা হল।

সবই তো দেখি ঝকঝকে পরিষ্কার—অছুত কোথায় ?

আঁচ করতে পারছে, কিন্তু এই বাংলা তিতলির মাথায় একেবারে ঠিকঠিক ঢুকল না।

—ঝক্‌মক্‌ কা কহ্‌লস্‌?

বললাম, ঝকমক—

—তাওর পরস্কার?

—পরস্কার না, পরিস্কার—সাফাই—মতলব, বিলকুল ঝকমক সাফাই আওর সফেদ—অছুত কাঁহা?

তিতলি চেয়ে আছে। মানুষটার মধ্যে যেন ভাল করে দেখে নেবার মতো কিছু আছে।

বিস্কুটের ডিশ হাতে তুলে নিয়ে শাওন তার সামনে ধরল।—তুলে নাও, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তিতলি একটা বিস্কুট তুলে নিল। ডিশটা রেখে নিজে একটা বিস্কুট নিয়ে শাওন চিবুতে চিবুতে চায়ে চুমুক দিল। তিতলি দাঁতে করে বিস্কুট কাটছে, সাদা দাঁতের সারির কয়েকটা চিকচিক করছে, সামনের লোককেই দেখছে।

ক্যাম্প ইন-চার্জকে এরা বড় সাহেব বলে। এ-জন্যে শাওনের কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ নেই। অল্প বয়সে সিনিয়র জিওলজিস্ট হতে পেরেছে এটুকু ভাগ্য। আসল বড়সাহেবের সঙ্গে অনেক ফারাক। কিন্তু স্বভাব গম্ভীর বলেই সমপর্যায়ের সতীর্থরাও তাকে একটু অন্য চোখে দেখে। আর এখানকার শ্রমিক কর্মচারীরাও একটু বাড়তি মর্যাদা দেয়। কিন্তু আসলে ভিতরের মানুষটা একটা নীরস বাষ্পের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। সেই বাষ্পের আবরণ ক্রমে নিরেট হয়ে আসছে। তার মধ্যে এইই ভালো লাগার অনুভূতিটুকু আশ্চর্যরকমের ব্যতিক্রম। একটা মেয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবই সুন্দর, হাঁটা চলন/বলনের ঠমক সুন্দর, দুধ-সাদা ঝিকি-মিকি দাঁতের সারি সুন্দর, হাসি সুন্দর কটাক্ষ সুন্দর, আর এই যে অপলক চেয়ে আছে তাও যেন ভিতরের নিরেট বাষ্পের আবরণটা তরল করে দেবার মতো সুন্দর। ভিতরের এই অনুভূতি গোপন করারই চেষ্টা শাওনের। মনে হল মেয়েটা ওকে খুব মহৎ গোছের লোক ভাবছে। সহজ হবার তাগিদে একটু প্রশংসার সুরে বলল, কিছু কিছু কথার মানে না জানলেও তুমি কিন্তু এখানকার অনেক লোকের

থেকেই বাংলা ঢের ভালো বোঝো।

দেখার তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। মিষ্টি ঝংকার তুলে হঠাৎ একটু জোরেই হেসে উঠল। হাসির কারণ বুঝল না, কিন্তু ভেতরের নিরেট বাষ্পের আবরণ ভেদ করে এক ঝলক দক্ষিণের বাতাস ঢুকে গেল যেন। কচমচ করে বিস্কুটটা চিবিয়ে দু'তিন বার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। আর একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে হাসি মুখে কথার মধ্যে বাংলা বুলি মেশাতে চেষ্টা করল।—তোঁহারা বিস্কুট খুব বালো—

শাওনের মনে হল চোখের ভাষায় এই মন্তব্যের কিছু একটু তাৎপর্য আছে। তিতলি এক চুমুকে পেয়ালার বাকি চা-টুকু খেয়ে নিল। তারপর খুব হালকা সুরে বাংলা বুঝতে পারার তারিফের কারণ বিস্তার করল।—বাংলা কেবল বুঝতে পারা কেন, বাংলায় অনেক কথা বলতেও পারত। চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে ফুফু (পিসি) আর বাবার নোটঙ্গী দলের সঙ্গে কলকাত্তা গেছল, দু'বারই 'খিদিরপুর ভূ-কৈলাস কৈলাস শিউজী' মন্দিরের সামনের চত্বরে রামলীলা আর লায়লা-মজনুর জমাটি যাত্রা হয়েছিল। রামলীলায় লবকুশের লব আর লায়লা-মজনুতে বাচ্চা লায়লার পার্ট করে ও আসর মাত করেছিল। বংগালের পাহাড়ী জায়গাগুলোতেও ওদের নোটঙ্গী দলের খুব খাতির কদর হয়েছিল। কিন্তু ফুফুর বয়েস হতে আর ওর বাবারও দারু খেয়ে খেয়ে মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যেতে ওদের এতবড় নোটঙ্গী দল ভেঙে গেল, তাছাড়া দল ভাঙার আরো কারণ, বয়েস বাড়তে তিতলিকে যাত্রার আসরে নামতে দিতে ওর বাবার ভীষণ আপত্তি—এই নিয়ে ফুফুর সঙ্গে বাবার দারুণ ঝগড়া হত—ফুফুর টাকার লালচ খুব, কিন্তু বাবাকে তখন ভীষণ ভয় করত, দারু খেলে বাবার তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, রাগের মাথায় তখন যে-কেউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে।···এখন অবশ্য বাবার মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, দারু খেয়ে দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় বেহুঁশ থাকে। আবার এক-ঝলক হাসি আর তির্যক চাউনি।—এখন সে-ই নোটঙ্গী দলের ব্যবসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারে, ইচ্ছেও খুব করে, কিন্তু হুঁশ ফিরলে বাবা কখন আবার ফুফুর ঘাড় মটকাতে আসে এই ভয়ে সে আর দল গড়তে চায়

না। ছোট আর গরিব ঘরের ভালো দেখতে মেয়েদের নাচ-গান শেখায়…
আর তিতলিকেও সব থেকে বেশি তালিম দেয়। আবার খিলখিল হাসি।
— ফুফুর আসলে আমাকে দিয়ে ঢের বড় দাঁও মারার ইচ্ছে—

প্রতিটি কথা বোঝার জন্য শাওনা দু'কান খাড়া করে শুনছে। রতন এসে কোন ফাঁকে পেয়ালা প্লেট তুলে নিয়ে গেছে তা-ও খেয়াল নেই। মেয়েটার সম্পর্কে আরো অনেক শুনতে অনেক জানতে ইচ্ছে করছিল শাওনের। যাত্রাগানের দলে ছিল, এখনো পিসি ওকে সব থেকে বেশি তালিম দেয় শুনে তার ভিতরেও কি গান শোনার লোভ উঁকিঝুঁকি দেয়নি? সেটা কখনো সম্ভব হবে না জানে, কিন্তু যার কথা এমন হাসি, এমন গলার স্বর আর সুর এমন নিটোল মিষ্টি, তার গানও দু'কান ভরে শোনার মতোই হবে বলে ধারণা। মদ্যপ আর উন্মাদ বাবার কথা বলল, লোভী পিসির কথা বলল, কিন্তু মায়ের কথা কিছু বলল না, তাইতে মনে হল মেয়েটার মা নেই। লজ্জা-টজ্জার ধার ধারে না, কোন্ জোরে ও-ই এখন নোটঙ্গী দলের ব্যবসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারে সে-ইঙ্গিত একটুও অস্পষ্ট নয়। আর অনায়াসে বলল, ফুফুর ওকে দিয়ে ঢের বড় দাঁও মারার ইচ্ছে—তবু কি বাজে গোছের বেশরম মনে হয়েছে মেয়েটাকে? একটুও না। পিসির বড় দাঁও মারার ইচ্ছে বলতে বুঝেছে, গান-টান শিখিয়ে রূপসী গুণবতী মেয়েকে মোটা টাকার বিনিময়ে কোনো বড়লোক ছেলের হাতে গছাবে। অচ্ছুতদের মধ্যেও অঢেল পয়সাঅলা লোক কি কোথাও নেই—ওদের সমাজে হয়ত কন্যাপক্ষই টাকা হাঁকে। শাওনের আরো মনে হল বছর কুড়ি হবে মেয়েটার বয়েস, ওদের জাতের কেন, কোনো ঘরেরই এমন নিটোল যৌবনের রূপসী মেয়ে এ বয়সে পর্যন্ত সচরাচর অবিবাহিত থাকে না, ওর পিসি সে-রকম দাঁও মারার মতো বড়লোকের ছেলের সন্ধান এখনো পায়নি বলেই হয়তো এখনো বিয়ে হয়নি।

—রাম রাম সাব, গুড আফটারনুন—

ডাক পিওন চলতরাম। কাঁধে থলে, হাতে চিঠির পাঁজা। ভিতরে ঢুকে পড়ে সাহেবের সামনে চেয়ারে যে বসে তাকে দেখে তাজ্জব বনে

গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য হাঁ একেবারে। তারপর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, এ ছৌঁড়ী, তু হিঁয়া সাহাবকা সাথ কুরসিয়ামে বৈঠল রহি।

হাসি চেপে তিতলি ওর দিকে ফিরে কড়া করে চোখ পাকালো—এ ডাক-বাবু, তব ভি তু হমারি সম্মানোঁয়া না সমঝল ? রাস্তে মে দেখনেসে তু হামে গোরী কহত, আর আব হিঁয়া ছৌঁড়ী কহল্অ। এ বড়া-সাহাবকে সাখ্সী (সাক্ষী) মানত্ করকে হম নালিশ করে তো তোহার নকরি থাকবু ?

চলতরামের গোল চোখ, ভেবাচাকা খাওয়া মুখ। সামলে নিয়ে শশব্যস্তে ডাকের চিঠিগুলো সাহেবের সামনে টেবিলে রেখে সেলাম করল। তারপর যাবার জন্য ঘুরে এক পা বাড়িয়ে তিতলিকেও একটা সেলাম ঠুকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তিতলির চোখে মুখে সর্ব অঙ্গে হাসির জোয়ার নামল। হাসি আর থামেই না। অত হাসির ফাঁকে ফাঁকে আরো যা উপছে উঠছে, স্থান-কাল ভুলে শাওন তা-ও দেখছে। চোখে চোখ পড়তে তিতলি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। হাসি থামলেও মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে আছে। ছড়ার মতো করে টেনে-টেনে বলল, ও চলতরাম চলত-চলত ছাড়ল্অ বাত—আব সারা গাঁওকা খুলাবে আঁখ। হম ভাগ যা-ই—

হালকা দ্রুত পায়ে ক্যাম্প-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুখে কি মনে পড়তে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। হাসির বদলে মুখে ঈষৎ উদ্‌বেগের ছায়া। সেখানে দাঁড়িয়েই আর এক দফা সতর্ক করল।—ও ব্রিজমোহন পর্ কভু বিসোয়াস না রাখত্ বাবু, ও কইসন আদমী বটে তুম না জানল—উহার সিনেমে পাত্থল (পাথরের বুক) আউর মায়া-মমতা ? ফুঃ…।

তিতলি চলে গেল। রঙিন প্রজাপতি উড়ে গেল। এই নীরস ক্যাম্প-ঘরে রং ছড়িয়ে রেখে গেল।

শাওন কখনো নিজের ওপর বিরক্ত হয়, কখনো আবার নিজের ভিতরে চোখ চালিয়ে একটু মজাও পায়। সকালে সাইটের কাজে বা তদারকে নামলে তার তন্ময়তায় সচরাচর ছেদ পড়ে না। জমিতে কাজের

পরিধি বাড়ছেই। কোনো খুঁটিনাটি চোখের আড়াল হয় না, ঘুরেফিরে সর্বত্র টহল দেয়, যেখানে দরকার নিজে হাত লাগায়, কিছু যাচাই করার কথা মনে হলে শ্রমিক বা কারিগরদের হুকুম না করে নিজেই খানা-ডোবা বা গর্তে নেমে পড়ে। ভ্রামম্যান পাম্প-ম্যান ওয়েলডার মিকানিকরাও জানে সাহেব কাজ বোঝে, কাজ ভালবাসে। তাই যাদের কাছেই গিয়ে দাঁড়ায়, তাদের উৎসাহ বাড়ে। এই করে কখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হয় শাওনের হুঁশ থাকে না। বেলা গড়াতে দেখলে অনেক সময় রতন সাইটে এসে তার সাহেবকে ধরে নিয়ে যায়, গজগজ করে, বেলা একটা বেজে গেল কখন আর চান-খাওয়া হবে!

শাওনের ইদানীং মাঝে মাঝে নিজের ওপর বিরক্তির কারণ, এই তন্ময়তায় ব্যাঘাত ঘটছে। কাজের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ থেমে যায়, চারদিকে তাকিয়ে দেখে। একদিক থেকে আর একদিকে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যায়, দু' চোখ সাইটের চার দিকে ঘুরে আসে। যে মেয়ের খেয়াল-খুশির পদক্ষেপে এখানকার নীরস বাতাস সরস হয়ে ওঠে, খোঁড়া-খুবলনো মাটিতে রং ধরে, কখনো জ্ঞাতসারে কখনো বা অগোচরে তাকেই খোঁজে। বিরক্তির কারণ, কাজের মনোযোগে ঘাটতি পড়ে বলে। কাজের ক্ষতি অবশ্যই হয় না, কিন্তু মন সর্বদা নিজের দখলে থাকবেই না কেন? আবার নিজের ভিতরে চোখ চালিয়ে মজা পায় এই কারণে, যে, ব্যাপারখানা কি? মেয়েটাকে হাল্‌কা প্রজাপতির মতো এই মাটিতে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখলে, বা কাছে এলে এত ভালো লাগে কেন? এ-রকম ভালো লাগার অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় আগে কখনো ছিল না। কিন্তু কেন লাগে? তার রূপ? তার যৌবন? নিজের ভিতরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছে শাওন ভার্মা। না, এই রূপ-যৌবনকে নিয়ে কোনো ব্যভিচারী বাসনার অস্তিত্ব মনের কোথাও নেই। থাকলে নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারত না, এই মেয়েকেও বিষ-ফুলের মতোই ছেঁটে ফেলত, এমন কি তার এখানে আসাও বন্ধ করে দিত হয়তো। কিন্তু তা নয়, এ এক বিচিত্র রকমের ভালো-লাগা। ভিতরটাকে সরস করে, স্নিগ্ধ করে, মন-মাতানো ফুলের বাস ছড়ায়।

…ক্যাম্পে আসার পরদিনই ওই মেয়ে একটু বেলায় মাঠে এসে সোজা তার কাছে হাজির। আধা হুকুমের সুরে যা বলেছে, তার অর্থ, আমাকে এখানকার যন্ত্রপাতি আর কাজকর্মগুলো একটু বোঝাও দেখি?

যেন এখানকার বাসিন্দা হিসেবে জানার বা বোঝার তার কিছু অধিকার আছে। শাওন হেসে জবাব দিয়েছে, এতদিন দেখছ, এত লোকের সঙ্গে কথা কইছ, এখনো জানতে বুঝতে কিছু বাকি আছে?

ঠোঁট উল্টে দিয়েছে।—হুঁঃ, তোমার কাজের লোকদের আমার মতোই জ্ঞান-গম্যি—তামুয়া (তামা) কত নিচে আছে জানে না, কবে কতদিনে বেরুবে জানে না, যন্ত্রের নামও এখানকার গাঁইয়া ভাষায় বলে—হাত তুলে অদূরের টুকরো টুকরো লোহার ফ্রেমে আটকানো পাঁচ-ছ'তলা উঁচু কাঠামোটাকে দেখিয়ে বলল, ওটার নাম এরা বলে 'গাছুয়া'—বিলায়েতি জিনিসের নাম এ-রকম কখনো হয়? তারপরেই লালচে ঠোঁটে হাসির ঝিলিক।—তাছাড়া বড়া-সাহাবের মুখ থেকে সব জেনেছি বুঝেছি শুনলে সহেলিদের কাছে আমার কদর বেড়ে যাবে না?

শাওন খুশি মুখে তার যুক্তি মেনে নেবার পর অনেকক্ষণ ধরে তিতলি স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে সঙ্গে সাইটে ঘুরেছে। কোন্‌টা কি আর তার কি কাজ শাওন বলেছে ও খুব মন দিয়ে শুনেছে।… পাঁচ ছ'তলা উঁচু ওই লোহার ফ্রেমের নাম 'রিগ', তার সঙ্গে লোহার দড়ি দিয়ে ঝোলানো যে ঢাউস জিনিসটা—ওটার নাম হম্বর। তার খানিক নিচেই মস্ত পাইপের তলার দিকের খানিকটা মাটিতে ঢুকে আছে। বিশাল ওজনের ওই মস্ত হম্বর দিয়ে পাইপের মাথায় ঘা দিতে দিতে অতবড় পাইপের সবটা মাটির নিচে চলে যাবে।

তিতলি দড়িতে ঝোলানো অমন বিশাল লোহার খণ্ড পাইপের ওপর উঠতে আর পড়তে দেখেছে সেই দিনও দেখেছিল। কিন্তু এমন কাণ্ড কি করে হয় মাথায় ঢোকেনি। এটুকু বুঝেছে আশপাশের যন্ত্রগুলোর সাহায্যে এমন আসুরিক ব্যাপারটা ঘটছে। পাশেই যে মেসিনটা চলছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আর শব্দ অনুকরণ করে তিতলির পরের প্রশ্ন, ঝিঁম্‌ঝিঁম্‌-ঝিঁঃ ঝিঁম্‌ঝিঁম্‌-ঝিঁঃ করে চলেছে ওটা কি জিনিস?

শব্দের অনুকরণ গলা দিয়ে ঠিকই বার করেছে। শাওন বুঝিয়েছে, ওটার নাম ড্রাম-মেসিন ওটা দিয়েই লোহার দড়িতে বাঁধা ওই রোলার ওঠানো আর মাথায় ফেলা হয়, অত মোটা পাইপও ওঠানো নামানো যায়।

পরের চালু যন্ত্রটার দিকে আঙুল।—গোঁওঁওঁ···গোঁওঁওঁ আওয়াজ করে চলেছে ওটা কি?

—ওটার নাম মোটর, ওটার জোরেই ড্রাম মেসিনটা চলছে।

সমজদারের মতো মাথা নেড়ে বুঝে নিয়ে তিতলি তার সঙ্গে আবার এগিয়েছে। কয়েক পা এগিয়েই আবার একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। রাতেও ওটা দেখেছে, তখন ওই যন্ত্রটা চললে চোখ ঝলসে দেবার মতো নীল আলো ঠিকরোয়, সেই নীল আলো মাঠের অনেকটা জায়গার অন্ধকার যেন থেমে-থেমে গিলে খেতে থাকে। ওই যন্ত্র এখন চলছে না, কিন্তু শব্দটা ঠিক মনে আছে তিতলির। আঙুল তুলে ওটা দেখিয়ে গলা দিয়ে সেই শব্দটাই বার করতে চেষ্টা করল।—ফস্···স্···ফট্—ফস্···স্··· স্ ফট্!

শাওন হেসেই চলেছিল।—ওটার নাম ওয়েলডিং মেসিন, ইলেকট্রিকে ঝালাই হয়—ওই মেসিন দিয়ে মস্ত মোটা পাইপ জুড়ে ফেলা যায়।

তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পাওয়ার জেনারেটার দেখল আর ব্যাপারটা বুঝে নিল। বড় সড় ডোবা তৈরি করে তাতে তোড়ে জল ফেলা হচ্ছে যে জিনিসটা দিয়ে তার নাম নাকি ওয়াটার পাম্প। এই নামটা মনে রাখতে তিতলির অসুবিধে নেই, ওয়াটার জল জানাই আছে, আর পাম্পকে তো ওরা পাম্পু বলে। কিন্তু মনে রাখার ব্যাপারে একটু ফ্যাসাদ হল অন্য-রকমের পাম্পুর নামটা নিয়ে—কম্প্রেসার পাম্প্—পাইপের ভিতর দিয়ে জল, কাদা, মাটি তুলে অন্য ডোবায় ফেলার কাজ ওটা দিয়ে হয়। তিতলি বার কয়েক নামটা আওড়ে নিয়েছে—ঠিক মনে থাকবে।

কাজে বা মনোযোগে ছেদ পড়েনি শাওন ভার্মার, কিন্তু সকালের সময়টুকু অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি আনন্দের মধ্যে কেটে গেছে।

বিকেলের দিকে নিজে কাজে হাত লাগায় না, আর কাজ দেখার মধ্যেও হাল্কা মেজাজে ঘুরে বেড়ায় এ তিতলিও জেনে গেছে। একটা

দিন বাদ দিয়ে তার পরদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ চারজনের একটা দল নিয়ে ওই মেয়ে মাঠে হাজির। তখনো বিকেলে সকালের মতো পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যায়নি। প্রায় বিকেলেই ছুট শ্রমিক-মজুরদের দরকার হয় না তখন পর্যন্ত। তবে যে প্ল্যানে এগনো হচ্ছে, তাতে বিকেলের কাজের চাপও শিগগীরই বেড়ে যাবে। শাওন ভার্মা তার একজন খুব অনুগত আর বিশ্বস্ত মেকানিকের সঙ্গে এ-দিক ও-দিক ঘুরছিল, আর মাঝে মাঝে এক একজায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়ে কাজ নিয়ে আলোচনা করছিল। কখনো-সখনো অন্য কথাও হচ্ছিল।

সঙ্গিনীদের নিয়ে তিতলি সোজা তাদের সামনে।—গুডি-ভ-নিং বড়াসাহাব—

শাওন হেসে মাথা নাড়ল। সঙ্গিনী চারজন ঈষৎ আড়ষ্ট। ইংরেজি অভিবাদনের ঘটায় মেকানিকটিও হেসে ফেলল। সাইটে এই মেয়ের মুখ এতদিনে কে আর না চেনে। দু'জনকেই হাসতে দেখে তিতলির পাতলা দুই ভুরুর মাঝে সংশয়ের ঘন ভাঁজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত কোমরে। —কাহে হাঁসথে? নিজের লালচে বাঁ-হাত তাদের সামনে পেতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে কড়ে আঙুলের কড়া গুনে গুনে পলকা, গম্ভীর ঝাঁঝের সুরে বলল, হামে চলতরাম শিখালী ভোরোয়াসে বারা বাজতক্ 'গুড্‌মর্নিং', দুফরসে চাব বাজেতক 'গুডাফ্‌টিন্নুন,' ওকরা বাদ সাঁঝোয়াতক গুডি-ভ-নিং—তো ভুল কাঁহা?

শাওন বিশ্বাসযোগ্যভাবেই মাথা নাড়ল, বলল, ভুল কিছু হয়নি, তোমার মুখে অমন সুন্দর ইংরেজি শুনে আমরা খুশি হয়ে হেসেছি।

মেয়ে বোকা একটুও নয়, গোল কিছু হয়েছে বুঝেইছে। তবু একটু মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর সুরে বলল, থ্যাংকু! তারপর চটপট প্রসঙ্গ বদলে জানান দিল, এই চারজন তার সহেলি। প্রথম যে দুটি শাড়ি-পরা সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করালো, তাদের একজনের বয়স সাতাশ-আঠাশ, নাম শুনল, সীতিয়া (সীতা), পরের শাড়ি-পরা সুশ্রী মেয়েটি তিতলির থেকেও বয়সে বেশ ছোটই হবে—সীতিয়ার ছোটি বহেন্ লছমীা মিষ্টি গলা এরপরেই একটু ভারিক্কি করে তোলার চেষ্টা তিতলির, চোখে মুখে

আত্মপ্রসাদের ভাব ; সমঝে দিল, সে অছুত বলে বাবুসাহেব যেন তার সহেলিদেরও সকলকে অছুত না ভাবে, সীতিয়া আর লছমী হল পঞ্চ-এর মুরুব্বি জনার্দন পূজারীর বেটী !

শুনে শাওনের ভালো লাগল, আবার একটু অবাকও। এত দিনে সে গাঁয়ের মাতব্বরদের নাম-ধাম বা কে কেমন মানুষ মোটামুটি জানে। মহাবীরজীর মন্দিরের প্রধান সেবক আর এখানকার জাত-পাতের গুরুঠাকুর জনার্দন পূজারীর সঙ্গে ঠাকুর ব্রিজমোহন একদিন আলাপও করিয়ে দিয়েছিল। সেই আলাপের বৈঠকে পঞ্চ্-এর অন্য তিন মাতব্বর মহাবীর প্রসাদ জগদেও মিশির আর গণপত লালাও উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে কাজের খাতিরে ইঁট সিমেণ্ট চুন সুরকি আর লোহা-লক্কড়ের শাঁসালো কারবারী গণপত লালার সঙ্গেই কেবল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ শাওনের। কথায় কথায় ওই গণপতের মুখেই একদিন শুনেছিল, জনার্দন পুজারী জাত পাতের কড়া ঠিকাদার। গাঁয়ের এমন জাত-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের হুই মেয়ের সঙ্গে এক অছুত্ মেয়ের এমন ভাব-সাব দেখলে একটু অবাক হবারই কথা।

ছুই মেয়েই হাত জোড় করে নমস্কার জানালো। বয়স্কা মেয়েটি অর্থাৎ সীতার কপালে বা সিঁথিতে সিঁহুরের চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিধবাও মনে হল না, কারণ পরনে পাড়-অলা রঙিন শাড়ি। আবার সাতাশ আঠাশ বছরের সুশ্রী গাঁয়ের মেয়ের অবিবাহিতও থাকার কথা নয়। লছমীকে অবশ্য আঁচ করা যায় তার বিয়ে হয়নি।

বাকি হুটো শ্যামবর্ণা মেয়ের পরণে রঙিন ঘাঘরা আর জামা। তিতলির মতো অত চকচকে বা দামী নয় অবশ্য। ওদের একজনের নাম মায়া অন্য জনের বিজ্লী। কালো হলেও কুৎসিত নয়, আর হাসিখুশি ; ওদের সম্পর্কে আর কিছু না বলাতে বোঝা গেল ওরা স্বজাতের। তিতলির সমবয়সী, হু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।

পরিচয়পর্বের পর তিতলি এ-সময়ে এখানে হানা দেবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। কিন্তু এটুকুর মধ্যেও রসালো কৌতুকের মিশেল।...ঠাকুর ব্রিজমোহনকে তো সবাই খুব পছন্দ আর মান্যিগণ্যি করে, তাই সরকার

তার খাস জমির দখল করে এত সব যন্ত্রপাতি বসিয়ে এখানে কি করছে সহেলিদেরও জানার আর বোঝার ইচ্ছে—এ-জন্যেই তিতলিকে ধরে ওদের আসা।

শাওন হাসি মুখেই অনুমতি দিল, বলল, তুমি তো সবই জেনে বুঝে গেছ, তুমিই ওদের দেখাও শোনাও—

জবাবে দু'চোখ একটু বড় করে যা বলল, তা কেবল এই মেয়ের মুখেই মানায়।—আমিই দেখাব শোনাব না তো কি তোমার ভরসায় ওদের এনেছি?…তবে তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছ দেখছি, ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারো—

অনুমতি পেয়ে শাওন বর্তে যাওয়ার ভাব দেখালো। হাসি চেপে সবিনয়ে বলল, আচ্ছা তোমরা এগোও, আমরা আসছি।

নিজেদের কথা আর বিশেষ এগলো না। এই হালকা দিনে ওদের সঙ্গ নিতে ইচ্ছে করছে এটা কোন্ ধরনের দুর্বলতা শাওন তা-ও ঠাওর করে উঠতে পারছে না। ভিতর থেকেই প্রশ্ন উঠল, ওদের না বিশেষ করে একজনের? না, শাওন এই বিশ্লেষণের মধ্যে মাথা গলাবে না। সে বরাবর একলার জগতের মানুষ। তার মধ্যে এই বৈচিত্র্য ভালো লাগে, ভালো লাগছে তাতে কার কি ক্ষতি?

চলতে চলতে হাসি মুখে তিতলিকে দেখিয়ে মেকানিকটা বলল, এখানে এসে পর্যন্ত ওই মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক রকমের কথা শুনেছি—

মেয়ের দল গজ দশেক আগে আগে চলছে, আর তিতলি সব-জান্তার মতো এটা-সেটা দেখাচ্ছে, আর তার মুখ চলছে। কি বলছে তা অবশ্য শুনতে পাচ্ছে না। মেকানিকের কথা শুনে শাওন উৎসুক।—খারাপ কিছু?

—না না, বরং খুব ভালো। মেয়েটা নাকি এই গাঁয়ের মুরুব্বিদেরও কাউকে কেয়ার করে না, কারো অন্যায় দেখলে এসে রুখে দাঁড়ায়, কৈফিয়ৎ চায়।…তোতারাম একদিন গল্প করেছিল, ওই সীতা মেয়েটার তার বাপ জনার্দন পূজারীর ওপর ভীষণ রাগ। টাকা খেয়ে ভিন গাঁয়ের এক বড়লোক আধ-বুড়োর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। এই স্বামীর ঘরে আরো দুই সতীন আছে তা পর্যন্ত কাউকে জানতে দেয়নি। আর ওই

ভদ্রলোক আধ-বুড়ো যখন দেখতে আসে সীতার তখনো ধারণা ওই লোক তার শ্বশুর হবে। বাপের ওপর আক্রোশ আর দুই সতীনের অত্যাচারে বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সীতা স্বামীর ভিটা ছেড়ে চলে এসেছে। জনার্দন পূজারী চেষ্টা করেও এই দশ বছরের মধ্যে আর তাকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে পারেনি। মেয়ে যেমন জেদী তেমনি তেজী। তাছাড়া মেয়ের এই অদৃষ্ট দেখে তার মা-ও সোয়ামীর ওপর ক্ষিপ্ত। মা-মেয়ের দাপটে ঘরে জনার্দন পূজারীর চুহার দশা। বাপের ওপর আক্রোশেই সীতা জাত-পাতের ধার ধারে না, অচ্ছুত পাড়ায় গিয়েও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে। আর ওর জন্যেই ছোট মেয়ে লছমীটাও বিগড়ে যাচ্ছে, তিতলির সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব। সীতাও এমন ভাব দেখায় যেন লছমীর মতো তিতলি ওর আর একটা ছোট বোন। জাত-পাতের মাথা হয়ে জনার্দন পূজারী এতটা বরদাস্ত করে কী করে? তাছাড়া দেখতে ছোট-খাট হলেও লছমীর বয়েস তো আঠেরো গড়িয়ে যাচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে না? জনার্দন পূজারীর মেয়ে বলেই ছোট জাতের ওই মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা দেখেও গাঁয়ের লোক মুখ বুঁজে মজা দেখছে, কিন্তু বিপাকে ফেলার মওকা পেলে তারা কি আর চুপ করে থাকবে?····এই সব ভেবেই নাকি পঞ্চ-এর অন্য মুরুব্বিদের সঙ্গে পরামর্শ করে জনার্দন পূজারী একটা ছোট বৈঠক ডেকেছিল। উদ্দেশ্য পঞ্চ-এর বন্ধুরা সীতা আর লছমীকে আপনার জনের মতো একটু সমঝে দেবে আর তিতলিকেও একটু সতর্ক করে দেবে।···

কিন্তু সেই ঘরোয়া সভায় এসে তিতলি জনার্দন পূজারীকে একেবারে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল। খুব মিঠা করে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অযোধ্যার রামজী, মহাভারতের ব্যাস মুনির মাতাজী সত্‌বতী বা ভীম, আর দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম শুনেছে কি না। রূপের জোরে হোক বা যে জন্যেই হোক গাঁয়ের সকলের মতো এই মরুব্বিরাও মেয়েটাকে একটু ভিন্ন চোখে দেখে—তাছাড়া এটা বিচার-বৈঠক তো আর নয়। প্রশ্ন শুনে সকলে হেসে উঠেছিল, জনার্দন পূজারীও। কিন্তু তার পরের প্রশ্ন শুনে থ। তিতলি জানতে চেয়েছে, রামজী গুহক চণ্ডালকে বুকে টেনে নিয়েছিল বলে তার জাতে দাগ পড়েছে কি না, ব্যাস-মাতা সত্‌বতী মাছুয়ার ঘরে বড় হয়েছিল

বলে তার জাতে কলঙ্ক লেগেছে কি না, হিড়িম্বা-রাক্ষসীকে বিয়ে করেছিল বলে ভীমের জাত খোয়া গেছে কি না, আর রাজা হরিশ্চন্দ্র ডোমদের সঙ্গে থেকেছিল, তাদের সঙ্গে খানাপিনা করেছিল আর মুর্দা পুড়িয়েছিল বলে সে অচ্ছুত হয়ে গেছে কি না ?

বোঝানো বা সমঝানো মাথায় উঠেছিল নাকি। মুরুব্বিদের সামনেই সীতা তিতলিকে জড়িয়ে ধরে লছমীকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিল।···মুরুব্বিদের মধ্যে সব থেকে যার মাথা উঁচু সেই ব্রিজমোহনই যখন হা-হা করে হেসে উঠে মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিল, জনার্দন পূজারী কি আর করে ? পরে ব্রিজমোহন না কি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, মেয়েটা আর খুব বেশিদিন গাঁয়ের লোকেদের জ্বালাবে না—আর সে থাকতে তার মেয়েদেরও কেউ ক্ষতি করবে না, পূজারীজি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

সামনের দিকে চোখ রেখে শাওন সাগ্রহে শুনছিল, আর মজাও পাচ্ছিল। মেকানিকের শেষের কথা আর তেমন কানে ঢোকেনি। ভাবছিল জ্ঞান বুদ্ধি শুধু নয় বুকের পাটা আছে বটে মেয়েটার।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়ে তিতলি তার সহেলিদের কাছে নিজের জ্ঞান ফলাচ্ছে।—ওটার নাম মোটর, ওটা দিয়ে এই কাজ হয়, ওটা হল ডরাম মিসিন—ওটার এই এই কাজ, ওই যে তোড়ে জল ফেলা হচ্ছে তার নাম কমপ্রস্যুয়া পাম্পু, আর পাইপের ভিতর দিয়ে জল কাদা তুলে ডোবায় ফেলা হচ্ছে যেটা দিয়ে সেটা হল, ওটার পাম্পু। শাওন আর মেকানিক ওদের পাঁচ সাত হাত পিছনে দাঁড়িয়ে। শাওন বাধা দেবার ফুরসত পেল না, যন্ত্রের পরিচয় বিস্তার শুনে মেকানিক একটু জোরেই হেসে ফেলল। তক্ষুনি সামনের চার-জোড়া রমণী চক্ষু ওদের দিকে ঘুরল। শাওনের ধারণা, হাসতে দেখা মাত্র তিতলি বুঝেছে যন্ত্র বোঝানোর ব্যাপারে কিছু গড়বড় হয়ে গেছে। কোমরে দু'হাত তোলা আর ভুরু কোঁচকানো যেন রূপসীমেয়ের মুদ্রাদোষ।

···কাহে হাসত, হম্ কা ভুল কহলী ?

হাসি চাপতে চেষ্টা করে শাওন বলল, বেশি না, সামান্য একটু··

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো চ্যালেঞ্জ। মেয়েটা সত্যিই রেগে গেছে মনে

হল। কা ভুল কহ দিহ?

ওকে আশ্বস্ত করার মতো করেই নরম গলায় শাওন জবাব দিল, বললাম তো বেশি কিছু না, সহেলিদের তুমি কেবল দিনকে রাত আর রাতকে দিন বুঝিয়েছ—মোটরকে ড্রাম-মেশিনে আর ড্রাম-মেশিনকে মোটর বলেছ···ওয়াটার পাম্প আর কম্‌প্রেসার পাম্পের নাম দুটোও উল্টে নিলেই একেবারে ঠিক হত।··

মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না, বিপাকে পড়েও তার বেপরোয়া আক্রমণ দেখতে যেমন শুনতেও তেমনি। আমি উল্টো-পাল্টা বললেও তোমার যন্ত্রের কাজগুলো সব উল্টে পাল্টে যাবে? সহেলিদের আমি কি বোঝাচ্ছি না বোঝাচ্ছি পিছনে দাঁড়িয়ে তোমাদের কে শুনতে বলেছে?

ওদের গ্রাম্য ভাষায় রাগ আর তেজের এতগুলো কথার যেটুকু মাথায় ঢুকল, মেকানিকটির তাঁতেই ভেবাচাকা খাওয়া মুখ। এ-ভাবে আক্রান্ত হয়ে শাওনও ফাঁপরেই পড়ল একটু। প্রতিটি কথা কানে লেগে আছে, তবু আত্মরক্ষার চেষ্টায় অনেকটাই না বোঝার ভান করে সঙ্গিনীদের দিকে তাকালো। ওদের চোখে মুখে হাসি উপছে পড়তে চাইছে। তিতলির কানের কাছে মুখ এনে সীতা চাপা শাসনের সুরে বলল, কি বলছিস বুঝতে পারলে সাহেব এখান থেকে আমাদের শুদ্ধু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে!

তিতলির দু'হাত তখনো কোমর থেকে নামেনি, আর চোখ দুটোও শাওনের চোখ থেকে নড়েনি। কনুইয়ের ধাক্কায় সীতাকে একটু ঠেলে দিয়ে বেশ গলা চড়িয়েই জবাব দিল, সাহেব সেয়ানা কত আমার জানা আছে, যা বলেছি সবই বুঝেছে।

শাওন ভার্মার নিঃসঙ্গ একলার জীবনে এই বৈচিত্র্যটুকু বড় সুন্দর, বড় লোভনীয়। বুদ্ধিমানের মতো এবারে সে আত্মসমর্পণ করে ফেলল। হেসে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে তিন সঙ্গিনীরও খিল খিল হাসি। বিজ্‌লী নামে মেয়েটা ছড়া কাটার সুরে বলে উঠল, তিত্‌লিয়া তিত্‌লিয়া, তুঁহারি ঝুঁটি নিক্‌লিয়া—ছুঁ মন্তর ছুঁ····ঃ! তোর বাকতল্লা বোঝা গেছে, রাগ দেখিয়ে

কত আর ধানাচাপা দিবি ?

তিতলির চোখে হাসি, দুই ঠোঁটের কোণে হাসির আঁচড়, মুখেও হাসির আভা ঠিকরোচ্ছে, কিন্তু এর পরেও মেজাজ নরম করতে নারাজ। শাওনের মুখের ওপর দুচোখ তেমনি অপলক।—এ বাবু সাহাব, সহেলিকে আগে (সামনে) তুম হমারকে বেইজ্জত্ কৈলা, হাম এ জমিন্‌পর কভু না আইবু!

এই বয়সের আর এমন রূপের মেয়েকে বেইজ্জত করা হয়েছে শুনলে কান গরম হবার কথা। কিন্তু কথাগুলো বনের পাখির কাকলির মতো সরল মনে হল শাওনের। আর যে-মুখ করে শাসালো, মনে হবে ও আর না এলে এখানকার সব কাজ-কর্মই পণ্ড।

ঘাবড়ে যাওয়ার ভান করার ফলে শাওনের গলার স্বর আরো নরম। —তাহলে তো খুব বিপদ, আমার কসুর হয়ে গেছে, মাপ করে দাও।

চোখে মুখে ঠোঁটে হাসি আরো উপছে পড়ার দাখিল, কিন্তু তিতলি এখনো রাগের ঠমক আঁকড়ে ধরে আছে। ঝাঁঝালো গলায় বলল, দুবলা লোক মাফি মাঙে, মরদ আদমী কখনো মাপ চায় না, তারা হিম্মত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ করে।

—কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলে দাও।

সঙ্গিনীদের চোখে মুখে কৌতুক উপছে উঠছে।...ভাবছে তিতলি মিথ্যে বলেনি, ওরা যে-যার ভাষায় কথা বলছে, কিন্তু সাহেবের বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না, দিব্বি বুঝেছে আর কথার জবাব দিচ্ছে।

সম্ভব হলে শাওন তিতলির এই মুখখানা ক্যামেরায় ধরে রাখত। ওপরের কয়েকটা দাঁতে করে নিচের ঠোঁটের কোণটা বারকয়েক ঘষ্টে নিল। কি প্রায়শ্চিত্তের কথা বলবে চটপট ভেবে নিচ্ছে। আড় চোখে একবার বিজলী আর একবার মায়ার দিকে তাকিয়ে নিল।—তোমার এখানে কিছু অছুত মরদও কাজ করছে দেখছি। কিন্তু তারা সবাই ব্রিজমোহন বা তার স্যাঙাতদের তাঁবের লোক—এই তো বিজলী আর মায়ার দুটো যোয়ান ভাইয়া ঘরে বসে আছে, কাজ পাচ্ছে না, এমন আরো কত আছে—তুমি তাদের কাজে নিচ্ছ না কেন ?

শাওন সবিনয়ে ফিরে প্রশ্ন করল, তারা কি আমার কাছে কাজের জন্য এসেছিল ?

—তোমার কাছে, তারা আসবে কি করে ? কাজের খোঁজে এলে ওই মরুব্বিদের সর্দাররা তাদের দূর করে তাড়িয়ে দেয় !

—আচ্ছা, কালই তুমি ওদের আমার নাম করে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

হাসি ঝিলিক দিচ্ছে, তিতলি তবু সামলাতেই চেষ্টা করছে।—কত জনকে পাঠাবো ?

কত জনকে পাঠাবে ঠিক করতে না পেরে শাওন মেকানিকের দিকে তাকালো। সে খাটো গলায় জানান দিল, আপাতত জনা পাঁচেককে পাঠাতে বলুন, পরে বিকেলের দিকে কাজ বাড়লে আরো অনেক লোকই লাগবে।

শাওন তাই বলে দিল।

এতক্ষণে তিতলির চোখে মুখে শুধু নয়, সর্ব অঙ্গ দিয়ে যেন খুশি ভেঙে পড়ল। সাদা কমলের মতো ছু'হাত জুড়ে বুকে ঠেকিয়ে আধখানা ঝুঁকে প্রণতি জানালো। বলল, এ বাবু, এ ভবে গাঁওমে তোঁহার মাফিক এককো দিলদার আদমী না দেখলী—সাচই তুম বড়া সাহাব ভৈল।

পরদিন সকালে তিতলির কাছ থেকে পাঁচের বদলে ছয় জোয়ান এসে হাজির। ছয় জনের মধ্যে পাঁচজনকে রেখে একজনকে বিদায় করা হয় কিনা মেয়েটা হয়তো সকৌতুকে তাই পরখ করতে চায়। সাপ্তাহিক হারে শাওন ভার্মা ছ'জনকেই নিয়ে নেবার হুকুম দিল।

ভদ্র সমাজের ভব্যতার রীতি অনুযায়ী এরপর তিতলির এসে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর কথা। কিন্তু পরের ছু'তিনদিন তাকে আর এই জমির ত্রি-সীমানায় দেখা গেল না। তৃতীয় দিনের ছুপুরে ক্যাম্পের অফিস ঘরে এসে হাজির তোতারাম। —নমস্তে ভার্মা সাব, বাতাবাতি খাতির আইল বাড়ে (গল্প করতে এলাম)···মগর দেখত, রহুয়া কাম কা চিন্তামে ডুবত রহল্অ···

খুশি না হলেও বাইরে এই লোকের সঙ্গে দোস্তির সম্পর্ক। তা ছাড়া

এই ভর দুপুরে কেবল গল্প করার জন্যেই এসেছে মনে হল না। একটু হেসেই আহ্বান জানালো, খুব না, এসো—

সে এসে বসার ফাঁকে শাওনের আরো কিছু মনে পড়ে গেল। ব্রিজমোহনের মোসায়েব জানা সত্ত্বেও বছর চল্লিশের এই রোগা ঢ্যাঙা লোকটাকে শাওনের খুব খারাপ লাগত না। ভাবত পেটের দায়ে মোসায়েবি করে, নইলে দিব্বি রসে টইটম্বুর মজার মানুষ। কিন্তু তিতলি সেদিন এই ক্যাম্পের অফিসে এসে রসের বিকৃত দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।···তিতলির মুখে তোতাচাচা শুনে শাওন স্বাভাবিক কৌতূহলেই জানতে চেয়েছিল তোতারাম তার কাকা হয় কি না। জবাবে তিতলি হেসে উঠে বলেছিল, কাকা হয়, কিন্তু সে তোমার মতো উঁচু জাতের লোক, তাহলে বোঝো কিরকম কাকা! আবার হেসে উঠে তিতলি আরো বলেছিল, ওই কাকাটি ঠাকুর ব্রিজমোহনের চামচা না হলে এই অছুত ভাইঝির যৌবনখানা কেমন বুঝতে চেষ্টা করতে ছাড়ত না।

শুনে শাওনের দু'কান লাল হয়ে উঠেছিল।

—কা শোচত দোস্ত?

বিতৃষ্ণা তল করে শাওন বলল, না, তোমাদের খবর কি বলো—

নির্লিপ্ত মুখ করে তোতারাম জানান দিল, খবর কিছু থাকলে ছুপা গাঁওয়ের সকলেই তা জানতে পারে, সে রকম খবর কিছু নেই, তবে কাল রাতেও ঠাকুর সাহেব তোমার কথা বলে দুঃখ করছিল, বলছিল, অনেক-দিন তুমি তার ওখানে যাও না—আবার তিতলির পাঠানো ছ'জন অছুত যোয়ানকে তুমি এখানে কাজ দিয়েছ শুনে তাঁকে খুব খুশিও দেখলাম।

খবর থাকলে ছুপা গাঁওয়ের সকলেই জানতে পারে কথাটার তাৎপর্য বোঝা গেল। অর্থাৎ তিতলির পাঠানো ছজন লোককে নেওয়া হয়েছে এটা একটা খবর এবং কারো তা জানতে বাকি নেই। মাথায় হঠাৎ কোনো গোঁ না চাপলে শাওন ভার্মা ঠাণ্ডা মানুষ, আর খুব দুঃসাহসীও নয়। তেতে উঠতে গিয়েও ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিতের উপদেশ মনে

পড়েছে। এদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সদ্ভাব রেখে চলতে বলেছিলেন। হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিল, সরকারি কাজে আর ছুত-অছুত নিয়ে কি কথা, লোক দরকার হয়েছে নিয়েছি···ঠাকুর ব্রিজমোহনের সুপারিশেরও অনেক লোক তো এখানে কাজ করছে—তাদের মধ্যে অছুতও আছে।

তোতারামের প্রথমে হাঁ মুখ। এ-কথা কেন বলল তা যেন বুঝতেই পারছে না। সেই বিস্ময়ই গলা দিয়ে বেরুলো।—খুঁশিয়াকা বাতচিতোয়া সে এ তুম কা কহলঅ! তুমি লিখি-পড়ি জানা লোক, বড়িয়া সরকারী অফ্সার, নীচু জাতকে ছোট ভাব না আমার মালেক তো এই জন্যেই খুশি!···তিতলি সেদিন তোমার এই ক্যাম্প অফিসে এসেছিল, সম্মান দেখিয়ে তুমি চেয়ারে বসতে দিয়েছ, তার সঙ্গে কথা বলেছ, পেয়ালা পিরিচে চা-বিস্কুট খাইয়েছ—ডাক-পিওন চলত্‌রামের মুখে এ-কথা শুনেও তো ঠাকুরসাহেব তার দোস্তদের কাছে তোমার প্রশংসা করছিল—

শাওনের এই দ্বিতীয় দফা বুঝতে হল ছুপার খবর চাপা থাকে না ···তিতলির এই ক্যাম্প অফিসে আসা, চেয়ারে বসা, আর কাপ-ডিশে চা খাওয়াটা এদের কাছে হয়তো আরো বড় খবর। কিন্তু শাওনের স্পষ্ট মনে আছে চলত্‌রাম সেদিন ডাক বিলি করতে আসার আগেই রতন দুজনেরই খালি পেয়ালা প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেছল, মেয়েটাকে তার সামনে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেই ওই ডাক-পিওন হাঁ হয়ে গেছল। চা-বিস্কুট খাওয়ার কথা সে জানলো কি করে! তার পরেই অবশ্য মনে হল, তিতলি নিজেই পাঁচ জনের কাছে এ-গল্প করে থাকতে পারে, কারণ ওদের সমাজে এমন উদার আপ্যায়ন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। তিতলি নিজেও সেদিন কম অবাক হয়নি। চলত্‌রাম আর কারো মুখে এমনকি পরে তিতলির নিজের মুখ থেকেও শুনে থাকতে পারে। আর মেয়েটা তো সেদিন বলেই গেছল, চলত্‌রাম এরপর চলতে চলতে মুখ খুলবে, আর গাঁওয়ের লোকের চোখ খুলবে।

···গাঁয়ের লোকের চোখ কতটা খুলেছে জানে না, কিন্তু মুরুব্বিদের চোখ বেশ খোলা হয়েছে বুঝতে পারছে। ঠাকুর ব্রিজমোহনের প্রশংসার কথা শোনাতেই এই লোক এ-সময়ে আসেনি এটা খুব স্পষ্ট।

কি মনে হতে শাওন কব্জির ঘড়িতে সময় দেখল। আর মিনিট পনেরর মধ্যে রতন চা নিয়ে আসবে। তবু ভদ্রতার সুরে বলল, একটু চা দিতে বলি? ওহো! না থাক্…

এই ক্যাম্প অফিসে এসে তোতারাম আরো একাধিক দিন চা খেয়ে গেছে। অতএব শাওন যা আশা করেছিল তাই। বেশ অবাক হয়েই চেয়ে রইলো। তা সত্ত্বেও সামনের মানুষকে চুপ দেখে জিগ্যেস করল, কেন, তোমার চা ফুরিয়ে গেছে?

—না, চা অনেক আছে…কিন্তু তুমি আমার এখানে আর চা খাবে কি করে…ওই অছুত্ মেয়ের চা-খাওয়া পেয়ালা ফেলেও দেওয়া হয়নি, আলাদা করে সরিয়ে রাখাও হয়নি, অন্য পেয়ালার সঙ্গে মিশে গেছে, তিতলির খাওয়া পেয়ালাই তোমার ভাগ্যে পড়বে কিনা কে জানে, ঠাকুর সাহেব আমার প্রশংসা করলেও তুমি এখানে চা খেয়ে গেছ শুনলে তোমার তো আর প্রশংসা করবেন না, তুমিও হলপ করে বলতে পারবে না অন্য পেয়ালায় চা খেয়েছ…

তোতারামের খুদে আর বোকা বোকা দু'চোখ গোল হয়ে তার মুখের ওপর আটকে রইলো খানিক। কিন্তু একটু কৌতুকও উঁকিঝুঁকি দিল কিনা ঠিক ঠাওর করা গেল না। জিগ্যেস করল, ঠাকুর সাহাবকা কেইসে পতা লাগ্‌বে?

—চলত্‌রাম যে-কোনো সময় ডাক বিলি করতে এসে যেতে পারে—

জবাব দেবার আগে বোকা হাসিতে এবার মুখখানা ভরাট করে নিল তোতারাম। প্রথমে বলল, চায়ের কথা শুনেই তার তেষ্টা পেয়ে গেছে, রতনকে আগে চা আনতে বলা হোক।

বেল টিপতে রতন গলা বাড়ালো আর সাহেবের ইশারা বুঝে নিয়ে চলে গেল। তোতারাম এখনো তার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। টিপে টিপে যেটুকু ব্যক্ত করল, শাওন ভার্মা সেটুকু শুনেই উৎসুক। ঠাকুর ব্রিজমোহনের কাছে গিয়ে সে যদি হলপ করে বলতে পারত তিতলির খাওয়া পেয়ালাতেই সে চা খেয়ে এসেছে তাহলে তার খাতির বরং বেড়ে যেত। সে যদি ঠাকুর সাহেবের শত্রু হত তাহলে অবশ্য ভয়ের কথা ছিল,

এই অপরাধে হয়তো পঞ্চ-এর বৈঠক ডেকে তাকে এক-ঘরেই করা হত— কিন্তু সে-তো আর শত্রু নয়, ঠাকুর সাহেবের সব থেকে বিশ্বাসী লোক। …ঠাকুর ব্রিজমোহন ওই অচ্ছুত্ মেয়েটাকে কত যে স্নেহ করে এ তার থেকে বেশি আর কে জানে?…ওই বেপরোয়া মেয়ে যে ভয়ংকর লোকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বসেছিল, ঠাকুর সাহেবের স্নেহের ছায়ায় না থাকলে সেই দাপটের ছেলে ছবছর আগেই ওই মেয়েকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেত তারপর বন্ধুদের দিয়ে খাওয়াতো—তাই করবে বলে প্রতিজ্ঞাও করেছিল। ঠাকুর সাহেব সহায় না থাকলে ওই মেয়ে মান ইজ্জত খুইয়ে দিওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াতো, নয়তো পুনপুর জলে ডুবে আত্মহত্যা করত।

তিতলির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল বলে এটুকু শুনেই শাওন ভার্মার আতঙ্ক। কেন তিতলি কার সঙ্গে লাগতে গেছল?

—তিতলি না, লাগতে গেছল সেই ভীষণ ছেলেই, অন্য যে-কোনো মেয়ে হলে ভয়ে পালাবার পথ খুঁজত—কিন্তু তিতলি ওই দাপটের ছেলের সাগরেদেদের সামনেই তার মুখ ভোঁতা করে দিয়েছিল। এটুকু জানান দিয়ে একটা হাত তুলে আয়েসী গলায় তোতারাম সবুর করতে বলল।—রোসো আগে চা-বিস্কুট খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিই।

ট্রে হাতে রতন প্রায় তক্ষুনি হাজির। দুজনের দু' পেয়ালা চা আর মাঝখানে বিস্কুটের ডিশ রেখে সে প্রস্থান করার আগেই একসঙ্গে দুটো বিস্কুট তুলে তোতারাম নিজের পেয়ালার চায়ে ডুবিয়ে মুখে দিল।
—ফাস্টো কেলাস, তিতলিকেও সেদিন এই বিস্কুটই খাইয়েছিলে বুঝি?

বিরক্তি চেপে শাওন জবাব দিল, আমি বলতে পারব না, যাবার আগে রতনকে জিগেস করে যেও।

ক্যাম্প ইন-চার্জ এখন কোন্ কথা শোনার জন্য উদগ্রীব তোতারাম ভালোই জানে। কিন্তু তার দিক থেকে কি-বা তাড়া। আয়েস করে আরো দুখানা বিস্কুট চিবিয়ে আর হুস-হুস শব্দে আধ-পেয়ালা চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে প্রসঙ্গে ফিরল। মাত্রা-ছাড়ানো ভাঙের নেশার ফলে তোতারামের কথা বলার ধরন টানা-টানা আর একটু জড়ানো, তার মুখের ভোজপুরী বোঝার জন্যই শাওন ভার্মার দু'কান খাড়া এখন।

—তুমি বাবুয়াকে চেনো ?

একটু ভাবতে শাওনের মনে পড়ল। —আলাপ নেই তবে নাম শুনেছি···ব্রিজমোহনের ভাতিজা তো ?

—হাঁ, বহুত পেয়ারের ভাতিজা। এটা তার বড় পরিচয় বটে, কিন্তু তার ভীষণ পরিচয় হল, সে ব্রিজমোহন আর তার খাতিরের জোতদারদের ভূমি-সেনা দলের একনম্বর সর্দার।···লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং ছাড়া এতবড় ভূমি-সেনার দল আর কারো নেই। নানা কারণে একটু চাপের মধ্যে পড়ে বাবুয়া আর তার দল এখন চুপচাপ আছে, কিন্তু তাদের দাপট তুমি ভাবতে পারবে না। আর সাত-আট মাস আগে হলেও তোমাকে এখানকার মাটি খুঁড়ে খনি বার করার চেষ্টা করতে হত না, ওই বাবুয়াই তোমাকে মাটির নিচে জিন্দা পুঁতে রেখে দিত—তিতলিকে সেদিন বলছিলাম তোমার জীবন এখনো আমি—

থমকে থেমে গেল। হেসে শেষের প্রসঙ্গটুকু তরল করে দিতে চাইলো। —কি বলতে গিয়ে কি বলছি ঠিক নেই, এই জন্যেই আমি নিজের মগজ থেকে কোনো কথা বার করি না—

ডিশ থেকে শেষ দুটো বিস্কুট তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। যেটুকু বলেছে তাইতেই পরোক্ষে মালিকের বেশ নিন্দে করা হয়ে গেছে বলে লোকটা কথার মাঝে থেমে গেছে। কিন্তু এই থেমে যাওয়াটা কেন যেন অকৃত্রিম মনে হল না শাওনের। নুন খেয়ে সর্বদা যারা কেবল মনিবের গুণ গেয়েই অভ্যস্ত, তাদের মুখ দিয়ে এ-রকম বেসামাল কথা বেরিয়ে যায় কিনা ভেবে খটকা লাগছে। তোতারামকে আর যা-ই হোক মগজ-শূন্য মানুষ বলে মনে হয়নি শাওনের।

পেয়ালার চা নিঃশেষ করে ধীরে সুস্থে সে আবার প্রসঙ্গ বিস্তারের দিকে এগলো।···ঘটনাটা আরো দু'বছর আগের। তিতলির বয়েস তখন আঠারো। মোটামুটি এখনকার মতোই না-ফোটা নিটোল গোলাপ ফুলটি। এরও ঢের আগে থেকে শতেক জোয়ান মরদের গাঁয়ের এই সেরা রূপের মেয়ের দিকে চোখ, তার মধ্যে বাবুয়ারও চোখ পড়বে না এ কখনো হয় ? কিন্তু ভূমি-সেনার দল নিয়ে সে তখন এত ব্যস্ত যে মাসের

মধ্যে বিশ-বাইশ দিন তাকে গাঁয়ের বাইরে থাকতে হয়, দল জোরদার করতে হয়, কাকার আদেশ-মতো অন্য জোতদারদের ভূমি-সেনাদের সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাবুয়ার তাড়া কিছু নেই। গোলাপ কুঁড়ি আরো নিটোল আরো তরতাজা হোক, তার হাত ছাড়িয়ে যাবে কোথায়।

…তারপর আরো দুটো বছর যেতে, তিতলির বয়েস যখন আঠারো, তখন দিনে দুপুরে সকলের চোখের ওপর সেই কাণ্ড। তার আগে টানা আট ন'মাস বেশির ভাগ সময় ছুপার বাইরে থাকতে হয়েছিল তাকে। এখন চাচার আশ্রয়ে তার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, আনন্দের বিশ্রাম। ইয়ার-বকশীদের সঙ্গে বাবুয়া কখন কোথায় কোনদিকে আছে জানতে পারলে গরিব গৃহস্থঘরের কাঁচা জোয়ানীর মেয়ে বউরা খুব দরকার থাকলেও সেদিকের ছায়া মাড়ায় না।

এমনি এক দিনে দুই সহেলি এবং তিতলি বাবুয়া আর তার বয়স্যদের একেবারে মুখোমুখি। বেলা তখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। পুনপু থেকে জল নিয়ে ফিরছিল। তিতলির ফুফু খুব সেয়ানা আর হিসেবী মেয়েছেলে। গাঁয়ের অন্য মেয়েদের মতো তিতলির নদী থেকে জল আনতে যাওয়া মোটে পছন্দ করে না। তার দরকারও পড়ে না। অছুত্ হলেও তার সচ্ছল অবস্থা। তার বুড়ী ছুঁড়ী দু'দুটো কাজের মেয়ে আছে। কিন্তু কাঁচা বয়সের মেয়ে বউরা কেবল জলের দরকারেই নদী থেকে জল আনতে যায় না। এই জল আনতে যাওয়ার মধ্যে অনেক রঙ্গ-রসের আকর্ষণ আছে। চোখ লাল করে ঘরে আটকে রাখা যাবে তিতলি এমন মেয়ে নয়।

…সামনে বাবুয়া আর তার ইয়ারদের দেখে তিতলির দুই সহচরীর বুকের তলায় কাঁপুনি। তাদের ছোট একটা ধমক দিয়ে তিতলি সদর্পে এগিয়ে আসছে। কে বা কারা দাঁড়িয়ে আছে পরোয়া নেই।

বাবুয়া দাঁড়িয়ে গেছে। তার সাগরেদরাও। আট-ন'মাসের অদর্শনের ফাঁকে তিতলি এমন লোভনীয় রকমের রূপসী হয়ে উঠবে এ-যেন বাবুয়ার হিসেবের মধ্যে ছিল না। হিসেবের ঢের বেশি হাতের মুঠোয় এলে কার

না উল্লাস হয়।···মাথায় গাগরী, সদর্পে এগিয়ে আসার ঠমকে সর্ব অঙ্গে জোয়ানির ঢেউ ওঠা নামা করছে, উছলে পড়তে চাইছে।

বাবুয়ার হাঙরের চোখ। তিতলি আরো এগিয়ে আসতে আনন্দে আর উল্লাসে তার ভিতরে কাব্য-রসও উথলে উঠল একটু। এক কালে সে শস্তার হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের মহড়াও দিত। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আকুতির সুরে বলে উঠল,

'এ গোরী তু ভর কটোরী, কর গঙ্গা স্নান,
তেরে ছাতিমে দো ডালিম বসত হ্যায়
কর্ এ ছত্ রীকা দান।'

তিতলি তার তিন হাতের মধ্যে মুখোমুখি সোজা দাঁড়িয়ে। মাথায় গাগরী, দু'হাত কোমরে। চোখে চোখ। চাউনি কোমল হয়ে আসতে লাগল। জিভ আর তালুর সংযোগে চ্য-চ্য করে আক্ষেপের শব্দ বেরুলো একটু। তারপরে জবাব :

'সাচ কহল্ মেরি বাচুয়া (খোকা) ছতীয়া, সাচ কহল্অ
এক-কে খায়ে দুসরে কো খোঁটে
লোরি শুনাউ যব-তক নিদ না টুটে'—আহ
মেরি বাচুয়া আ-হ—'

এটুকু শুনে শাওন ভার্মার কান মুখ লাল, আবার ঠিক ঠিক অর্থ করলে কি নিষ্কলুষ সুন্দর। লুব্ধ বাবুয়ার আবেদন, গঙ্গা স্নানান্তে সুন্দরী যুবতী তুমি ভরা গাগরী নিয়ে ফিরছ, তোমার বুকের ওই পরিপুষ্ট ডালিম দুটো এই ছত্রীকে দান করো। জবাবে গলা দিয়ে আক্ষেপের শব্দ বার করে নিজেকে একেবারে মায়ের পর্যায়ে তুলে এনে তিতলি তাকে সদয় আহ্বান জানিয়েছে, বলেছে, আ-হা-রে আমার বাচ্চু ছতীয়া (ছত্রী), তুম ঠিক বলেছ, দুটো ডালিমের একটা তুমি খাবে অন্যটা খুঁটবে—তোমার গাঢ় ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত আমি তোমাকে ঘুম-পাড়ানী গান শোনাবো—এসো আমার আদরের খোকা এসো—

ঝটকা মেরে চলে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখা গেছে, ঘুরে

দাঁড়িয়ে বাবুয়া পাথরের মতো মুখ করে তাকে দেখেছে। তারপর সাগরেদদের কাছে ঘোষণা করেছে, সাত রোজের মধ্যে ওই মেয়ে তার ভোগের বিস্তোরায় আসবে···শুধু তার নয়, যে সঙ্গীদের সামনে এ-রকম দিমাগ দেখিয়ে অপমান করে গেল ওকে তাদেরও ভোগে আসতে হবে।

সাগরেদরা খুব ভাল করে জানে তাদের মাতব্বর কখনো ফাঁকা আওয়াজ করে না।

তারপর কি হল জানার জন্য শাওন ভার্মা নিজের অগোচরে সামনে ঝুঁকে আছে। টানা গলায় তোতারাম জানালো, এই ব্যাপারখানা যে-ভাবেই হোক ব্রিজমোহনের কানে উঠেছে। তিতলির সঙ্গে যে মেয়ে দুটো ছিল তারা তো ঘরে ফিরে আর মুখ বুঁজে বসে থাকেনি। এরপর কি ঘটতে পারে সেই দুশ্চিন্তায় ওদের এলাকায় সাড়া পড়ে যাওয়ারই কথা। তোতারামের ধারণা, ভয়ে সিঁটিয়ে তিতলির ফুফু হীরা মল্লাই ব্রিজ-মোহনকে জানিয়েছে—ওই ভয়ংকর ছেলেকে হীরা মল্লা ব্রিজমোহনের থেকে তিন গুণ বেশি ভয় করে।

···এরপরে যেটুকু নাটক তা তোতারামের সামনেই। ব্রিজমোহন ভাতিজাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ডেকে পাঠাবার কারণ বাবুয়ার কল্পনার মধ্যেও নেই। আদরের ভাতিজার নিজস্ব স্বাধীনতায় বা আমোদ ফুর্তিতে চাচা কখনো নাক গলায় না। কিন্তু প্রশ্ন শুনেই প্রথমে তাজ্জব তারপর পাংশু—মুখ।

—তিতলিকো তু কা কহল?

বাবুয়া হকচকিয়ে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছে। প্রশ্নটা সঠিক মাথায়ই এলো না যেন। চেয়ে আছে।

আবারও খুব চাপা আর খুব মোলায়েম গলা।—গয়ি কাল দুফরমে তিতলি যব নদীয়াঁসে গাগর-ভরি পানি লেইকে আহতারে, উনে কে তু কা কহা?

চাচার গলার এই স্বর আর এই চাউনি বাবুয়ার থেকে ভালো আর

কেউ জানে না। বড় বড় দু'চোখ দিয়ে এক ধরনের নীলচে আগুন ঠিকরোয়, আর এমন মোলায়েম কথাগুলো কানে গলানো-সিসের মতো ঢোকে। পৃথিবীতে ভয়ও বাবুয়া মাত্র এক জনকেই করে—এই চাচাকে। বাবুয়ার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে, কাকার চোখ থেকে চোখ সরাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তা-ও পারছে না।

ব্রিজমোহনের গলা একটুও চড়ল না, বরং আরো ধীর মোলায়েম। —এইসন বাত কভু না শুনত চাহি···তু এইসন শোচো ও ছেঁৗড়ী তোঁহার মা লাগি—সমঝল ?

বাবুয়া কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল।

—কা সমঝল ?

—মা লাগি···

—যা নিকাল হিয়াঁসে !

শাওনেরই যেন ফাঁড়া কাটল একটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল। বদমাশ আর ভয়ংকর ছেলেটার লুব্ধ রসিকতার জবাবে তিতলি তেমনি ছড়ার ঢঙেই যা বলেছিল মনে পড়তে কান লাল আবার। সাদা অর্থে নোংরা পাঁকের মতো, কিন্তু তার মধ্যে পদ্ম-কমল। কিন্তু ঘোর-প্যাঁচের ব্যাপার শাওনের মাথায় খুব ঢোকে না। গাঁয়ের যে প্রধান মাতব্বর মানুষটা ওই মেয়েকে এত স্নেহ করে, অছুত বলে ঘৃণা করে না, লম্পট ভাইপোর হাত থেকে মেয়েটাকে এ-ভাবে রক্ষা করেছে, তাকে মা বলিয়ে ছেড়েছে—সেই লোকের ওপর তিতলির এত রাগ কেন ? তাকে এত অবিশ্বাস কেন !

রতন কাপ-ডিশ তুলে নিয়ে গেছে খেয়াল করেনি। ঢ্যাঙা শরীরটা একটু বেঁকিয়ে সামনের লোক ছোট চোখের কোণ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে তা-ও না। তার কথা শুনে শাওন যেন এখান থেকে এখানেই ফিরল।

—আচ্ছা, দোস্ত, তিতলি তোমার কাছে এই ক্যাম্প অফিসে কেন এসেছিল···তার লোক নেবার জন্য ?

লোকটার প্রশ্নটা খুব সরল মনে হল না কেন যেন। সত্যি জবাবই

ছিল।—না, সেটা পরের ব্যাপার···এসেছিল ঠাকুর ব্রিজমোহনের সম্পর্কে আমাকে সাবধান করতে।

শুনেই তোতারামের ছোট চোখ-জোড়া কপালে।—আমার সম্পর্কেও তোমাকে কিছু বলেনি তো?

এই লোকের টানা-টানা দেশোয়ালি কথা বুঝতে শাওনের একটু বেশি মনোযোগ দিতে হয়। মনে কি আছে তা বুঝতেও। শাওন এবারেও গোপন করল না, কারণ ওই মেয়ে কোনো গোপনতার ধার ধারে না বলে দিনে-দুপুরে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। জবাব দিল, তোমার কথা বলেই তো আমাকে সাবধান করেছে, তুমি নাকি আমার জন্যে ঘাবড়ে গিয়ে তাকে বলেছ, পরদেশী বাবু সাচ্চা আদমী, তাই নিজের লাভের কথা না ভেবে ব্রিজমোহনের জমিন ফিরে পাবার আশা বরবাদ করে দিয়েছি···তার ফলে আমার কপালে কি আছে শিউজী জানে।

কথাগুলো বলার ফাঁকে লোকটার মুখ শাওন ভালো করেই নিরীক্ষণ করছিল। তার চোখে মুখে যে ভয়ের ভাব ফুটে উঠল তা কৃত্রিম কি স্বাভাবিক ঠিক বুঝে উঠল না। এক হাত কপালে, টানা-কথার সুরে ত্রাস। —হায় রাম! ও ছোঁড়ী আমাকে ভাতেও মারবে জানেও মারবে। লম্বা দু'হাত জোড় করে তার সামনে টেবিলের ওপর রাখল।—এ দোস্ত ই বাতিয়া ঠাকুর ব্রিজমোহনে তুম না কহি!

শাওন চেয়েই আছে।—সত্যি ভয়ের কিছু না থাকলে তুমি তিতলিকে ও-রকম বলতে গেলে কেন?

—ই তোতারামকা তোতাবুলি, ঠাকুর সাহাব নিমন আদমী বানি (ভালো লোক)—অব্ হম চলথ—

চেয়ার ঠেলে উঠে চলে গেল। শাওনের খটকাই লাগল একটু। লোকটা যত ভয় পাওয়ার আর ঘাবড়ে যাওয়ার ভাব দেখিয়ে গেল, শাওনের কেন যেন মনে হল না অতটাই ভয় পেয়েছে বা ঘাবড়েছে।

প্রায় একটা বছর ঘুরে এলো। এখানকার কাজ বেড়েছে খাটুনি বেড়েছে দায়িত্ব বেড়েছে। এতকাল শাওন ভার্মা নামে একটা ছেলে নীরস কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই অভ্যস্ত ছিল। তার মধ্যে আলো বাতাস রঙের খোঁজ কখনো পড়েনি। সেই একই কাজ এখন দ্বিগুণ হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, পরিশ্রম দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এমন রঙ আর রসের ছোঁয়া পেল কি করে, শাওন ভার্মা তা ভাবতে রাজি নয়। রাজি নয়, কারণ, তার একটা মন জানে, কেন। এই জানাটাকে বিশ্লেষণের আওতায় ফেললে সেটা একটা সুডৌল গোলাপকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখার মতো হয়। তাতে কেবল দেখাই হয়, সেই দেখার মধ্যে রূপ রস গন্ধ বিচ্ছিরিভাবে মার খায়।

…এই উনত্রিশ বছর বয়সে শাওন ভার্মা এক আলোবাতাস-শূন্য নিঃসঙ্গ একলার জীবনের গহ্বর থেকে উঠেছে। সেখানে এখন এত আলো এত বাতাস এত রূপ এত রং যে শাওন ভার্মা নামে ছেলেটা একটা বছরের মধ্যে একেবারে ভিন্ন মানুষ। কাজের ভারী চাপও হালকা পলকা শরতের মেঘের মতো মনে হয়। ওই চাপ সরে যেতে সময় লাগে না। তার পরেই ঝকঝকে নীল আকাশ।

…একটা বছরের টুকরো টুকরো স্মৃতি সাজিয়ে শাওন ভার্মা বড় লোভনীয় একখানা মালা গাঁথতে পারে। না, সে-চেষ্টা করে না। তবু সেই স্মৃতিগুলো আপনা থেকে একটা মালার আকার নিচ্ছে। শাওনের ওটা সম্পূর্ণ করার কোনো তাগিদ নেই। শাওনের বাস্তব মন জানে ওটা শেষ হবার নয়।…সে এম এ পাশ উঁচু বর্ণের সন্তান। ভালো চাকরী করে। কালে দিনে আরো অনেক বড় হবে, অনেক মর্যাদা বাড়বে।…এই জীবনে একটি অচ্ছুত মেয়ে এসেছে। এসেছে কি? শাওনের ভাবতে লাগছে এসেছে। এসে তাকে এক দম-বন্ধ একলার কবর থেকে

টেনে তুলেছে। এ-জগতের রূপ রস আলো রঙের সন্ধান দিয়েছে। অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে তুলে তাকে আলোর হদিস দিয়েছে। সুন্দরের ঠিকানা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু আর পাঁচ জনের বাস্তব চোখ কি দেখবে? শুধুই রূপ দেখবে, শুধুই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মোহ ভাববে। ···নিচু শ্রেণীর অবহেলিত মানুষদের জন্য ওই মেয়ের বুক-ভরা দরদের খবর কে জানবে। অছুত গরিব মেয়েদের প্রতি জাতের মানুষদের নির্লজ্জ আচরণে ওর বুকের ভেতরটা কতখানি পোড়ে তা কে বুঝবে? শুধু অছুত নয়, মানুষের জন্য এই মেয়ের কত দরদ, শাওন ভার্মা সেই নজিরও দেখেছে।

···ওই মেয়ের হাসি-খুশির আর এই সুরের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো শাওন মন থেকে ঠেলে সরাতে পারে না। সরাতে চায়ও না। ওগুলো থেকে-থেকে মনে আসে। কখনো বা একসঙ্গে ভিড় করে আসে।

···এখানকার কাজের চাপ যেমন বাড়ছে, তেমনি লোকও নেওয়া হচ্ছে এটা এই মেয়ে ঠিক লক্ষ্য করেছে আর করছে। নিজের গোষ্ঠীর লোক ঢোকাবার ব্যাপারে তার কোনো চক্ষু লজ্জা নেই। এই আর্জি নিয়ে সোজা ক্যাম্প অফিসে এসে হাজির হয়। সাদা-সাপটা কথা, ওরা না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও ওদের জন্য বলার কেউ নেই, সরকারের কাজ, সরকার টাকা দিচ্ছে, ওরা কাজ পাবে না কেন?

ছ'জন ছ'জন করে শাওন ওর আরো চারজন লোক নিয়েছে। কিন্তু তিতলি চাপ রাখতে ছাড়ে না। লোক নেওয়া হবে সে-খবর ঠিক আগে থেকে জেনে নিয়েই এসে চড়াও হয়। ওর সঙ্গে সাইটের কার আর ভাব নেই এখন। খবর ঠিক যোগাড় করে।···সেদিনও আবার এই আর্জি নিয়ে হাজির হতে শাওন তক্ষুনি রাজি হয়নি। বেশি লোক নেওয়া হলে ওর ছ একজন নিতে অসুবিধে নেই, কিন্তু তা না হলে কথা উঠতে পারে সেই জ্ঞান শাওনের আছে। বলেছে, কি ব্যাপার কত জন লোক নেওয়া হবে আমি আগে খোঁজ নিয়ে দেখি।

তিতলির সঙ্গে সঙ্গে জবাব, বিকেলের জন্য কম করে দশ বারো জন লোক নেওয়া হবে আমি জানি, সকালের লোকদের অনেকে বিকেলেও কাজ করতে চাইছে—তা হবে কেন?

ঠিক সেই সময় রতন এসে হু'জনের চা আর বিস্কুটের প্লেট রেখে গেছে। তাই দেখে তিতলি সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে ঘোষণা করেছে, আমি কি চা-বিস্কুট খেতে আসি তোমার কাছে? ওই গরিব জোয়ানদের না নিলে আমি কিচ্ছু খাব না। তুমি তো আর ব্রিজমোহন মহাদেও প্রসাদ বা জগদেও মিশিরের তাঁবের লোক নও—তোমার নিতে আপত্তি কি? ওরা কাজ করবে মজুরী নেবে, কাজ পছন্দ না হলে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে, ব্যস্—

শাওনের গম্ভীর-গম্ভীর মুখ।—এবারে ক'জন তোমার?

ভয় মেশানো গলায় জবাব এলো, চারজন···

শাওন হেসে ফেলেছিল, ঠিক আছে, চা খাও তোমার খবর ঠিক হলে চারজনই নেব—কিন্তু একজনও বেশি পাঠালে সকলে বাতিল হয়ে যাবে।

তিতলি তক্ষুনি হেসে ফেলে হু'হাত জোড় করে নিজের গালে ঠেকিয়েছে। মুখে নিখাদ স্তুতি, সাচ রহুয়া সাচ, তুম্ বহুত্ বড়া দিল্‌কা আদমী ভৈল।

এরপর যে যার ভাষায় কথা বলা নিয়েও সেদিন মন্দ ব্যাপার হয়নি। স্তুতির জবাবে শাওন, গম্ভীর মুখে ওদের ভাষা নকল করতে চেষ্টা করে বলেছিল, ইসিকে বাদ রহুয়াকা দিল্ অ্যায়সা খুশমদ্ করলৃঅ তো ফিন্ বড়া না হইল্।

যত ভুলই হোক, চালাক মেয়ে ও কি বলতে চায় ঠিক বুঝেছে। আর তক্ষুনি বাংলা চালাতে চেষ্টা করেছে।—কিনো বড়া না হব, বড়া দিল কুখনো ছোটা না হোয়—

শাওন হেসে হার স্বীকার করেছে, বলেছে, থাক আমিও আর তোমার ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করব না, তুমিও আর কোরো না—শুনেছি তুমি খুব ভালো গান করো, তুমি নিজেই বলেছিলে তোমার ফুফু তোমাকে খুব যত্ন করে তালিম দেয়, কিন্তু তোমার গান শোনা তো আমার বরাতে নেই —তোমার ভাষায় তোমার কথাই আমার গানের মতো মিঠা লাগে।

এ-মেয়ে চালাক যেমন দুষ্টুও তেমনি। হু'চোখের হাসি ছোঁয়া কালো

তারা তার মুখের ওপর, ঠোঁটেও টিপটিপ হাসি। নিজের ভাষায় ফিরে গিয়ে সবিনয়ে বলল, রহুয়া ফরমাশ করলে এক্ষুনি একটা গান শুনিয়ে দিতে পারি···শোনাবো ?

দুপুর সাড়ে তিনটেয় টেণ্ট অফিসে বসে গান শোনানোর প্রস্তাব। শাওন হেসে ফেলেছিল।

গম্ভীর থাকতে চেষ্টা করে তিতলি আবার বলেছে, তাহলে তোমার গান শোনার বরাত আমি ভালো করি কি করে···এখন গান করলে আর অন্য লোকের তা কানে গেলে সুনামের চোটে বড়া-সাহেবের নোকরি ছেড়ে পালাতে হবে, রহুয়ার এই ভয়টাই বড় হয়ে গেল !

ঠাট্টার সুরে শাওন বলেছিল, অফিস-টেণ্টে বসে তো আর গান হয় না, নেমন্তন্ন করলে তোমার ডেরায় গিয়ে গান শুনতে পারি···

তিতলির দু'চোখ বড় বড়।—নেওতা দিলে তুমি আমাদের ডেরায় যাবে ?

—কেন যাব না···ঠাকুর ব্রিজমোহন নেমন্তন্ন করলে তো যাই···।

আবারও খানিক চেয়ে থেকে তিতলি হঠাৎ জিগ্যেস করল, তুমি হীরা মল্লার নাম শুনেছ ?

ইতিমধ্যে তোতারামের তোতা-বুলিতে কান পেতে শাওন এই মেয়ের সম্পর্কে টুকটাক কিছু জেনেছে। আর এও লক্ষ্য করেছে, দু'দশ কথার পরেই তোতারাম এক আধবার তিতলির প্রসঙ্গ টেনে আনে। ওর গান বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করে ওর বাবার কথাও কিছু শুনেছে, ওর মায়ের যেমন রূপ ছিল তেমনি গানও করত শুনেছে, তিন সাড়ে তিন বছর বয়সে ওর সেই রূপ গুণের মা মারা যায় শুনে শাওনের একটু দুঃখই হয়েছিল। আর এখন কোথায় কি ভাবে থাকে তা-ও মোটামুটি জেনেছে।

—তোমার ফুফু তো··· ?

—হ্যাঁ। মাথা ঝাঁকিয়ে এক ঝলক হাসি। আমার গান শোনার নেওতা পেতে হলে আগে টাকা ঢেলে তোমাকে ওই ফুফুর প্রেমে পড়তে হবে—নাঃ, তা-ও পেরে উঠবে না—তোমার থেকে অনেক জোরদার লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসতে হাসতে চেয়ার ঠেলে উঠেছে, হাসতে হাসতেই চলে গেছে। কথাগুলো কেন যেন শাওনের খুব ভালো লাগেনি। হয়তো ওর ফুফু কোনো বড় লোকের ছেলেকে টাকার লোভে এই মেয়ের কাছাকাছি আনতে পেরেছে—আর এমন মেয়ের জন্য সেটা খুব শক্তও ভাবে না। কিন্তু গান শোনানোর নেমন্তন্নের জবাবে এ-ধরনের তরল রসিকতা কানে কি-রকম যেন লেগেছে।

···আর একটা দিনের স্মৃতি শাওনের মনে গেঁথে আছে। তার ক্রোধ, মান-ইজ্জত বোধ আর একই সঙ্গে তার আকুতি দেখে শাওন ভার্মা একটু বিহ্বলই হয়ে গেছল। দুপুরের চায়ের পর্ব খানিক আগেই শেষ হয়েছে, আর খানিক বাদেই সাইটে বেরুবে।

—হম্ আয়ি পরদেশী বাবু?

ভিতরে আসার পর্দা একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে তিতলি। সুন্দর—মুখখানা শুধু নয়, গলার স্বরও একটু গম্ভীর মনে হল।

তবু খুশি হয়েই শাওন এক পা এগিয়ে এসে বলল, সাইটে যাব ভাবছিলাম, চলো যাওয়া যাক—

—তোমার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে বাবুসাব, সাইটে ও-সব কথা হবে না, আমাদের একটু সময় দাও।

একটু অবাক হয়েই শাওন পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকালো। তিতলির পিছনে আর একটি অল্পবয়সী বউ। তিতলির দিকে একটু থমকে তাকিয়ে ডাকল, আচ্ছা এসো—

তিতলি ঘুরে দাঁড়ালো।—আহ মাধ্বী—

জড়সড় বউটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। শাওন নিজের চেয়ার নিয়ে ওদের বলল, বোসো—

তিতলি টেবিলের উল্টো দিকের একটা চেয়ারে বসে সঙ্গিনীকে হুকুম করল, তু না বইঠল, জরাসে ঠায়ের যা—

গনগনে মুখে শাওনের দিকে ফিরল, ওর নাম মাধ্বী, আমার পড়শীন, ওকে তুমি একবার ভালো করে দেখে নাও পরদেশী বাবু—

দেখতে গিয়ে শাওনের হু'চোখ একটু হোঁচট খেল।···

মাথায় খাটো ঘোমটা, পরনে খাটো শাড়ি, গায়ের আঁট পেওনা আর ওই অপরিমিত বসন না-কালো না-ফর্সা বউটার পরিপুষ্ট যৌবন ধরে রাখতে পারছে না।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি শাওন তিতলির দিকে ফেরালো।

—দিনের বেলায় দশজন মরদের সামনে কেউ যদি দু'বালতি জল ঢেলে ওকে চান করিয়ে দেয় তাহলে ওর অবস্থাখানা কি রকম হয়?

দৃশ্যটা ভাবতে গিয়েও শাওনের কান গরম। জিগ্যেস করল, কি হয়েছে?

জবাব দেবার আগে পাশের চেয়ার দেখিয়ে বউটাকে বলল, অগর বইঠ্ মাধ্‌বী।

সে সসংকোচে চেয়ারে বসতে তিতলি শাওনের দিকে ফিরল।—কাল রাতে আমাদের এলাকার মরদদের নিয়ে একটা 'মিটিন্' হয়ে গেছে, মরদদের মধ্যে যারা তোমার খনিয়ার কাজ করে 'মিটিনে' তারাও ছিল—ঠিক হয়েছে আমি তোমার কাছে আরজি নিয়ে আসব—এখানে উঁচা জাতের নেক নজরের লোকের হাতে আমাদের ছৌঁড়ী আর বহুরা আগেও এ-রকম বে-ইজ্জত হয়েছে ··কিন্তু এর বিহিত করার মতো দিলের লোক আগে এ গাঁওয়ে ছিল না, আমরা তোমার কাছে ভিখ মাঙতে এসেছি—

এটুকু শুনেই শাওন নার্ভাস একটু। তার ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিত গ্রামীণ গোলযোগে মাথা গলাতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু এই মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কাপুরুষ হতেও লজ্জা করে।—কি হয়েছে তাই বলো···।

শুনল কি হয়েছে। এখানকার উঁচু জাতের দাক্ষিণ্যে গাঁয়ের অচ্ছুতদের খাওয়ার জল পাওয়ার যে ব্যবস্থা, সেখান থেকে এই মাধবী ঘড়া নিয়ে জল আনতে গেছল। বাঁধানো ভালো 'কুঁয়া' থেকেই ওদের জল দেওয়া হয়, আর ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে 'কুঁয়া' থেকে সেই জল তুলে ঢেলে দেয় ওই উঁচা জাতের পেটোয়া লোকেরা। অন্য দিনের মতো গত কালও এই মাধবী বয়স্কা মেয়ে বউদের সঙ্গে জল আনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্র ঘরের কিছু মরদ ছেলে সেখানে তখন জটলা করবেই। ওদের ইশারায় জল

দেওয়ার পেটোয়া লোক অনেক রকমের অসভ্যতা করে। জল দেবার আগে অল্পবয়সী মেয়েদের মুখে বুকে গায়ে জল ছিটিয়ে তাদের শুদ্ধ করে নেয়। কাল সেই লোক ওই অসভ্য জোয়ান ক'টার ইশারায় দু'বালতি জল তুলে মাধবীর মাথায় ঢেলে দিয়ে ওকে শুদ্ধ করে নিয়ে তারপর ঘড়ায় জল দিল। আর চোখ দিয়ে গিলে গিলে ওই ইতর ছেলেগুলো আনন্দ করতে লাগল। মাধবী কাল কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরেছে।

হঠাৎ রাগ হলে বা গোঁ চাপলে শাওন ভার্মা অন্য প্রকৃতির মানুষ। সে তখন অনেক কিছুই করতে পারে। এই অত্যাচারের কথা শুনে সেই মেজাজ। কিন্তু এ ব্যাপারে সে কি করতে পারে, তার কি করার আছে?

কি করতে পারে সেটা এরপর তিতলিই ব্যক্ত করল। জানালো পরদেশী বাবু চাইলে তাদের এ-রকম অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাদের জানেও বাঁচাতে পারে। তার হাতে হাতে মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম, ইঁট সিমেন্ট চুন সুরকি লোহালক্কড়ের কারবারী গণপত লালা নিজের স্বার্থেই এখন পরদেশী বাবুর হাতের লোক—সরকারের খনির কাছে সে-ই সব সাপ্লাই দিচ্ছে আর এখানকার যে অছুতরা খনির কাজে লেগেছে তারা বিনা মজুরীতে রাতভোর খেটে দিতেও রাজি আছে—এখন পরদেশী বাবু যদি ওদের এলাকায় খুব গভীর একটা পাকা বাঁধানো 'কুঁয়া' করে দেয় তাহলে এ-রকম বে-ইজ্জতির হাত থেকে তারা বাঁচে।...গহেরা (গভীর) টিপকল করতে অনেক খরচ তারা জানে, কিন্তু ভালো বাঁধানো একটা গহেরা কুঁয়া করে দেওয়া পরদেশী বাবুর পক্ষে কঠিন কাজ কিছু না। তাদের এলাকার অছুতরা সকলেই গরিব, তবু আট আনা এক-টাকা দু'টাকা তুলে পরদেশী বাবুর হাতে দেবে, তাদের যে মজদুর খনিয়ার করছে, তাদের মজুরী থেকে টাকা বাঁচিয়ে গণপত লালার ইঁট সিমেন্ট বালির দামও আস্তে আস্তে শোধ করে দেবে।...তার কাছ থেকেই মাল নিয়ে সরকারের টাকায় তাদের এলাকায় দুটো টিপ-কল আর দুটো কুঁয়া করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চের মাতব্বরেরা যেমন চেয়েছে তেমনি হয়েছিল, সরকারের দেওয়া অর্ধেকের বেশি টাকা তাদের পকেটে গেছে, তিন মাস না যেতে টিপ-কল খারাপ হয়ে গেছে, জল যা উঠত তা-

ও যেমন ঘোলা তেমনি নোঙরা। আর কুয়ো দুটোও ছ'মাস না যেতে শুকিয়ে কাট। এই রকম করেই গাঁয়ের জাতের মাতব্বরেরা অচ্ছুত গরিবদের পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখে—একটু জলের জন্যেও তাদের কাছে গিয়ে ধন্না দিতেই হয়।

শাওন শুনছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।...অনেক ধারা আছে রাগ সংগীতের। বিন্যাস রাগ অভিমান আকুতি সবই আছে। ওর ভাষার এতগুলো কথা আর বিস্তারের মধ্যেও যেন সেই রস—রাগ অভিমান আকুতি। শোনার পর স্বস্তি বোধ করছে একটু।...মেশিন যন্ত্রপাতি সবই আছে, ওদের মরদেরা রাতের অবসরে বেগার খেটে দিলে ওর পক্ষে ভালো একটা কুয়ো করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ না, বড়-রকমের একটা খরচের ব্যাপারও না। হাজার এগারোশ' টাকার মধ্যেই হয়ে যেতে পারে। ওই মেহনতী মানুষদের কাছে তা-ও অবশ্য নাগালের বাইরে বড় অঙ্কের টাকা। শাওন মনে মনে একটু হিসেব করে নিচ্ছিল।

তিতলির মুখখানা আস্তে আস্তে যেন বিষাদে ছেয়ে গেল। বলল, পরদেশী বাবু ভালো একটা 'কুঁয়া' হলে আমাদের এলাকার মেয়েদের ইজ্জত শুধু বাঁচবে না, আমাদের অনেক বিপদও কেটে যাবে।...সমাজের বড় মানুষদের হুজ্জোতির জন্য আমাদের অনেকে ডোবা থেকে আর পুনপু থেকে জল আনে আর সেই জল খায়ও। সরকারের আদমীরা ফি বার ঢ্যাড়া দিয়ে যায়, পুকুর আর পুনপুর জলে সব কাজ কোরো কিন্তু খেয়ো না—খরুয়া আর বরষাত্‌ন পুনপুর জল খারাপ হয়ে যায়, তবু অনেকে বাধ্য হয়ে তাই খায়...এই জল খেয়ে কলেরায় অসময়ে আমার মৌসী মারা গেছে, সেই মৌসী আমাকে কত ভালবাসত তুমি জানো না পরদেশী বাবু, সে থাকলে আমার জিন্দিগি অন্যরকম হয়ে যেত ··

সমাজের উঁচু মানুষদের ওপর এদের অভিযোগ। সেই অভিযোগের চাবুক শাওন ভার্মার মুখেও এসে লাগছে। বলল, আচ্ছা, তোমরা যাও, দেখি আমি কি করতে পারি···

আশায় মেয়ে-বউ দু'জনেরই মুখের রং বদলাচ্ছে। তিতলি জিগ্যেস করল, আমি চান্দা তুলতে লেগে যাব?

—তোমাকে এখন কিচ্ছু করতে হবে না, তুমি কেবল তোমাদের মরদদের কাজে নামার জন্য তৈরি থাকতে বোলো।

এর কিছু দিনের মধ্যে অছুত্ পাড়ায় উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। সারভেয়ার এনে আর ওদের সুবিধে অসুবিধে বুঝে কুয়োর জায়গা ঠিক হয়েছে।···পাড়ার মধ্যে গভীর বাঁধানো 'কুঁয়া' হবে, ছেলে বুড়ো জোয়ান সকলেরই উৎসাহ। রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু হয়েছে। সাইটের ট্রাকে সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি এসেছে। সকালের দিন-মজুর আর অন্য জোয়ানেরা মাঝ রাত্রি পর্যন্ত কাজ করে। অনেক রাত পর্যন্ত শাওন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে, তার মেকানিকরাও সাহায্য করে। এরপর গণপত লালার গুদাম থেকে ইঁট বালি সুরকি সিমেণ্ট আর শেষে কাঠ এসেছে।···তারপর দেখতে দেখতে এত গভীর আর এত সুন্দর করে বাঁধানো এ-কুঁয়া কেবল তাদেরই, কেবল তাদের জন্যেই এ যেন দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

সকলের থেকে আনন্দে আটখানা তিতলি। শাওনের মনে হয়েছে আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় এ-মেয়ের চোখে না জল এসে যায়। সেদিন সাইটে এসে বলছিল, বাবুসাহেব, ওরা সাহস পায় না, কিন্তু মনে মনে সকলে তোমার পা ছুঁয়ে গড় করছে। শাওন ঠাট্টার লোভ সামলাতে পারল না। হেসে জিগ্যেস করল, আর তুমি মনে মনে কি করছ?

ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, চোখে দুষ্টু হাসি।—আমি মনে মনে ভাবছি তোমার বহুর দেখা পেলে তার পা জড়িয়ে ধরে বলতাম আমাকে তার বাঁদী করে রাখতে।

এরপরে যে রসিকতা মনে এসেছিল শাওন মুখে আর তা প্রকাশ করতে পারছিল না। বলতে ইচ্ছে করছিল, তাঁর মতো বাঁদী রাখাটা বউ কি নিরাপদ ভাবত?

এর পরেই কি মনে হতে তিতলির চোখে মুখে একটু আশংকার ছায়া। —তুমি সরকারের টাকায় এমন 'কুঁয়া' করে দিলে তোমার বদনাম হবে না তো বাবুসাহেব?

শাওন হেসেই ফিরে প্রশ্ন করল, সরকারের টাকায় কুয়ো হল এ তোমাকে কে বলল ?

তিতলির দু'চোখ বড়বড়।—তাহলে কার টাকায় হল।···এতো টাকা তুমি নিজে খরচ করলে ?

শাওনের বিড়ম্বনা সামলে ওঠার চেষ্টা।—তোমাদের লোকেরা বিনে পয়সায় খেটেছে তা ছাড়া সরকারের ব্যবস্থার জোর পিছনে যে-ভাবে হোক ছিলই···খুব বেশি কিছু খরচ হয়নি—সব-কিছু সরকারি রেট্-এই পাওয়া গেছে।

তার পরেও তিতলি যে-রকম করে চেয়েছিল, ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শাওন সাইটের অন্য দিকে চলে গেছে। ভিতরটা তারও খুশিতে ভরপুর।

স্মৃতির সঞ্চয়ে আরো কিছু জমা আছে। শাওন ভার্মা মাল্য না গাঁথুক, মনের সেতুপথে তার সৌরভ ছড়িয়েই আছে। এমন যোগাযোগের পিছনে অদৃশ্য কারো নিপুণ হাত আছে কিনা জানে না।

···শাওন ভার্মা দিন দুই একটু ব্যস্ত ছিল। সাইটের কোন্ কাজ কতটা এগুলো নিজে ঘুরে ঘুরে ফাইলের নোটের সঙ্গে মেলাচ্ছিল। আগামী কাল সকালে এই ফাইল আর নোট নিয়ে জিপে করে পাটনা যেতে হবে। রিজিওন্যাল অফিসার প্রকাশ দীক্ষিত চিঠি পাঠিয়েছেন, এবারে তিনি ইনসপেকশনে আসতে পারছেন না, কলকাতার হেড-অফিস থেকে লোক এসেছে (ইস্টার্ন জোনের হেড অফিস কলকাতায়)। ছুপার খনির কাজের কতটা কি হয়েছে তার লেটেস্ট রিপোর্ট তাদের জানাতে হবে। অতএব শাওনই যেন সে-সব নিয়ে যত শিগগীর সম্ভব পাটনায় চলে আসে।

ফাইল আর রিপোর্টের কাজ মোটামুটি শেষ। শাওন ঠিক করেছে আগামী কাল সকালে জিপ নিয়ে পাটনা চলে যাবে, তাহলে সন্ধ্যা বা রাতের মধ্যে হয়তো ফেরা সম্ভব হবে।

হঠাৎ দেখে তিতলি প্রায় ছুটেই তার দিকে আসছে। তার পিছনে আর একটি মেয়ে। আরো কাছে আসতে তাকেও চিনল। জনার্দন পূজারীর বড় মেয়ে সীতা—সীতিয়া। হনহন করে হেঁটেও সে তিতলির

থেকে পনেরো বিশ গজ পিছিয়ে আছে। আরো এগোতে মনে হল কিছু একটা বিপদ ঘটেছে, দু'জনেরই চোখে মুখে উদ্‌বেগের ছায়া।

এসেই বড় একটা দম নিয়ে তিতলি বলল, পরদেশী বাবু, কিরপা করে তোমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে, নইলে আমার সহেলী সীতিয়ার বহন লছমী বোধহয়—মরেই যাবে, যন্ত্রণায় সে পাগলের মতো ছটফট করছে—

এটুকু বলার ফাঁকে তার পাশে সীতা এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে বিবর্ণ মুখ, কিছু বলতে না পেরে ভিক্ষে চাওয়ার মতো করে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ালো।

শাওনও উতলা।—কেন, লছমীর কি হয়েছে?

—পিন্‌ডিসিটিস্‌—ডাগদার পবন্‌ শ্রীবাস্তব এসে দেখে বলেছে খুব শিগগীর বড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপ্‌রশন্‌ না করলে বহুত—বহুত বিপদ হবে—'পিন্‌ডিসিটস ফাট যাইব'।

শাওন প্রথমে কিছু বুঝলই না লছমীর কি হয়েছে। চার-পাঁচটা গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র মেডিক্যাল স্কুল-পাস অল্প বয়সী ডাক্তার পবন শ্রীবাস্তবের নাম শাওন শুনেছে। সাইকেলে গ্রামের পর গ্রাম চষে সে চিকিৎসা করে।

—কি হয়েছে ডাক্তার কিছু লিখে দেয়নি?

তিতলি সীতার দিকে তাকালো।—ও কাগজ কাঁহা?

সীতার দুই ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। তখনো হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল। শশব্যস্তে কোমরে গোঁজা একটা দুমড়োনো কাগজ বার। করল।

শাওন ভাঁজ খুলে পড়ে দেখল, ইংরেজিতে লেখা, অ্যাকিউট অ্যাপেনডিসাইটিস সন্দেহ। সত্বর বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

বড় হাসপাতালে বলতে পাটনা। জিপে বা মোটরে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ।

—ডাক্তার ব্যথা কমার কোনো ওষুধ দিয়ে যায়নি?

তিতলি জানালো, একটা বড়ি গুঁড়ো করে খাইয়ে দিয়ে গেছে, আর

একটা বড়ি রেখে গেছে, ফিন্ দর্দ উঠলে ওটাও খাওয়াতে হবে, আর বলেছে বঁড়া হাসপাতালে না নিয়ে গেলে সে আর কিছু করতে পারবে না।

—লছমীর বাবা কি করছে ?

তিতলির রাগত জবাব, মহাবীরজীকা চন্নামিত্ খিলাইকে জনয়ু (পৈতে) জপ্ করতারে—বাবু সাব তুমি জলদি বড় হাসপাতালে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করো, মেয়েটা যে মরে যাচ্ছে !

শাওন ভেবে নিল একটু। বলল, বড় হাসপাতাল তো পাটনায়, সেখানে তোমাদের জানা-শোনা কেউ আছে ?

এবারে সীতা জানালো, সেখানে তার এক কাকা আছে, তার পতাও বাপুর কাছে লেখা আছে।

শাওন মন স্থির করে ফেলল। সকাল তখন ন'টা, না গেলেই নয় যখন, কাল না গিয়ে আজই যাবে।…জনার্দন পূজারীর ডেরা ঠিক চেনা না থাকলেও কোথায় তা জানে। বলল, ঠিক আছে, তোমরা রেডি হও, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে জিপ্ নিয়ে যাচ্ছি।

সীতার মুখে কৃতজ্ঞতা উছলে উঠল। ওরা দু'জনে আবার ছুটল।

…এক ঘণ্টারও আগে শাওন ভার্মা জনার্দন পূজারীর ডেরায় এসে বেশ একটা দৃশ্য দেখল। মা আর মেয়ের সঙ্গে জনার্দন পূজারীর তর্ক চলছে, জনার্দন পূজারী তাদের বোঝাতে চাইছে মহাবীরজিউ আর শিউজীর কির্পা থাকলে লছমী চরণামৃত খেয়েই ভালো হয়ে যাবে, কিরপা না থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না। ক্রুদ্ধ সীতা চিংকার করে বলছে, মহাবীরজিউ আর শিউজীর কিরপার জন্যে বসে না থেকে সে তাহলে লছ্মীকে মশানে নিয়ে যাবার ভালো টিকটির (খাটিয়ার) ব্যবস্থা করুক। সীতা চিংকার করে বলছে, লছমীর কিছু হয়ে গেলে সে মহাবীরজীর মন্দিরে আগ্ লাগিয়ে ছাড়বে। আর দাওয়ার এক-ধারে দাঁড়িয়ে তিতলি রক্তবর্ণ মুখ করে এক-একবার জনার্দন পূজারীকে ভেঙ্চি কাটছে আর চিংকার করে বলছে, সময় নষ্ট না করে তোমরা তৈরি হও, পরদেশী বাবুর জিপ্ আসা মাত্র আমরা লছমীকে নিয়ে রওনা হব।

ফিরে তাকিয়ে শাওনকে দেখা মাত্র ফুঁসে ওঠার মতো করে তিতলি

বলল, লছমী জীপমে উঠাওয়া!

শাওন জুতো পায়েই সোজা দাওয়ায় উঠে ঘরের সামনে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে সীতাকে বলল, ডাক্তারের কাগজটা দাও। সেটা হাতে নিয়ে জনার্দন পূজারীকে বলল, ডাক্তার লিখেছে, বড় হাসপাতালে না নিয়ে গেলে লছমী যে-কোনো মুহূর্তে অ্যাপেনডিক্স বারস্ট্ করে মারা যেতে পারে, হাসপাতালে নিয়ে না যেতে দিলে যদি এই দুর্ঘটনা হয় তাহলে শাওন ভার্মা নিজেই জনার্দন পূজারীর বিরুদ্ধে মেয়েকে খুন করার মামলা আনবে।

এরপর আধঘণ্টার মধ্যে লছমীকে জিপের পিছনের মেঝেতে শুইয়ে জনার্দন পূজারীর বউ ভাবনা মেয়ে সীতা আর তিতলিকে নিয়ে শাওন বেরুতে পেরেছে।

…লছমীর অবস্থা দেখে তক্ষুনি তাকে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন হয়ে গেছে। সার্জন জানিয়েছে আরো দু'ঘণ্টা দেরি হলে লাম্প্ বারস্ট্ করত, আর পেশেণ্টকে বাঁচানো যেত না। এখন নিশ্চিন্ত, আর কোনো ভয় নেই।

কিন্তু অন্য দিক থেকে একটা সমস্যা দেখা দিল যার জন্য শাওন নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। বিকেলের দিকে সকলকে নিয়ে সে সীতার কাকার বাড়িতে রেখে আসতে চাইলো। কিন্তু বিড়ম্বনার মধ্যে পরে মা-মেয়ে দু'জনেই বলল, আজকের রাতটা তারা তিনজনে হাসপাতালে কোথাও পড়ে থাকবে, আর দোকান থেকে যা-হোক কিছু খেয়ে নেবে।

কিন্তু তিতলি মাথা ঝাঁকিয়ে জোরালো আপত্তি জানালো। সে বলল, এই রাতটা সে একলাই হাসপাতালের কোথাও কাটিয়ে দিতে পারবে, লছমী ভালো থাকলে কাল সে চুপায় ফিরে যাবে, তারা মা-মেয়ে পরদেশী বাবুর জিপে সীতার চাচার বাড়ি চলে যাক—

শাওন এবারে ওদের সমস্যাটা বুঝল। তিতলি অছুত্, আর ওই চাচা হল গিয়ে জনার্দন পূজারীর ভাই, সেখানে অছুত মেয়ের জায়গা হয় কি করে? শাওন সত্যিই চিন্তায় পড়ল। এ-বয়সের আর এই রূপের একটা মেয়ে একলা হাসপাতালে পড়ে থাকবে তা হতেই পারে না। তিতলির

চোখে চোখ পড়তে মনে হল সে যেন একটা সহজ ফয়েসলার আশাতেই তার দিকে চেয়ে আছে।

শাওন সীতা আর তার মায়ের কথায় সায় দিল। তিতলির এখানে একলা থাকা চলে না। ওদের অপেক্ষা করতে বলে সে আবার বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে তাদের ওই ওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট ওয়েটিংরুমে নিয়ে এলো। সেখানে সারি সারি চওড়া বেঞ্চ পাতা। জানালো, এই রাতটা তারা তিন জনেই এখানে থাকবে, পরদিন বিকেলের মধ্যে শাওন এসে মা-মেয়েকে ওই চাচার বাড়ি রেখে তিতলিকে নিয়ে ছুপায় ফিরে যাবে। লছমীর ছাড়া পেতে আরো সাত আট দিন। ওদের তিনজনের এই রাতটা এখানে থাকার ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে।

এর থেকে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে। সীতা আর তার মা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তিতলি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, ওদের ছু'জনের এখানে থাকার দরকার নেই, রাতে আমি একলাই এ-ঘরে থাকতে পারব!

বাকি তিন জনের কেউ ওর আপত্তি বা রাগের কারণ বুঝল না। সীতার বোনকে নিয়ে ছুশ্চিন্তা গেছে। অনুচ্চ ধমকের সুরে তিতলিকে বলল, তোকে একলা দেখে আর কেউ এসে জুটলে তখন কি করবি?

তিতলি অবুঝ মেয়ের মতোই তেমনি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, জুটবে জুটবে—পরদেশী বাবুর তা নিয়ে অত মাথা ব্যথা কেন?

হঠাৎ এই মেয়ের এমন মেজাজ কেন না বুঝলেও তার কথায় কেউ কান দিল না। সমস্ত দিন ওদের খাওয়া হয়নি। দোকানে নিয়ে গিয়ে শাওন ওদের ভালো করে খাওয়ালো। রাতের খাবারও সঙ্গে নিয়ে সকলকে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে রেখে গেল। সীতা আর তার মায়ের পরদেশী বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই। তিতলি শুধু গম্ভীর। শাওন লক্ষ্য করেছে ও ভালো করে খায়ও নি। ওদের জানিয়ে গেল, পরদিন বিকেলের আগে সে আর আসতে পারছে না—সকাল বা ছুপুরে বেরিয়ে তারা নিজেরাই যেন খেয়ে নেয়।

বেলা আড়াইটে-তিনটের মধ্যে শাওনের অফিসের কাজ শেষ।

একদিন আগে কেন তাকে পাটনায় আসতে হয়েছে ওপরতলা প্রকাশ দীক্ষিতকে বলেছে। বলার কারণ হঠাৎ যদি দরকার পড়ে যায়, সীতা আর তার মা সারকে এসে খবর দেবে তবে সে-রকম দরকার কিছু হবার কথা নয়।

সাড়ে তিনটের পর শাওন হাসপাতালে এলো। শুনল লছমী বেশ ভালোই আছে। তাদের সঙ্গে কথাও বলেছে। শাওন তবু সীতার হাতে প্রকাশ দীক্ষিতের ঠিকানা আর ফোন নম্বর রেখে যা বলার বলে রাখল। ফোন কাকে বলে এদের কারো ধারণা নেই, কিন্তু তেমন প্রয়োজনে হাসপাতালের কাউকে বললে তারাই খবর দেবার ব্যবস্থা করবে। তিতলি গম্ভীর মুখে টিপ্পনী কাটল, দেখ, আপন জাঁতোকা ছোঁড়ীকে লিয়ে পরদেশী বাবুকা কইথন চিন্তা হইলন।

কাল থেকেই এই মেয়ের মেজাজ অন্য রকম কেন শাওন বুঝল না। ওদের তিন জনকে জিপে তুলে সীতার চাচার বাড়ির দিকে চলল। শাওন সামনে ড্রাইভারের পাশে ওরা পিছনে।

একটু খোঁজাখুঁজির পর চাচার ডেরার হদিস মিলল। চাচা ঘরে নেই, চাচী নাকি বাতে অথর্ব। একটু বাদে মা মেয়ে ওদের বিদায় দেবার জন্য ফিরে এলো। এখনো ওদের চোখে কৃতজ্ঞতা উপছে উঠেছে, মুখে ভাষা নেই।

শাওন এবারে সামনে ড্রাইভারের পাশে না গিয়ে পিছনে উঠে তিতলির মুখোমুখি বসল। জিপ ছাড়ার এক মিনিটের মধ্যে তিতলি বলল, সামনের গদিতে না বসে কষ্ট করে আবার পিছনে আসা হল কেন···

শাওন হেসেই জিগ্যেস করল, তোমার অসুবিধে হল?

—নিদকে খাতির কহলী। একটু থেমে বক্রসুরে জানান দিল, রাতে ঘুম হয়নি, ভাবছিলাম একটু ঘুমুব···।

যে কারণেই হোক, ভাবনাটা আদৌ যথার্থ মনে হল না শাওনের। চলতি জিপেই সামনে যাবার জন্য একটু উঠে ড্রাইভারের দিকের ক্যামবিসের পর্দা সরালো।

—ক্যা করত?

—তুমি ঘুমোও, আমি সামনে চলে যাই।

তিতলির মুখ রাগে লাল, আমার সামনে বসে যাবার লোভে এখানে উঠে বসেছ এখন আর যাবে কেন?

আর কেউ এমন কথা বললে শাওনের কান গরম হত। আর যা বলেছে তা একেবারে মিথ্যে নয় বলেই মনে মনে নিজেকে চাবকে উঠে সামনে চলে যেত। কিন্তু তিতলি বলেই পারা গেল না, মনে হল এ-রকম মেজাজ খারাপ করার কিছু কারণ আছে। একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করল, লছমী প্রাণে বেঁচে গেল, তার এত ভালো অপারেশন হল, কিন্তু তারপর থেকে হঠাৎ তোমার কি হল বলো তো? কথায় কথায় রেগে যাচ্ছ ··কি ব্যাপার?

তেমনি ঝাঁঝালো জবাব, আমি রেগে গেলে তোমার কি? আমার রাগ পছন্দ না হলে জিপ থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দাও।

শাওন আরো অবাক। তবু হালকা সুরেই বলল, এত রেগে আছ যে সত্তর কিলোমিটার পথ হেঁটে যাবে?

—যে-করে হোক যাব, তার আগে তোমার এখানকার ডেরা খুঁজে বার করে তোমার বন্ধুকে বলে যাব, ছুপায়ে তুমি এই অচ্ছুত মেয়েকে তাঁবুয়ার ঘরের চেয়ারে বসতে দাও, তোমার কাপ-ডিশে চা খেতে দাও—কিন্তু এখানে বন্ধুর কাছে এলে তুমি সাচ্চা উঁচা জাতের মানুষ!

শাওন হাঁ হয়ে গিয়ে তপ্ত কথাগুলো শুনল। ওর রাগের কারণটা এবারে যেন স্পষ্ট হয়ে আসছে।···গহেরা কুয়ো করে দেবার পর এই মেয়ে হেসে বলেছিল, তোমার বন্ধুর দেখা পেলে পা জড়িয়ে ধরে বলতাম আমাকে তাঁর বাঁদী করে রাখতে। এখন বুঝছে ও ধরে নিয়েছে তার বউ এই পাটনাতে। ধরে নিয়েছে ওকে নিয়ে সীতা বা তার মায়ের যে সমস্যা তার সঙ্গে পরদেশী বাবুর সমস্যার কোনো তফাৎ নেই।···অচ্ছুত বলে সীতার চাচার বাড়িতে একটা রাতের জন্য ওর ঠাঁই হল না, আর অচ্ছুত বলেই পরদেশী বাবু ওকে বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে পারল না, একটা রাতের জন্য ডেরাতেও ওর ঠাঁই হল না, আর ছুপায় এসে সে কিনা জাত-পাত মানে না বলে উদারতা দেখায়!

…হ্যাঁ এ ছাড়া এমন রাগের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

শাওন গম্ভীর মুখে প্রস্তাব দিল, গহলে ড্রাইভারকে জিপটা ঘোরাতে বলি, আমার এখানকার ডেরা তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাক ?

—কাহে ?

—কারা থাকে, তুমি নিজের চোখে দেখে যাও—কাল রাতে তোমার সেখানে থাকার ব্যবস্থা করলে তারা অবশ্য খুশিই হত।

তিতলি হকচকিয়ে গেল একটু। প্রশ্ন, কারা থাকে ?

—চারজন জোয়ান মরদ এখানকার অফিসের দোস্ত।

তিতলির চোখে নিখাদ বিস্ময়।—পাটনায় তোমায় ঘর শুনেছিলাম, তোমার বহু এখানে থাকে না ?

শাওন তেমনি গম্ভীর মাথা নাড়ল। থাকে না।

—তাহলে কোথায় থাকে…কলকত্তা ?

আবার মাথা নাড়ল। কলকাতাও থাকে না।

তিতলির এবার অসহিষ্ণু প্রশ্ন।—তাহলে তোমার বহু কোথায় থাকে বলছ না কেন ?

—কোথায় থাকে বা কোথাও আছে কিনা না জানলে কি করে বলব ?

সুন্দর মুখে বিস্ময়ের এই কারুকার্য উপভোগ করার মতোই। বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। দু'চোখে ভেতর দেখার চেষ্টা।—এ পরদেশীবাবু, তুম ঝুঁট্ না কহ !

শাওন এবার হেসেই জবাব দিল, তোমার কি পরোয়া করি যে ঝুট্ বলতে যাব ?

তিতলি হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপরেই রাগ।—হাম বহুত—বহুত খারাব ছেঁাড়ী। তোমার ওপর রাগ করে কাল ভালো করে খেলাম না, ঘুমোলামও না !

শাওন দু'চোখ ভরে এই খারাপ মেয়েকে দেখছে আর হাসছে।

এত লিখি-পড়ি জানা লোক, এমন বড় চাকরি করে, সে এই বয়সেও বিয়ে করেনি এ-ও যেন এই মেয়ের চোখে আর এক বিস্ময়। কেন বিয়ে

করেনি জিগ্যেস করেই বসল।

শাওন একটু মজার রাস্তায় এগোলো। জবাব দিল, কলেজে পড়তে মা মারা যাবার পর বাবা বিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমারও তখন বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছিল···ভাবলাম কলেজের পড়া শেষ করে বিয়ে করব। ···কিন্তু বাবা তার আগে নিজেই বিয়ে করে বসল, তখন আমারও বিয়ে করার ইচ্ছেটা চলে গেল।

যে-ভাবে বলল, তিতলি হেসে ফেলেছিল। কিন্তু শুনে এই লোকের জন্য মনে মনে একটু দুঃখই হল। জিগ্যেস করল, তোমার মায়েরও কি ছোট বেলায় দেহান্ত হয়েছে?

—খুব ছোট বেলায় নয়, আমার তেরো বছর বয়সে। সমবেদনার সুরে বলল, আমি তো তবু আমার মাকে অনেক দিন পেয়েছি—তোমার তো সাড়ে তিন বছর বয়সে মা মারা গেছেন শুনেছি।

তিতলি উৎসুক একটু।—কোথায় শুনলে?

—তোতারাম বলছিল।···তোমার মা দেখতে যেমন সুন্দর ছিলেন, তেমনি ভালো গাইতেন···তুমি তোমার মায়ের রূপ-গুণ পেয়েছ—এমন মা এত অল্প বয়সে মারা গেলেন খুব দুঃখের কথা···খুব কঠিন কিছু অসুখ করেছিল বুঝি?

তিতলির মিষ্টি মুখ হঠাৎ কি-রকম খরখরে হয়ে উঠল।—তোতা চাচা সাচ বলেনি, আমার সাড়ে তিন বরষমে মা এমনি মরেনি—মা ছুসাইড (সুইসাইড) করে মরেছে—

শাওন একটু ঝাঁকুনিই খেয়ে উঠল। তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, সে কি···।

—হাঁ। আমার বাপু শরাবী, শরাব খেয়ে মায়ের উপর খুব অত্যাচার করত, দেড় বছর বয়সে আমাকে নিয়ে মা অন্য লোকের কাছে চলে যায় সাড়ে তিন বছর বয়সে আমাকে বাপুর জিম্মায় রেখে ফিরে গিয়ে খুদখুশি (আত্মহত্যা) করে।

শুনে শাওন স্তব্ধ।

তিতলি খর-চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।—শুনে আমার ওপর

তোমার খুব ঘেন্না হচ্ছে না?

শাওন মাথা নাড়ল। বলল, না, খুব দুঃখ হচ্ছে।

তিতলির গনগনে মুখ, কিন্তু হাসছে। আমার জন্য তোমাকে আর খুব বেশি দিন দুঃখ করতে হবে না বোধহয় পরদেশীবাবু··আমার নাম তিতলি ·· পরজাপতি...তিতলির আয়ু আর কতটুকু বলো?

মুখখানা এবার কৌতুকোচ্ছল দেখালেও শাওন ধাক্কাই খেল একটু। বলল, মানুষ তিতলির আয়ু কম হতে যাবে কেন?

তিতলি হাসতেই লাগল। তারপর হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলল, তোতাচাচা আমার কথা তোমাকে বলতে যায় কেন—তুমি জানতে চাও বুঝি?

শাওন হেসেই জবাব দিল, আমি মনে মনে জানতে চাই বুঝে তোতারাম নিজে থেকেই বলে।

রাগ দেখাতে গিয়ে তিতলি হেসে ফেলল, ওটা এক-নম্বরের পাজি, কিন্তু আমার ওকে ভালো লাগে। পরের মুহূর্তে সিরিয়াস মুখ। আচ্ছা তোমার খোঁজে তিরিশ বত্রিশ বছর বয়েস অথচ বিয়ে হয়নি এমন কোনো ব্রাভন মেয়ে আছে?

শাওনও গম্ভীর।—আরো খানিকটা মাটি খোঁড়া হোক, দেখি মেলে কি না·· কার জন্য?

জবাব শুনে তিতলি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, ব্রিজমোহনের জমিন্ খুঁড়ে মরা মেয়ে দুই একটা পেতেও পারো—জিন্দা মেয়ে পাবে কোথায়? তোতাচাচার জন্য একটা জিন্দা মেয়ে না পেলেই নয় এরপর সত্যিই না দুলারী বহিনের স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়ে যায়।

এর পরের স্বাভাবিক প্রশ্নে তিতলি চুনীলাল মাস্টারের মেয়ে দুলারীর সঙ্গে তোতারামের বিয়ে নাকচের প্রসঙ্গ আর তার পরের ফলাফল সবিস্তারে গল্প করল। ওর মায়ের কথা শুনে শাওনের মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল। এই গল্প শুনে সে হেসে সারা।

তিতলিকে তার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে শাওন সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পে ফিরল। আগের সেই তাঁবু ক্যাম্প নয়, এখন পাকা

দালানে পাকা ক্যাম্প। তু'টো ঘর। একটা শোবার, একটা বসার। সেখানে তোতারাম বসে মনের আনন্দে চা-বিস্কুট খাচ্ছে। ওকে দেখে বলল, তুমি এসে গেছ দোস্ত, আমি ভাবছিলাম আজ ফিরবে কি ফিরবে না।

শাওন খোশ মেজাজে ছিল। এ-সময় তাকে দেখে ভালো লাগল না। আবার তিতলি যা বলেছিল সেই রকমই মনে হল। লোকটা ঘোড়েল বটে, কিন্তু খারাপ লাগে না। বলল, তুমি এ-সময়ে যে?

—আমি হুকুমের নোকর, ঠাকুর ব্রিজমোহন পাঠালো—এলাম।··· লছমী কি-রকম আছে?

তিতলিকে শাওন জিগ্যেস করেছিল জনার্দন পূজারীকে একটা খবর দিয়ে ক্যাম্পে ফিরবে কিনা। তিতলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, কক্ষনো না—তার চিন্তা থাকে তো সে তোমার কাছে এসে খোঁজ নিয়ে যাক।

শাওন জানান দিল, ভালো আছে, আর তু'ঘণ্টা দেরি হলে অ্যাপেন-ডিক্স বার্স্ট করে মারা যেত।

গলা দিয়ে একটা উদ্‌বেগের শব্দ বার করল তোতারাম। তারপর বলল, তুমি এখানকার গরিব অছুতদের জন্য যা করছ, ঠাকুর ব্রিজমোহন তোমার কত প্রশংসা করছিল।···তাদের কত লোককে খনিয়ার কাজে লাগিয়েছ, তাদের জন্য গহেরা কুঁয়া করে দিয়েছ, এখন আবার একটা ছৌঁড়ীকে সরকারী জিপে করে নিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচালে—গাঁয়ের লোক এরপর তোমাকে মাথায় করে রাখবে।

এ-রকম কথা আগেও একদিন বলেছিল তোতারাম। সে কি করছে না করছে সব ওদের হিসেবের মধ্যে। বলার ধরনটা আদৌ নিখাদ প্রশংসার মনে হল না শাওনের। বলল, লছমী অছুত নয়, পঞ্চ-এর মুরুব্বির মেয়ে···।

—ও তো সচে বাত্, কিন্তু তিতলি এসে ধরেছিল বলেই না সক্কলকে নিয়ে তুমি সরকারি জিপে করে পাটনায় ছুটেছ—রহুয়া ব্রিজমোহন তো এই জন্যেই তোমার আরো বেশি প্রশংসা করছিল, আমাকে বলল, যাও খবর নিয়ে এসো, আর যদি পারো ইন চার্জ বাবুকে ধরে

নিয়ে এসো।

সরকারি জিপে করে নিয়ে যাওয়াটা দু' দু'বার কানে লেগেছে শাওনের। রাগ হলেও এখনো সে ওপরতলা প্রকাশ দীক্ষিতের উপদেশ মেনে চলছে। ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, এখন আমি খুব ক্লান্ত, গিয়ে বলো, পরে একসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

—বহুত খুব। তোতারাম চা বিস্কুটের পেয়ালা প্লেট এক ধারে সরিয়ে রেখে হাতে করে ভেজা ঠোঁট মুছে নিল। তারপর হঠাৎই কিছু যেন মনে পড়ল।—আচ্ছা দোস্ত, জনার্দন পূজারী ঠাকুর সাহেবকে বলছিল, সীতিয়া আর তার মা পূজারীর ভাইয়ের বাড়িতে থাকবে—কিন্তু এই একটা রাত তিতলি কোথায় থাকল···সীতিয়ার চাচা তো কোনো অছুত ছোঁড়ীকে আঙনায় ঢুকতে দেবার লোক নয়?

শাওনের মুখ লাল। রাগ হলে চাপতে জানে না।—এটাও কি তুমি জানতে চাও না তোমার ঠাকুর ব্রিজমোহন?

তোতারাম ভেবাচাকা খেল একপ্রস্থ। তারপর টেনে-টেনে হাসতে লাগল।—আরে দোস্ত, আমার নিজের কি চাওয়া না চাওয়ার কিছু আছে তোমাকে তো বলেছি আমি অন্যের মগজের বুলি আওড়াই···ঠাকুর সাহেবের কথাই আমার কথা, ঠাকুর সাহেবের খুব চিন্তা, রাতে কোথায় থাকল, মেয়েটার কষ্ট হল কিনা, জনার্দন পূজারীকেও বলছিল, মেয়েটার রাতে থাকার কোনো ব্যবস্থা না করে এ-ভাবে যেতে দিলে কেন?

শাওন মনে মনে লজ্জিত হল।···নিজের নেকড়ে-মার্কা ভাইপোর হাত থেকে মেয়েটাকে বাঁচিয়েছিল,···জাত পাতের ব্যাপারে জানে, মেয়েটাকে স্নেহ করে বলেই হয়তো ব্রিজমোহনের চিন্তা হয়েছে কোথায় থাকল না থাকল।

হালকা মেজাজে ফেরার মতো করে শাওন বলল, কাল রাতে সীতা ওরা কেউই তার চাচার বাড়ি যায়নি, সকলে মিলে রাতে ওয়ার্ডের ওয়েটিং রুমে ছিল। তারপরেই আলতো করে জিগ্যেস করল, দুলারীর খবর কি?

সঙ্গে সঙ্গে তোতারামের ঢুলুঢুলু চোখ বড় বড়। অ্যাঁ! তুমিও? ওই তিতলিই আমাকে ফাঁসাবে দেখছি, দুলারীর কথা সে-ই নিশ্চয় তোমাকে

লেছে? থাক, আমি চলি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে ঠাকুর সাহেব ও-দিকে অপেক্ষা করছে—

হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। শাওন হাসতে লাগল।

বিকেলে সাইটে এসে শাওনের উৎসুক হু'চোখ একবার চার দিকে ঘুরে এলো। গরম পড়ছে, ওই মেয়ে এখন সকালে আসা ছেড়েছে। বিকেলেও রোজ আসে এমন নয়। এলে তাকে দেখা মাত্র শাওনের ভিতরটা খুশিতে ভরে ওঠে। না এলে ভিতরের একটা তাগিদ পা হুটোকে পুনপুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। সহেলীদের সঙ্গে তিতলি নদীর দিকে বেড়াতে যায়। পুনপু এখান থেকে কম করে আড়াই তিন মাইলের পথ। কিন্তু বিকেলে বেড়ানোর পক্ষে এমন কিছু দূরে নয়।

···ওই মেয়ে সাইটে আসেনি যখন পুনপুর দিকেই হয়তো গেছে। দূর থেকে শাওনকে দেখলেই তিতলির সহেলীদের চোখে মুখে উচ্ছল হাসি। তাকে নিয়েই নিজেদের মধ্যে রসিকতা শুরু হয়, না বোঝার কি আছে।···আর তিতলি হু'হাত কোমরে তুলে ঠোঁটের কোণ দাঁতে কাটতে কাটতে তার দিকেই চেয়ে থাকে। চোখে মুখে হাসি উছলে পড়ে কিন্তু হাসে না।

··আজ আর আড়াই তিন মাইল পথ পা হুটো টানতে ইচ্ছে করছে না শাওনের। সমস্ত গায়ে বেশ ব্যথা, মাথাটা ভার-ভার। জ্বর মনে হচ্ছে না, কিন্তু একটু জ্বর-জ্বর ভাব। তবু কাজ দেখা শুনার পর পুনপুর দিকেই চলল। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বসলে মাথাটা হালকা হবে। কিন্তু আজ হাঁটতে বেশ কষ্টই হচ্ছে।···তিতলি সাইটে না এলেই যে নদীর ধারে যায় এমন নয়। ওর কোথাও যাওয়া না যাওয়া নিজের খেয়াল খুশির ওপর। তবু চলল।

কাছাকাছি এসে আরো ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু দূর থেকে ওই মেয়ের

দঙ্গলের দিকে চোখ পড়তে সেটুকু গেল। তাকে দেখেই ওরা খুশির চোটে তিতলিকে ঠেলা-ঠেলি করছে।

শাওন তক্ষুনি মতলব ঠিক করে নিল। গম্ভীর মুখে অন্যদিকে যাওয়াটা বোকামি হবে। ওদের দিকে চেয়ে অন্তরঙ্গ হাসি মুখে বার দুই মাথা নেড়ে আর একটা হাত তুলে ওদের উপস্থিতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করল। তারপর অনেকটা যেন নিজের মনেই নদীর নিরিবিলি দিকটায় চলল। একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল।

যা আশা করেছিল তাই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিতলি এসে হাজির। দু'গজের মধ্যে দাঁড়ালো, দু'হাত কোমরে উঠল।—এ পরদেশীবাবু, আমার ওই পাজি সহেলীরা যা-তা বলছে।

শাওন ফিরে দেখল। হাত ধরে টেনে পাশে বসাতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ইচ্ছে ইচ্ছেতেই শেষ।—কি বলছে?

—বলছে, পরদেশীবাবু তোর খোঁজেই পুনপুতে এলো, কিন্তু আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে সরে গেল।

শাওন নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয়?

তিতলির চোখ পাকানোর ভাব।—আমার মনের কথা তোমাকে বলব কেন, ওরা যা বলেছে তাই বললাম।

—তাহলে ওদের গিয়ে বলে দাও, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ধুলো বালির মধ্যে কাটানোর পর একটু খোলা বাতাসে বসার বা বেড়ানোর মতো জায়গা পুনপু ছাড়া আর কোথাও নেই।

ভুরু কোঁচকালো।—তুমি এই পুনপুর দিকে ক'দিন বেড়াতে এসেছ?

—গুনে রাখিনি, ফাঁক পেলেই আসি। শাওন একেবারে ডাহা মিথ্যে বলেনি। গত এক সপ্তাহের মধ্যে দু'দিন ওকে সাইটে না দেখে আশা নিয়ে এখানে এসেছিল। কিন্তু সেই দু'দিন তিতলি এখানেও আসেনি।

—কই আমি তো তোমাকে দেখিনি?

—তুমি রোজ আস যে দেখবে?...গত পরশুর আগের দিন এসেছিলে? তারও দু'দিন আগে এসেছিলে?

তিতলি ভাবল একটু। মাঝে দু'দিন আসেনি এটুকু অবশ্য মনে

পড়ছে। তুমি প্রায়ই পুনপুর দিকে বেড়াতে আস বলতে চাও?

—প্রায় না হোক, মাঝে মধ্যে আসি। এবারে একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল। খানিক দূরে নদীটা যেখান থেকে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে, কিছু গাছপালার দরুন ওদিকের খানিকটা দেখা যায় না। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শাওন বলল, ও দিকটায় যাই, বেড়াবার সময় বেশি লোকজন ভালো লাগে না।

কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যে তিতলি চোখ দিয়ে ওজন করছে। —কতজন থাকলে ভালো লাগে?

—বড় জোর একজন।

—মেয়ে না মরদ?

নদীর দিকে চেয়ে শাওন জবাব দিল, মেয়ে হলেই ভালো।

তিতলি হনহন করে সহেলীদের কাছে চলল। ঘাড় ফিরিয়ে শাওন চলার ঠমক দেখছে। একটু বাদেই সঙ্গিনীদের নিয়ে ফিরে এলো। গম্ভীর। সবকে লেআইলী কওন্ তোঁহার মন্-পসন্দ্ চুনা লো।

ওরা হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু হাসছে না। শাওন গম্ভীর মুখে সকলকে দেখল একবার তারপর বছর এগারো বারোর যে একটাই কালোকোলো মেয়ে ওদের মধ্যে তার দিকে হাত বাড়ালো।

মেয়েটা ছুট। হাসিতে ভেঙে পড়ে অন্য মেয়েগুলোও ছুটল। তিতলি এখনো গম্ভীর থাকতেই চেষ্টা করছে। আফশোসকা বাত্ ও ছোঁড়ী তোঁহারকে পসন্দ্ না করলী।

শাওন বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল। আমার এরকমই ভাগ্য। তিতলি এবারে হাসছে। একবার সহেলীদের দিকে তাকাতে তারা ওকে হাত তুলে ডাকল। শাওনের দিকে ফিরে তিতলি বলল, এত বড় সাহেব হয়েও এরকম ভাগ্য নিয়ে বসে আছ কেন? উঠে পড়ো, আমরা এখন ঘরে যাব—

—যাবে তো যাও, আমি উঠব কেন?

—তুমি এখানে একলা বসে থাকবে?

শরীরটায় কিছু যেন হয়েছে, নদীর ঠাণ্ডা হাওয়াও ভালো লাগছে না। তবু ওঠার ইচ্ছে নেই। একলা বসে থাকলে কি হয়েছে, হাঙরে টেনে

নিয়ে যাবে ?

তিতলি আবার গম্ভীর হঠাৎ। একটু চেয়ে থেকে জবাব দিল, পুনপুনে হাঙর নেই, কিন্তু ডাঙায় অনেক আছে—ওঠো এখন!

শাওনেরও তক্ষুনি গোঁ চাপল।—তোমাকে কে ধরে রেখেছে, তুমি যাও না ?

তিতলি রাগ করেই দুপ-দাপ পা ফেলে ফিরে চলল। মাঝামাঝি গিয়ে একবার ঘুরে তাকালো। তখনো বসেই আছে দেখে আবার ঘুরে সঙ্গিনীদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। তারপর তেমনি রাগ-রাগ ভাব দেখিয়ে ফিরে এসে ধুপ করে পাশে বসে পড়ল। ঝাঁঝালো মন্তব্য, তুম বহুত জিদ্দী আদমী!

শাওন চেষ্টা করে গম্ভীর। ফিরে এলে কেন ?

জবাবে তিতলির খিলখিল হাসি। তারপরেই সুরেলা গলায় গুনগুন গান :

'জিয়রা কস্‌ক-মসক্ মোর রহে লাগল
মনমেঁ আকে কেহুঁ-চোর রহে লাগল'।

অর্থাৎ, আমার বুকের তলায় মোচড় পড়তে লাগল, মনের মধ্যে কোনো চোর এসে সিঁধ কাটল—না এসে করি কি ?

শাওনের কান-মন জুড়িয়ে গেল। ভালো গান কবে শুনেছিল, গুনগুন দু'লাইনের এই রসের গানও এত সুন্দর, এমন মন-ভরানো হতে পারে!

শাওন লোলুপ সুরে বলে উঠল, হয়ে গেল!...আর নেই!

হাসি উপচে উঠছে, কিন্তু চাউনি ধমকে ওঠার মতো। এর পরেও... আরো ? আবার খিলখিল হাসি।

একটু পরে শাওন বলল, আজকাল তো সাইটে বেশি যাও না, এখানেই বেশি আস বুঝি ?

—ফাঁক পেলেই আসি।...পুনপু হল আমার গঙ্গা মাই—আজ তিন বছর ধরে এই মা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে...

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, আন্ধেরি নামছে, এখন ওঠো তো...।

—আন্ধেরির এখনো দেরি আছে, তাছাড়া তোমার এত ভয়ের কি

আছে ?

মুখের দিকে থমকে চেয়ে রইলো একটু।—বাবুসাহেব সত্যি তুমি সাঁনঝতক পুনপুর ওই নিরালা দিকে বসে থাকো ?

বলে যখন ফেলেছে সেই ভাবটুকুই বজায় রাখতে হল। হাঁ-না জবাব না দিয়ে ফিরে জিগ্যেস করল, থাকলে কি হয়েছে ?

—না, মাথা ঝাঁকালো, আমার কশম, একলা তুমি সাঁনঝতক কক্ষনো এখানে থাকবে না!

শাওনের কৌতূহল বাড়ছে, এ-ও স্পষ্ট, ভয় নিজের জন্য নয়, কেবল তারই জন্য। বলল, কার ভয়ে থাকব না ?

—ওই ঠাকুর ব্রিজমোহন আর তার ভাতিজা বাবুয়াকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না, তুমি জানো না ব্রিজমোহনের এখন তোমার ওপর আগের থেকেও বেশি রাগ।

শাওন সাদা মনের মানুষ। কিন্তু বোকা নয়। খনির কাজ এখন যে হারে এগোচ্ছে, ব্রিজমোহন তার জমির আশা আর রাখে না।···তাহলে তিতলির সঙ্গে মেলামেশাই তার বেশি রাগের একমাত্র কারণ হতে পারে। কিন্তু তা ভাবতেও অবাক লাগছে। কি মনে পড়তে আগে একটু রসিকতার লোভ ছাড়তে পারল না। বলল, ব্রিজমোহনের ভাতিজা বাবুয়ার দেমাক তো তার ইয়ারবন্ধুদের সামনে ভেঙে দেবার ব্যাপারটা তোতারামের মুখে শুনেছিলাম, সে আর তোমার জন্য আমার ওপর রাগ করতে যাবে কেন ?

তিতলির সমস্ত মুখ এই পড়ন্ত আলোতেও মুহূর্তে সিঁদুর বর্ণ। ওড়নাটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল, যেন এটুকু শুনেই বে-আবরু লাগছে। বলে উঠল, ওই পাজি নচ্ছার তোতার মুখ একদিন আমি ভোঁতা করে দেব—এসব গল্পও সে তোমার কাছে করেছে!

শাওনের মাথাটা আরো ভার লাগছে, শীত-শীতও করছে, তবু আরো খানিক বসার লোভ। বলল, কাকার কাছে ওরকম বকুনি খেয়ে টিট হবার পরে সে আর আমার ক্ষতি করতে যাবে কেন, আর ব্রিজমোহনের তো তুমি মেয়ের বয়সী, তোমার খোঁজ-খবর রাখে, তোমাকে খুব পেয়ার করে

শুনলাম···সে-ই বা আমার ক্ষতি করতে যাবে কেন?

এ-কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করার নয়। মুখের দিকে চেয়ে আছে, দু'চোখ রাগে জ্বলছে। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, সাঁপ মেভক্কে (ব্যাঙকে) কইস পেয়ার করে তুম না জানথ? বুঢ্‌ঢা সাপুরা কচি ভেক পেলে তাকে না গিলে ছেড়ে দেয়?

এরকম একটা সন্দেহ শাওনের মনের তলায় কখনো উঁকিঝুঁকি দেয়নি এমন নয়।···আজ পর্যন্ত এই মেয়ের পাঠানো কতজন মরদকে সে খনির কাজে লাগিয়েছে ব্রিজমোহন তার হিসেব রাখে, তার কথায় অছুত এলাকায় গভীর কুঁয়ো করে দিয়েছে বলে ওই লোক তার চরের মারফৎ প্রশংসার কথা শোনায়, তিতলি ধরে পড়েছিল বলেই সরকারি জিপে সে সকলের সঙ্গে লছমীকে পাটনার বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়েছে, অছুত মেয়ে তিতলি রাতে কোথায় ছিল তা নিয়েও ঠাকুর সাহেবের দুশ্চিন্তা···নাঃ, নিজেকে শাওন একটা বোকা হাবাই ভাবছে এখন, মনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিলেও ভালো দিকটাই ভাবতে ভালো লেগেছিল।

তিতলি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো।—এ বাবু, তুম্ উঠ্‌ব কি নহী?

ওর জন্য এই মেয়ের উদ্‌বেগটুকু ভারি ভালো লাগছে।—তুমি যাও, আমি আর একটু বসি—

জবাবে ঝুঁকে ওর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান, জল্‌দি ওঠো বলছি—

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর অনুভূতির তারে যেন গণ্ডগোলের মতো লাগল। দু'হাতে ধরা হাতের ওপর আর একটু চাপ পড়ল। মুখের ওপর চাউনি তীক্ষ্ণ একটু। চট করে একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়েই দুই হাঁটুর ওপর তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। তার পরেই ওর একটা হাত শাওনের ঘাড়ের পিছনে, অন্য হাত কপালে।

আবার উঠে দাঁড়ালো। এ বাবু, তোমার গা যে খুব গরম, বোখার হয়েছে···তোমার কিছু মালুম হচ্ছে না?

শাওন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।—হ্যাঁ, বিকেল থেকে শরীরটা বেশ খারাপ লাগছিল....

—খারাপ লাগছিল আর তুমি এই ঢাই মাইল পথ হেঁটে নদীর দিকে বেড়াতে এলে। এখন যাবে কি করে, এদিকে তো একটা বয়েল গাড়িও পাওয়া যাবে না—

—ঠিক চলে যাব, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

বলল বটে, কিন্তু এত পথ হেঁটে ক্যাম্পে ফিরতে হবে ভেবে আরো অবসন্ন লাগছে। শরীরের দিকে খেয়াল না করা পর্যন্ত এতটা খারাপ লাগেনি। আধ মাইলটাক এগনোর পরেই তিতলি বুঝতে পারছে লোকটার কষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে এদিকটা নির্জন এখন। শাওনের পরনে ট্রাউজারস, গায়ে হাফ-হাতা বুশ শার্ট। শীতে সমস্ত শরীরে এক-একবার কাঁপুনি উঠছে। অথচ গরমিকাল এসেই গেছে বলা যায়। তিতলি মাঝে মাঝে তার হাত ধরছে, সেই হাত থেকে থেকে কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত উঠছে—জ্বর বাড়ছে কিনা বোঝার চেষ্টা।

আরো খানিক হাঁটার পর তিতলি বলল, এ বাবু, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, এখন এদিকে লোকজন নেই, আঁন্ধেরিতে কেউ খেয়াল করবে না—তুমি যতটা পারো আমার কাঁধে ভর করে এসো—

আবছা অন্ধকারে এখন মমতাময়ী মূর্তি দেখছে এই মেয়ের। শাওন একটু হেসে বলল, এই লোভেই কষ্টটা বেশি হচ্ছে ··

হাত ছেড়ে দিয়ে তিতলি এক হাত তফাতে সরে গেল।—তুমি খুব নচ্ছার আদমী আছ—

একটু বাদেই আবার পাশে এসে হাত ধরল। বুঝতে পারছে খুব কষ্ট হচ্ছে। আরো খানিকটা আসার পর লোকালয়। তিতলি হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু পাশ ঘেঁষেই চলল। অনেকেই ওদের চোখ তাকিয়ে দেখছে। শাওনের মনে হচ্ছে এই পা দুটো তাকে বুঝি আর ক্যাম্প পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

···শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলো।

দুটো পাকা ঘর আর টালির ছাদের স্থায়ী ক্যাম্প এখন। অনেকটা জায়গা ছেড়ে এক সারিতে ভদ্র কর্মচারী আর টেকনিশিয়ানদের জন্য পর পর এক ঘরের আরো ছ'টা ওইরকম পাকা ক্যাম্প। শাওনের বাইরের

আঙিনায় একটা আর শোবার ঘরের সামনে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। বাইরের ঘরে তিতলি আরো এসেছে, শোবার ঘরে এই প্রথম। টলতে টলতে ঘরে ঢুকে শাওন প্যান্ট জামা জুতোসুদ্ধ শুয়ে পড়ল। এত জ্বর সত্ত্বেও ঘামছে।

রতন তার সাহেবের অবস্থা দেখে হাঁ।

তিতলি চটপট তার জুতো মোজা খুলে নিল শাওন খেয়ালও করল না। একটু বাদে চোখ টান করে দেখল, তিতলি দু'হাত কোমরে তুলে তার দিকেই অপলক চেয়ে আছে। এগিয়ে এসে ঘামসুদ্ধ কপালে হাত রাখল। রতনকে বলল, এক বালতি জল আর একটা গামছা নিয়ে আসতে। রতন জল আর তোয়ালে নিয়ে এলো। তিতলি প্রথমে তোয়ালে ভিজিয়ে মাথায় চাপড়ে চাপড়ে দিল। তারপর বেশ করে মাথাটা মুছে দিয়ে আবার তোয়ালে ভিজিয়ে জল নিঙড়ে সেটা মুখে কপালে বার কয়েক চেপে চেপে ধরল। তারপর তোয়ালে তুলতেই দু'চোখ বিস্ফারিত। কিছু চোখে পড়েছে। রতনকে হ্যাজাকটা ভিতরে নিয়ে আসতে বলল। হ্যাজাক আসতে ঘর দিনের মতো আলো। বিছানায় ঝুঁকে তিতলি শাওনের কপাল দেখল, গলা দেখল, নিজের হাতে দুই কান উল্টে দেখল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, হায় রাম!

মাথা আর কপাল মুখ জল দিয়ে মুছে নিতে একটু আরাম লাগছিল, তিতলির মুখ দেখেই শাওন বুঝে নিয়েছে কি হয়েছে বা হতে পারে। রতনকে বলল আরশিটা নিয়ে আসতে। তারপর নিজেই ভালো করে মুখ গলা কান দেখল। জল ভরা আট দশটা গুটি চোখে পড়ল।

আরশিটা রতনকে ফেরত দিয়ে আঙুল তুলে তিতলিকে দরজা দেখিয়ে দিল। ছোঁয়াচে রোগ, এখানে আর এক মিনিটও নয়, বাড়ি চলে যাও।

তিতলি শান্ত মুখেই চলে গেল। চারদিকে এখন বসন্ত হচ্ছে ও জানে। পরদেশীবাবুরও হল। দেখার কেউ নেই, সেবা যত্ন করারও কেউ নেই। এ রোগ হলে ভয়ে কেউ কাছে আসতে চায় না। ভাবতে ভাবতে তিতলি ঘরের দিকে দ্রুত পা চালিয়েছে।

শাওনের জ্বর যন্ত্রণাও তেমনি। রাত কত খেয়াল নেই। রতনের

ডাকে ঘোর কাটল। সে বড়সড় একটা বাটি আর জলের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে।

—কি?

—দুধ-সাবু....তিতলিয়া দিদি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

খিদে না হোক, তেষ্টা খুব। শাওন এক চুমুকে সবটাই খেয়ে নিল।

পরদিনের মধ্যে সমস্ত শরীর গুটিতে ছেয়ে গেছে। তেমনি জ্বর। সকাল দশটা নাগাত একজন অচেনা লোক ঘরে ঢুকল। হাতে ব্যাগ। —গুড মর্নিং, আমি ডক্টর শ্রীবাস্তব...। আপনার পক্স হয়েছে আর খুব হাই টেম্পারেচার শুনলাম, ওই মেয়েটা বার বার আপনাকে একবার দেখে যাবার কথা বলল, তাই—

ওই মেয়েটা বলতে কে, শাওন আর জিগ্যেস করল না। জামা তুলিয়ে ডাক্তার একবার গা দেখল। থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর দেখল। রতনকে দিয়ে জল আনিয়ে নিজেই তাতে পটাশ পারমাংগানেটের গুঁড়ো ফেলে থার্মোমিটার তার মধ্যে ডুবিয়ে রেখে বাইরে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুলো। তারপর থার্মোমিটারটা মুছতে মুছতে বলল, জ্বর এখন একশ তিন, আরো বেরুবে মনে হয়, কিছুদিন ভুগতে হবে, জ্বর আর যন্ত্রণা কমিয়ে রাখার ওষুধ রেখে যাচ্ছি—

যাবার আগে শাওন জিগ্যেস করল, আপনার ফি কত?

—ফী যাই হোক, আপনি গাঁয়ের লোকের এত উপকার করছেন, আপনার কাছ থেকে ফী নেব না।

যন্ত্রণা সত্ত্বেও একজনের অদৃশ্য উদ্‌বেগ আর যত্ন অনুভব করে শাওনের ভালো লাগছে। বলল, আপনি পুরো ফী আর ওষুধের দাম নেবেন, কারণ চিকিৎসার টাকা আমি অফিস থেকে পাব।...অন্য কোনো কমপ্লিকেশন না হয় এ জন্যে আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।

—নিশ্চয়, তাহলে ফী-এর বিলও পরে একসঙ্গেই হবে।

দুপুরের খাবার দেখেও শাওন অবাক। সরু চালের গরম ভাত, নিম ঝোল, লাউ শুক্তো, কাঁচা মুগের ডাল আর চমৎকার ভয়সা ঘি।

জিগ্যেস করতে হল না রতন নিজেই জানান দিল, সীতিয়া দিদি এসব রেখে গেছে আর বলে গেছে এরকম ঠাণ্ডা জিনিসই এখন খেতে হবে—সকালের খাবারটা সে রোজ নিয়ে আসবে।

শাওন বিব্রত বোধ করল। ওরাও তার কাছে কৃতজ্ঞ বটে, কিন্তু জনার্দন পূজারীর বাড়ি থেকে খাবার আসবে এটা চায় না।

বিকেলে দরজার কাছেই তিতলিকে দাঁড় করিয়ে দিল শাওন। ভিতরে নয়, ওইখান থেকেই দেখো আর শোনো।···ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার পাঠিয়েছ ঠিক আছে, কিন্তু জনার্দন পূজারীর বাড়ি থেকে খাবার আনার ব্যবস্থা করতে গেলে কেন? যা করার রতন করবে, তুমি ওদের অবশ্য বারণ করে দিও, কাল যেন কক্ষনো কিছু না আনে।

ঠাণ্ডা মুখে তিতলি বলল, রতন সীতিয়া বহনীর মতো পারবে না।

শাওন বিরক্ত।—যা পারে তাইতেই আমার হবে, ওখান থেকে আমার খাবারটা আসুক আমি চাই না।

মুখরার মতো তিতলি বলল, সীতিয়া দিদি শুধু রান্নাই করে দিচ্ছে, ভালো ঘিউ চাল ডাল সব তো আমিই ওখানে দিয়ে এসেছি—জনার্দন পূজারীর তুমি কিছু খাচ্ছ না, আর সীতিয়া বহনী আর লছমী খুব ভালো মেয়ে।

শুনে শাওন হতভম্ব খানিক। তারপর বলল, তাহলে এত ধকল না পুইয়ে তুমি নিজে রান্না করে পাঠালেই তো পারো?

তিতলির দু'চোখ বড় বড়। খুশিও। আমার রান্না ভাত পর্যন্ত তুমি খেতে পারো?

—পারি কিনা করে দেখো।

তিতলি অপলক চেয়ে আছে। তারপর হঠাৎই বিরক্তির সুরে বলে উঠল, তুমি বড় নটখট আদমী, ছুপার হাজার চোখ আমার চলা-ফেরার দিকে নজর রাখে জানো না? আর আমার ঘরে একজন ফুফু আছে তাও জানো না? কেন তুমি আমাকে এরকম মুশকিলে ফেলো? ও আমার দ্বারা হবে না—সীতিয়াই দিয়ে যাবে।···তোমার মুখের দিকে তো আর তাকানো যায় না দেখি, খুব কষ্ট হচ্ছে?

ওর দিকে চেয়ে কষ্ট হচ্ছে বলতেও খারাপ লাগছে শাওনের। হাসতে গেলেও যন্ত্রণা। বলল, আর কখনো এ-সব হয়নি তো, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে—

পরের তিন চার দিনে যে গুটিগুলোতে পাক ধরছে তার অসহ্য যন্ত্রণা। শরীরের কোথাও আর জায়গা নেই। গলার চোখের আর কানের ভিতরেও হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই জ্বরে আর যন্ত্রণায় শাওন বেহুঁশ।

এক সময় মনে হল পাক-ধরা গুটিগুলোর ওপর কেউ খুব নরম কিছু দিয়ে যেন কি বোলাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা আর আরাম লাগছে। চোখ খুলে তাকালো। ঝাপসা দেখছে। তারপর স্পষ্ট হল। শয্যায় বসে ঝুঁকে পড়ে গুটিগুলোর ওপর তুলোয় করে কিছু একটা তেল-তেলে জিনিস লাগিয়ে দিচ্ছে তিতলি—তার পিছনে কুচ্ছিত দেখতে এক বয়স্কা রমণী দাঁড়িয়ে।

শাওন যতটা পারে চেঁচিয়েই উঠল, বিছানায় বসে এ কি করছ তুমি?

ঠাণ্ডা মুখে তিতলি জবাব দিল, ওষুধ লাগাচ্ছি। দাঁড়ানো রমণীকে দেখিয়ে বলল, এই ভিখুয়াকা মা এ-সবের খুব ভালো দাওয়াই জানে—একটু পরেই তোমার জ্বালা, যন্ত্রণা অনেক কমে যাবে দেখো—

ঘুরে তাকালো।—ভিখুয়াকা মা, ঠিক লাগানো হচ্ছে তো?

সে মাথা নাড়লো। ঠিক হচ্ছে।

—তাহলে তুমি ঘরে চলে যাও, আর বড় এক শিশি তেল তৈরি করে রেখো, এ-তো ফুরলো বলে। শাওনের দিকে ফিরল, আরাম হচ্ছে না?

আরাম যে হচ্ছে শাওন অস্বীকার করে কি করে। কিন্তু তিতলি এই বিছানায় বসে এ-সব করছে বলে আরামের থেকে রাগ চারগুণ। ভিখুয়ার মা চলে যেতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, কেন তুমি এ বিছানায় এসে বসেছ? যাও শিগগীর, চান-টান করে জামা-কাপড় সব ধোয়ার জন্য পাঠিয়ে দাও!

তিতলি ঝুঁকে তেমনি মন দিয়ে প্রত্যেক গুটির ওপর আরকের তুলি

বোলাতে বোলাতে বলল, বেশি চেঁচামেচি করলে রাতেও এখানেই শুয়ে থাকব—

হেসে উঠল। দাঁতের সারি ঝিকমিক করে উঠল। এই মেয়েকে বলবে কি তার ওপর রাগই বা করবে কি। তিতলি জিগ্যেস করল, তোমার একটু আরাম হচ্ছে কিনা বলো?

শাওন হাসতে চেষ্টা করল, হচ্ছে, কিন্তু সেটা তোমার হাতের গুণে কি ওষুধের কে জানে—

তিতলি বলে উঠল, থাক আর মস্করা করতে হবে না—খানিক আগে এসে দেখলাম বে-হুঁশ হয়েও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছ, তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ভিখুয়ার মা-কে ধরে নিয়ে এলাম।

চোখের মধ্যেও উঠেছে বলে শাওনের তাকাতে কষ্ট হচ্ছে, তবু চেয়ে আছে। এ যদি অছুত হয় তো দুনিয়ায় ছুত্ কে, জানে না।

সকালে দুপুরে বিকেলে ক্যাম্পের অন্য কর্মচারীরা কেউ না কেউ দেখতে আসে। শাওনের নিষেধ শুনে তাদের সকলেই স্বস্তি, কেউ ভিতরে ঢোকে না, সকলেই দরজার কাছ থেকে দেখে যায়, দু'চারটে কথা বলে যায়। তোতারামকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ঠাকুর ব্রিজমোহনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে, কিছু সহানুভূতির কথা বলেছে। আর যাবার আগে ভিখুয়া-কা-মায়ের দাওয়াই ঠিকমতো লাগানো হচ্ছে কিনা সে খোঁজও নিয়েছে। মন্তব্য, এ-রোগে ভিখুয়া-কা-মায়ের দাওয়াইয়ের খুব নাম আছে, জ্বালা যন্ত্রণা কমে।

শাওন সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় থাকে। গুটিগুলোতে টান-ধরার পর ব্যথা বেদনা কিছু কমেছে। জ্বরও। তিতলিকে বলেছিল, তুমি আসবেই যখন সন্ধ্যায় এসো, অবশ্য যদি অসুবিধে না হয়, ওই সময়টা খুব বিচ্ছিরি লাগে আর একলা লাগে।

তিতলি মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসেছিল। কিছু বলতে গিয়েও বলেনি। মাথা নেড়েছে।—আচ্ছা সাঁনঝেই আসতে চেষ্টা করব।

তাই আসছে। ওর কথা আর গল্প শুনতে শুনতে রোগ-যন্ত্রণা ভুলে যায়। আবার ওর জন্য দুশ্চিন্তাও। বলে, এত ছোঁয়াছুঁয়িতে তোমারও এই

রোগ হল বলে, দেখো।

তিতলি সেদিন নিরীহ মুখে বলে বসল, তোমার সঙ্গে বেশি ছোঁয়া-ছুঁয়ি আবার কখন হল! তারপরেই হাসি, তোমার হল কেন, তুমি কার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে গেছলে? হবার হলে এমনিই হয়—

সেই সন্ধ্যায় তিতলি আসতে শাওন জানালো, ঠাকুর ব্রিজমোহন দেখতে এসেছিল, ভিখুয়ার মায়ের ওষুধ লাগানো হচ্ছে এ-খবরও রাখে দেখলাম—

চোখ বড় করে তিতলি বলে উঠল, কেবল দাওয়াই কা খবর। আমি কবে কখন ক'বার এখানে আসি, কতক্ষণ থাকি সব ওই শেরমোহনের হিসেবের খাতায় লেখা আছে—বুঝলে?

—শের-মোহন কে?

—যাঃ, তোতাচাচা ব্রিজমোহনকে শের-মোহন 'টাইটল্' দিয়েছে জানো না বুঝি, তাঁমালচা (বন্দুক) নিয়ে কি ভীষণ শের শিকারে নেমেছিল ঠাকুর সব তা-ও জানো না?

মজার গন্ধ পেয়ে শাওন উৎসুক, কি-রকম ভীষণ শের শিকারে নেমেছিল?

তিতলি তার বিছানাতেই জোড়াসনে গ্যাঁট হয়ে বসল।—তোতা চাচা যে-রকম করে বলেছিল সেই রকম করে বলব?

শাওন মাথা নেড়ে সায় দিল।

—তব্ শুনত্ রহ।...একদিন রাতমে ঝঁকিসে (ছোট জানলা) খাইলনমে (ঢেঁকিশালে) দেখলী, এক শের বৈঠলবা, এত্না বড়া শের জিন্দেগীমে না দেখলী—উকরা পুছয়া (লেজ) এত্না লম্বাই যে দেহড়ী পর্ আ-গইল।...ঠাকুর সাহাব শোচতে রহল কা করি। তুহার (তোতারামের) ভোজীসে পুছ্ল, আরে রামুকা মাতারি, খইলনমে এক শের বৈঠলবা—কা করি? ও নিদ্‌মে কহলী, তাঁমালচাসে উড়া দিহ।...তব্ হম তাঁমালচা আন্ল, টোঁটা ভর্ল, নিশানা ঠিক কর্ল, লেকিন মুশকিলমে পড়্ল—হাম ছেত্তি (ছত্রী) ঠেরে, বিনা দোষমে কইসন টোঁটা ছোড়ি? হম্ আওয়াজ দিওনস্, হটিযা! নেঁহি তো সিনা ভোঁক

দি। আরে শ্বশুরা কা দেখ্‌লে? শের আপন পুছোয়া টানত্‌-টানত্‌ হামারা সামনে খাড়া কর্‌ল! হমার অপমান হইল, আঁখো বন্ধ করকে চাবি ঠেল্‌ল—আরে শ্বশুরা কা দেখি! ও শের টোটা মুমে লেইকে হমার সামনে চল্‌ আইল! আরে তোতা, এ গুজব ন"হি ঠেরে—ও টোটা হমারা নানাকা নানার রহল—তব্‌ হম্‌ ফির টে"াটা ভরলী, নিশানা ঠিক করলা, লেকিন চাবি না ঠেললী—ক্যায়সে ঠেলি, ও শের হমার পাঁয়ে পড়্‌ করকে গিড়-গিড়ায়ে লাগ্‌ল—ব্যস হম্‌ ওহকে মাফি করলী···ওক্‌রা বাদ গাঁওমে হমারা ইজ্জত বাড়্‌ল বটে লেকিন মনোয়াঁমে এক গম্ভীর দুখ্‌ রহলন্‌। ··কা দুখ্‌ সমঝল?···আরে ও শ্বশুরা শের নোটঙ্গী দলোঁকা এক ভাংগ্‌লা (অনাথ) বহুরূপী ঠেরে।

যে-ভাবে গম্ভীর মুখে হাত মুখ নেড়ে তিতলি ঠাকুর সাহেবের শেরমোহন 'টাইটল' পাওয়ার গল্পটা বলল, ওটুকু সময়ের জন্য শাওন ভুলেই গেল সে অসুস্থ।

ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। খোসা সব পড়ে যাওয়ায় পর স্নানও করেছে। কিন্তু শরীর খুবই দুর্বল। তার ওপর মেজাজও ভালো না। তিতলি আসা কমিয়েছে। সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে তারপর হাল ছেড়ে ধরে নেয় সেদিন আর এলো না।

শেষের বারে পর পর চার দিন তার দেখা নেই। রাগ করে শাওন ভাবছে কালই সে কাজে জয়েন করবে। ডাঃ শ্রীবাস্তব বলে গেছে আরো কম করে সাত দিন রোদ মাথায় করে কাজে বেরুনোর কোনো কথাই ওঠে না।

সেই সন্ধ্যার পর তিতলি এলো। শাওন শুয়েই ছিল। ওকে দেখে একখানা বাহু কপালের ওপর ওঠে এলো। তাতে কপাল মুখ আর দু'চোখের অনেকটাই ঢাকা পড়ল। তিতলি শয্যার কাছে এসে দাঁড়ালো। দিন-সাতেক হল সে-ই নিম সেদ্ধ জলের চানের আগে লোক ডেকে যতটা সম্ভব ঘরটাকে ঝাড়মোছ করিয়েছে, ডাক্তার শ্রীবাস্তবের কথা মত ওষুধ এনে সমস্ত ঘরে আর বিছানায় ছড়িয়েছে, শয্যায় ব্যবহারের সব জিনিসই রজকের বাড়ি কাচতে পাঠিয়ে নতুন একপ্রস্থ করে পেতে দিয়ে

গেছে। তারপর দু'দিন বাদ দিয়ে একদিন এসেছিল, এবারে চার দিন পরে এলো। কোমরে দু'হাত তুলে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। রাগ হয়েছে বুঝতে পারছে।

—কেমন আছ?

মুখ থেকে হাত না সরিয়ে শাওন জবাব দিল, খুব ভালো।

নিরীহ গলায় তিতলি বলল, এ-রকম মুখ ঢেকে শুয়ে আছ কেন—এই সাঁনঝ্ রাতে ঘুম পাচ্ছে নাকি? তাহলে আমি যাই—

মুখ থেকে হাত সরালো।—আমার ঘুম পাওয়া না-পাওয়ার কি আছে, তোমার যাবার ইচ্ছে হলে যাও। আমি ভালোই আছি, কাল থেকে দু'বেলাই সাইটের কাজে বেরুবো, তোমারও দায় ফুরোবে—

তিতলি তেমনি দু'হাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি ভাঙতে দিচ্ছে না।—এই দুব্‌লা শরীর নিয়ে ডাগ্‌দার তোমাকে ধুপ আর গরমির মধ্যে কাজে যেতে বলেছে?

—তোমার সে-খোঁজে দরকার কি?

এবারে তিতলি হেসে ফেলল।—বেমারিতে পড়ে তুমি একেবারে বাচ্চা ছেলে বনে গেলে যে! আমার আসা কি সহজ, ওই সেয়ানা ফুফু রোজ বিকেলে কোনো না কোনো মেহ্‌মানকে এনে রাত পর্যন্ত ধরে রেখে আমাকে আটকায়—

—বাজে কথা বোলো না, তিন সপ্তাহ ধরে আটকাতে পারল না, এখন আটকাচ্ছে? আসলে যেই একটু সেরে উঠেছি ওমনি সরে যাচ্ছ—আছি কি নেই চার দিনের মধ্যে একটা খবর নেবারও দরকার মনে করোনি।

রাগ দেখে তিতলি মজাই পাচ্ছে। বলল, আসি না আসি তোমার সব খবর, প্রত্যেক দিনের খবর রাখি।

—বাজে কথা, পালিয়ে বেড়াচ্ছ—খবর রাখছ কি করে?

তিতলি চেয়ে আছে। লালচে ঠোঁটে হাসি টসটস করছে। হঠাৎ ঘুরে এগিয়ে গিয়ে দরজা দুটো চার আঙুল ফাঁক রেখে ভেজিয়ে দিল, তারপর পর্দাটা বেশ করে টেনে দিয়ে ফিরে এসে গদী আঁটা মোড়াটা টেনে তার সামনে মুখোমুখি বসল।—একটা গান শুনবে?

এই অসুখটার মধ্যে এসে এসে তিতলি গুটির ওপর আরকের তুলি বোলাতে বোলাতে যন্ত্রণা ভোলানোর জন্য বা অন্যমনস্ক করার জন্য কত রকমের গল্প করেছে। কত হাসির কথা বলেছে। একটু সুস্থ হবার পর শাওন নিজেই দুই-একদিন ওর গান শোনার আব্দার ধরেছিল। তিতলি তক্ষুনি তা নাকচ করেছে। বলেছে, হ্যাঁ, এখানে গানের আসর বসাই আর গাঁও ভর ঢ্যাড়া পড়ে যাক্। আজ সেই মেয়ে নিজে থেকেই গানের কথা বলছে। লালায়িত খুশি মুখে শাওন তার দিকে পাশ ফিরল।

তিতলি আগে একটু ভনিতা করল, তুমি বললে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, খবর রাখি কি করে—তাইতো গানটা মনে পড়ল।

প্রথমে একটু গুণগুণ করে তারপর সহজ সুরেই গানটা ধরল :

'সুরয ছুঁপে আদরি-বাদরি
চন্দ্রমা ছুঁপে দিন মাবস আয়ে
আর পানিকি বুন্দ্ পতংগ ছুঁপে···
আর মীন ছুঁপে জল গহেরা পায়'

ফিক করে হেসে উঠল, তারপর শেষের লাইনটা বদলে নিয়ে আবার গাইলো :

'আর শাওন আয়ে তো তিতলি ছুঁপে
আর ভোর ভয়ে পর চৌর ছুঁপে
মৌর ছুঁপে যব ফাঁগন আয়ে···'

আবার ফিক করে একটু হাসি, গায়ের পাতলা ওড়না মাথায় ঘোমটার মত করে টেনে দিয়ে শাওনের দু'কান আর দু'চোখ ভরে দেবার মতোই গানের শেষের দুই পঙ্ক্তি।

'ঘুংঘট নয়না ওঠ্ করে
চনচল্ নয়না ছুঁপে নেঁহি ছুঁপায়ে।'

মেঘ বাদলে সূর্য গা-ঢাকা দেয়, অমাবস্যা এলে চাঁদ পালায়, আর তিতলি (প্রজাপতি) পালায় শাওন এলে, মাছ পালায় জল গভীর হলে, ভোরের ভয়ে চোর পালায় আর ময়ুর পালায় ফাগুন এলে—কিন্তু ঘোমটা টেনেও (মেয়েদের) চঞ্চল চোখ ওঠে-নামে, আড়াল নিয়েও

যেটুকু দেখার ঠিক দেখে নেয়।

মাথার ওড়না টেনে নামিয়ে তিতলি খুব হাসতে লাগল। বলল, তাহলে আসি বা না আসি, তোমার খবর রাখি কি রাখি না—বুঝলে?

এটা কার্তিকের শুরু। আর দিন কয়েকের মধ্যে দেয়ালি। এখানকার সব থেকে বড় উৎসব। অনেক আগে থেকেই নাচ গান যাত্রা পালা শুরু হয়ে যায়। দেয়ালির পরেও দিন কতক ধরে এই উৎসব চলে। এই সময় মেয়ে বউরা পর্যন্ত সাঁঝের পরে কমই ঘরে থাকে। দল বেঁধে সব যাত্রা বা রামলীলার আসরে গিয়ে বসে।

শাওন ভার্মার মন মেজাজ কিছুদিন ধরে বেশ বিক্ষিপ্ত। তিতলির ইদানীং দেখাই নাই। সে-ও যদি আর দশ জনের মতো এ-সময় আনন্দ ফূর্তিতে মেতে থাকত, শাওনের তাহলে অভিমান হতে পারত, কিন্তু ভাবনা হত না। ওর জন্য মনে একটা শংকার ছায়া পড়ছে। অনেক দিন হয়ে গেল সকালে বা বিকেলে সাইটে তো আসেই না। বিকেলে রোজই প্রায় পুনপুর ধারে গিয়েও দেখে সহেলীরা আছে কিন্তু তিতলি নেই। তাকে দেখেও সহেলীদের চোখে মুখে হাসি-মসকরার ভাব উপছে ওঠে না। শাওন খোঁজ নিয়েছে, তিতলি কোথায়? তারা বলেছে, তিতলি আজকাল ঘর থেকে বেরোয় না। খুব সম্ভব তার সাদী হবে।

—খুব সম্ভব কেন, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় না—তোমরা খোঁজ রাখো না?

ওদের জবাব, কুঠিয়াতে গেলেও তিতলি ঘর ছেড়ে আসে না, আর কুফুও চায় না কেউ ওকে বিরক্ত করে—তাই তাদের সঙ্গে দেখাও হয় না, খোঁজও রাখতে পারে না।

শাওনের অবাক লাগছে।...বিয়ে হতে পারে, কিন্তু আগে থাকতে এ-রকম ঘর-বন্দী হয়ে থাকার কারণ কি।...ওই মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনার

কথা শুনেও বুকের ভিতরটা হঠাৎ এত ফাঁকা-ফাঁকা লেগেছে যে অস্বস্তি। নিঃশ্বাস নিতে-ফেলতে কি-রকম কষ্ট হয়েছে। শাওনের মা মারা যাবার পর যে-রকম কষ্ট হত অনেকটা সেই রকম।

···তিতলির বিয়ে একদিন না একদিন হবে জানা কথাই। এমন রূপ যৌবন আর গুণের মেয়ের এতদিনে বিয়ে হয়ে যায়নি এটাই আশ্চর্য। ওর সেই গানের কয়েকটা কলি এখনো কানে লেগে আছে।···সূরয ছুঁপে আদরি-বাদরি, চন্দ্রমা ছুঁপে দিন মাবস আয়ে, আর শাওন আয়ে তো তিতলি ছুঁপে··· । তারপর ওই গানের শেষটুকুর মতোই তিতলি আড়াল নিয়েছে, প্রায় এক মাস হয়ে গেল ওর দেখা নেই—কিন্তু এই আড়ালে বসেও সে কি তার খবর রাখছে—ঘোমটা টেনেও চঞ্চল মেয়ের চোখ যেমন ওঠে-নামে, যেটুকু দেখার ঠিক দেখে নেয়—তিতলি কি এই অদেখার আড়াল থেকে এখনো ওর দিকে সে-ভাবে চোখ রেখেছে?

সে-রকম দেখা আর সম্ভব নয়। বাইরে থেকে শাওন ভার্মাকে দেখাব কিছু নেই। সে এখন বেশ সুস্থ। কিন্তু পক্সের থেকেও ঢের বেশি একটা চাপা যন্ত্রণা নিয়ে যে-মানুষ উঠছে বসছে দু'বেলা সাইটের কাজ করে যাচ্ছে, তাকে তিতলি দেখবে কি করে? শাওনের মনে আছে শেষ যেদিন দেখা, সেদিন দারুণ হাসিখুশি মনে হয়েছিল ওকে। হাল্কা চঞ্চল প্রজাপতির মেজাজেই যেন ছিল সেদিন।···তিনটেয় ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে সাইটের তদারক সেরে পুনপুর দিকে পা চালিয়েছিল শাওন। খানিক যেতে না যেতে খুশি মুখ, উল্টো দিক থেকে তিতলি আসছে। কাছে এসে হেসে টিপ্পনীর সুরে ও বলেছিল, ঠিক জানি কাজে ফাঁকি দিয়ে এখন তুমি পুনপুর দিকে ছুটবে।

শাওনও হাসিমুখেই বলেছিল, তোমার জন্য আমি কাজে ফাঁকি দিতে পারি ভাবো নাকি?

ওমনি সুচারু ভ্রূকুটি।—আমার জন্য এটুকুও পারো না! কি পারো তাহলে?

শাওন দার্শনিকের মতো জবাব দিয়েছিল, তোমার জন্য আমি সমস্ত ফাঁকির ওপরে উঠে যেতে পারি।

বুঝতে সময় লেগেছিল একটু। তারপর খুব খুশি। ওকে নিয়ে তিতলি সেদিন জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গেছল। ওর বাপু যে-দিকে থাকে সেদিকে নয়, অন্য দিকে। অনর্গল কথা বলছিল, কারণে অকারণে হাসছিল, খুশিতে উপচে উঠছিল। শাওন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, দেখছিল। জিগ্যেস করেছিল, আজ এত খুশি যে, কি ব্যাপার?

তিতলি জবাব দিল, দেয়ালি এসে গেল খুশি হব না? তারপরেই প্রশ্ন, আচ্ছা বাবুজী, দেয়ালিতে বংগালে তুমি অনেক বকরা বলি দেখেছ, তাই না?

—বলি হয়, তবে আমার ও-সব দেখতে ভালো লাগে না—কেন?

তিতলি আবার হাসছিল। বলেছিল, এবার এখানে দেয়ালি উৎসবে একটা মেয়ে বলি হবে শুনছি, দশখানা গাঁওয়ের বড় বড় আদমীরা সব আসবে—তাই ভেবে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

শাওন হাঁ করে চেয়েছিল খানিক। কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই তিতলির ফেরার তাড়া। বলেছিল তুমি আস্তে আস্তে এসো, আমাকে এক্ষুনি ঘুরে ছুটতে হবে, খুব দরকার আছে—

বলেই প্রায় ছোটার মতো করে হাঁটা শুরু করেছিল। শাওন পিছু ধাওয়া করে তার সঙ্গ নিয়েছে। তার মনে হয়েছে, দেয়ালির রাতেই কি ওর বিয়ে নাকি? এমন কথা বলল কেন? কোন অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গেই কি বিয়ে হতে যাচ্ছে তার? পাশে এসে হাত ধরে ওর চলার গতি মন্থর করতে চেষ্টা করল, তারপরেই উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন, দেয়ালির দিনে তোমার কিছু ব্যাপার আছে নাকি—ও-রকম করে বললে কেন?

হাসি মুখেই ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল, হাতটাত ধোর না, কারো চোখে পড়ে গেলে খুব মুশকিল—

—দেয়ালির দিনে তোমার বিয়ে?

হাসছে।—বিয়ে আর বলি এক হল?···ওই উৎসবের রাতে ঠিক হবে বলি কে নেবে। এই যাঃ, তোমার যে মুর্ছা মুখ হয়ে গেল দেখছি! আবার একপ্রস্থ হাসল মজা করতে গিয়ে তোমাকে ভয় পাইয়ে দিলাম—নিশ্চিন্ত থাকো, তিতলিকে বলি দিতে পারে এমন মানুষ পিরথিবীতে

নেই। হল?

আবার দ্রুত পা চালালো। সঙ্গ নিয়ে শাওন জিগ্যেস করেছে, কাল কখন দেখা হচ্ছে?

—কাল দেখা হচ্ছে না।

—পরশু?

—পরশুর কথা আজ কি করে বলব?

শাওনের দু'চোখ ওর মুখের ওপর থমকালো।—তোমার মতলবখানা কি? কি ব্যাপার আমাকে বলছ না কেন?

···তিতলি দাঁড়িয়ে গেছল। ঠোঁটে হাসি, চোখে চোখ। গুণগুণ করে গেয়ে উঠল, 'শাওন আয়ে তো তিতলি ছুঁপে···'।

বলে আর হাঁটা নয়, হাসতে হাসতে একেবারে ছুট।

তারপর চোদ্দ পনেরো দিন কেটেছে, তিতলির দেখা নেই। সাইটে না, পুনপুর দিকে না, জঙ্গলের দিকেও না। মনে হয় বিয়েই কি হয়েছে, কিন্তু ওর মেয়ে-বস্তির উপমাটা শাওন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার চোখের সামনে একটা অজানা আশংকার ছায়া দুলছে।

দেয়ালির আগের দিন বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে শাওন জনার্দন পূজারীর ডেরার দিকে চলল। ওই লোকটাকে একটুও পছন্দ করে না, তবু মন উতলা বলেই চলল। সীতা আর লছমীর সঙ্গে তিতলির খুব ভাব, ওর খবর তাদের জানা থাকাই সম্ভব।

দাওয়া থেকে সীতা আর লছমী তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। শাওনের মনে হল দু'জনেরই মুখ বিষণ্ণ। তাকে ভিতরে আসতে বলল।

—তোমাদের বাবা বাড়ি নেই?

লছমী জানালো বাবা এ-সময় বাড়ি থাকে না।

শাওন তবু ভিতরে গিয়ে বসল না। বলল, তিতলির সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না, তাই খবর নিতে এসেছিলাম সে কেমন আছে···তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় তো?

দু'জনেই মাথা নাড়ল, দেখা হয় না। তারপর গলা খাটো করে সীতা

বলল, তিতলি দশদিন আগে এসেছিল, তারপর আর আসেনি। এরপর যা বলল, শুনে শাওনের চক্ষুস্থির।

—বাবুজী, তিতলির জন্য আমাদের খুব চিন্তা হচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা আমাদের মনে হয়েছিল কিন্তু সাহস হয়নি।...দশ দিন আগে এসে তিতলি খুব হেসেই বাতাবাতি করছিল, কিন্তু যাবার আগে হঠাৎ বলল, আর বোধহয় কারো সঙ্গে শিগ্‌গীর দেখা হচ্ছে না। কেন জিগ্যেস করতে চোখ পাকিয়ে বলল, অনেক তো দেখা হয়েছে আর কত দেখবে—তিতলির (প্রজাপতির) পরমায়ু জানো না? হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল।

—তারপর?

তার পরেরটুকু শুনে শাওনও উতলা। দশদিনের মধ্যে তার দেখা নেই। আজ সকালে তোতারামের সঙ্গে দেখা হতে সে বলল, তিতলির জীবনে মরদ মানুষ আসছে, দেখা হবে কি করে? কবে সাদী জিগ্যেস করতে তোতারাম রাগ দেখিয়ে বলল, তার আমি কি জানি, তিতলির সঙ্গে তোদের এত পেয়ার—তোরা খবর নিতে পারিস না? ওই শুনে আজই সকাল দশটার পর সীতা আর লছমী বাপুকে লুকিয়ে তিতলির ফুফু হীরা মল্লার বাড়ি গিয়েছিল।...হীরা মল্লা ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। বলেছে, তিতলিকে আজই ভোরে ভিন গাঁওয়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠানো হয়েছে, এখানে অনেক লোক মেয়েটাকে খুব জ্বালাতন করে, ওখানেই তার বিয়ে হবে আর বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। কবে বিয়ে, কোথায় বিয়ে আর তিতলি কোন গাঁয়ে গেছে জিগ্যেস করতে হীরা মল্লা রেগে গিয়ে বলেছে, সে-সব তাদের জানার দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে সীতা বলল, তিতলির ফুফু হীরা মল্লা ভালো আওরত না বাবুজী, আমাদের গণ্ডগোল লাগছে...তাছাড়া মেয়েটা প্রায়ই বলত, তিতলির পরমায়ু বেশি না, শেষ দিনও ওই কথাই বলে গেল!

না শাওনও ভেবে পাচ্ছে না কি ব্যাপার। ফিরে আসতে আসতে ভাবছিল, তিতলির আয়ু বেশি না এ-কথা একদিন ওকেও বলেছিল।

আর শেষের দিন, দেয়ালির রাতে মেয়ে বলির কথা বলছিল।...অবশ্য তারপর ওকে আশ্বাস দিয়েছিল, তিতলিকে বলি দিতে পারে এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই।

ক্যাম্পে ফিরে দেখে জল না চাইতে মেঘ। বসার ঘরে তোতারাম খোশমেজাজে বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছে। ওকে দেখেই হেসে বলল, তোমার এখানে এলেই চা-বিস্কুটের লালচ ছাড়তে পারি না দোস্ত—

—বেশ, আরো চা-বিস্কুট দিতে বলব?

—না না, তোতারামের ব্যস্ত মুখ, আমি ঠাকুর সাহেবের জরুরী আরজি নিয়ে এসেছি, এক্ষুনি ফিরতে হবে।...কাল দেয়ালির রাতে দশখানা গাঁওয়ের রইস আদমীদের নিয়ে একটা উৎসব হবে, যাদের নেওতা (নেমন্তন্ন) পাঠানো হবে কেবল সেই ক'জন ছাড়া এই উৎসবের খবর আর কেউ জানবেও না—ঠাকুর সাহেবের তুমি খুব মন-পসন্দ মানুষ, তাই দোস্ত হিসেবে তিনি তোমাকেও সঙ্গে নিতে চান, তিনি সাঁঝে এসে তোমাকে তাঁর বগ্‌গি গাড়িতে তুলে নেবেন –

শাওন ভিতরে ভিতরে তিতলির খবর শোনার জন্য উৎসুক। তবু ব্রিজমোহনের এত আগ্রহের কথা শুনে অবাক একটু। ভদ্রতার খাতিরে জিগ্যেস করল, কোথায় উৎসব?

—আমার নেওতা আছে কিনা এখনো জানি না, নেওতা না থাকলে কোথায় উৎসব জানার উপায় নেই—তবে তার জন্য ভাবনা কি, ঠাকুর সাহেব তো তোমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবেন।

শাওন সবিনয়ে বলল, ঠাকুর সাহেবকে বোলো আমি হাত-জোড় করে তাঁর কাছে মাফ চেয়েছি, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, পরে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেব...কিন্তু তোতাজী, তোমার সঙ্গে আমার একটু অন্য কথা ছিল—

ঢুলুঢুলু চোখ যতটা সম্ভব টান করে তাকালো তোতারাম। হাসছেও অল্প-অল্প। —তুমি তিতলির খবর জিগ্যেস করবে তো? ...কিন্তু তার আগে দোস্ত, এই নেওতার ব্যাপারটাই ফয়েসলা হয়ে যাক, এই উৎসবে

রইস লোকদের নেওতা দিচ্ছে হীরা মল্লা—তুমি ঠাকুর সাহেবের দোস্ত হিসেবে গেলে তোমারও তাঁর নেওতাই নেওয়া হবে···তুমি যেতে আপত্তি কোরো না—কিন্তু হনুমানজীর কসম, এই যা শুনলে তা ভাঙখোর তোতারমগঞ্জের বুলি—কেউ জানলে আমার জান চলে যাবে। আমার আর সময় নেই, কাল সাঁন্‌ঝএ রেডি থেকো—

চেয়ার ঠেলে উঠে তাড়াতাড়ি চলে গেল। ইলেকট্রিক শক্‌-খাওয়া স্থাণুর মতো বসে রইলো শাওন।···হীরা মল্লার নেওতা···তার উৎসব। ···তিতলি কি বলেছিল, কি বলেছিল তিতলি? জোরে জোরে নিজের মাথায় চুল টেনে প্রতিটি কথা হুবহু মনে করতে চেষ্টা করল। মনে পড়ল। ···তিতলি বলেছিল, দেয়ালির উৎসবে একটা মেয়ে বলি হবে, দশখানা গাঁওয়ের বড় বড় আদমীরা আসবে। ··আর বলেছিল ওই উৎসবের রাতে ঠিক হবে বলি কে নেবে।

কিন্তু শাওনের শেষ পর্যন্ত কিছুই বোধগম্য হল না, কি হতে পারে। দশ গাঁয়ের বড় বড় রইস লোকদের ডেকে তিতলির ফুফু হীরা মল্লা কি আগের কালের মতো স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছে? সব থেকে পয়সা-অলা লোকের গলায় মালা দেবে তিতলি? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? নেওতা পেয়ে ওই উৎসবে যারা যাচ্ছে তারা বেশির ভাগই জাতের মানুষ, গাঁয়ের ছোট বড় ভূস্বামী—অছুত্‌ মেয়ের তাদের কারো গলায় মালা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এটা কি বিয়ে পাকা হওয়ার মতো উৎসব কিছু—যেখানে পাঁচ সাত-খানা গ্রামের মান্যজনেরা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবে? শাওনের মনে হল খুব সম্ভব সে-রকম কিছুই হবে।···কিন্তু তাহলে সেখানে ঠাকুর ব্রিজমোহনের শাওনকে নিয়ে যাবার এত আগ্রহ কেন? মন বলছে, সে ওকে কিছু দেখাতে চায়, দেখিয়ে আক্কেল দিতে চায়, এই জন্যেই তার এত আগ্রহ।

সেই রাত আর পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি-ভাবে কাটল শাওনই জানে।

সন্ধ্যার একটু পরেই পাকা ক্যাম্প ঘরের সামনে ব্রিজমোহনের বগ্‌গি গাড়ি এসে দাঁড়ালো। শাওন প্রস্তুতই ছিল, বেরিয়ে এলো। তোতারাম নেমে এসে হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঠাকুর সাহেবের মুখোমুখি আসনে বসালো, তারপর নিজেও শাওনের পাশেই উঠে বসল। ঢ্যাঙা তোতারামের পর্যন্ত আজ বাহারী সাজ। আর ঠাকুর ব্রিজমোহনের তো কথাই নেই। সামনে বসতেই ভুর-ভুর করে আতরের গন্ধ নাকে এলো শাওনের। তার পরনে মিহি ধুতি, গায়ে মুগার জামার ওপর কলিদার কুর্তা, মাথায় শাফা (পাগড়ী), কুর্তার উপরেও আবার খুব পাতলা রেশমী চাদর, পায়ে শৌখিন নাগরা। খুশবু পানে দুই ঠোঁট টসটস করছে, চোখে যত্ন করে সুরমা টেনেছে।

বগ্‌গি গাড়ি ছুটেছে। ব্রিজমোহন অমায়িক হেসে মুখ খুলতেই বোঝা গেল সে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। আধো-আধো টানা সুরে বলল, হমারা খাতির মেহফিলমে আরহল্‌ মিস্টার ভার্মা—হম্‌ বহুত-বহুত খুশ হইলী।

শুধু ব্রিজমোহন নয়, ভালোমতো নেশা তোতারামও করেছে। বগ্‌গি গাড়ি চলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঢুলছে, আর, থেকে থেকে শাওনের গায়ের সঙ্গে তার গা ঠেকছে। শাওন ধার ঘেঁষে বসার পর তার ঢুলুনি আরো বাড়ল। ঠাকুর সাহেবের খোশবাত শুনে সে-ও মুখ খুলল। তার কথা এমনিতেই টানা-টানা।—ভারমা সা-হা-ব স-অবকো পেয়ার আদমী, আপকে নেওতাকা খাতির আইলন।

শাওন বেশ অস্বস্তি বোধ করছে কেন জানে না। গাড়িটা হীরা মল্লা অর্থাৎ অছুত পাড়ার দিকে যাচ্ছে না।···সীতা বলেছিল, তিতলিকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিজমোহনের দিকে চেয়ে সবিনয়েই বলল, আপনার নেওতা পেয়ে আমি তো খুশি হয়েই এলাম ঠাকুর সাহেব, কিন্তু উৎসব কিসের এখন পর্যন্ত তো তাই জানি না—

এধার থেকে ফস করে তোতারামের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, নথ ভাঙানিয়াকা—

সঙ্গে সঙ্গে শাওনকে চমকে দিয়ে ব্রিজমোহনের গর্জন।—খামোশ উল্লুকা পাঠ্ঠে, ফির্ আগে বাড়ত্ বাত করব তো ঘেঁড়ি পাকড়কে উতর্ দি!

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করে তার দিকে চেয়ে দু'হাত জোড় করে করুণ সুরে তোতারাম বলল, মাফি দে রহুযা, মাফি দিহ, মহারাজ কি এত্না মিঠ্ঠি নশামে মুমে বাত্ আগইল, হামারা কা কসুর···।

মহারাজ এটুকুতেই পরিতুষ্ট। শাওনের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসল একটু। বলল, জরা সবুর, এইসন মজাদার পার্টি তুম কভু না দেখত্।

ব্রিজমোহন হাসছে, দুলছে, মাঝে মাঝে দু'চোখ বুঁজে আয়েস করে পিছনে ঠেস দিয়ে যেন মজার খেয়াব দেখছে কিছু। ও-দিকে ধমক খেয়ে মুখ বন্ধ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সিটের ওপাশে হেলান দিয়ে তোতারাম ঘুমিয়েই পড়ল, একটু একটু নাক-ডাকার শব্দও কানে আসছে।

দুই মাতালের সঙ্গে শাওন কোথায় চলেছে বুঝতে পারছে না। নথ্ ভাঙানির উৎসব আবার কি? নথ বলতে তো কেবল মেয়েদের নাকের নথ জানে! সরকারী পদস্থ কর্মচারী হিসেবে তার এ-সব নেমন্তন্নে আসা ঠিক হল কি না তাও মনে আসছে। কিন্তু আনন্দ করতে নয় সে এসেছে অন্য দায়ে, আর একজনের কথা ভেবে।

চারদিকে বাজী আর আলোর রোশনাই ছাড়িয়ে বগ্গি গাড়ি এক নিরিবিলি এলাকা দিয়ে জোর ছুটেছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে গাড়িটা একটা একতলা দালানের সামনে দাঁড়ালো। অর্থাৎ কম করে পাঁচ মাইল রাস্তা পার হয়েছে তারা। ওই দালানের আশপাশে আর কোনো বাড়ি চোখে পড়ল না। গেটের সামনে আরো ছ'সাতটা বগ্গি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

নেমে গেট দিয়ে ঢোকার সময় দরোয়ানগোছের দু'জন লোক ঠাকুর ব্রিজমোহনের উদ্দেশে ঘটা করে সেলাম জানালো। ব্রিজমোহন তাদের

দিকে চেয়েও দেখল না।

বাড়িটাকে নিরিবিলি একটা বাগান বাড়ির মত মনে হচ্ছিল শাওনের। গেটের পরেই বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত ছোট রাস্তা। দু'পাশে ফুলের বাগানে নানারকম ফুল ফুটে আছে। আলোর রোশনিতে দালানের ভিতর-বার আর চারদিক দিনের মতো। ব্যস্ত এবং হাসি মুখে যে রমণীটি দাওয়ায় এসে ব্রিজমোহনকে অভ্যর্থনা জানালো, শাওনের কেন যেন মনে হল সেই হীরা মল্লা হবে। বয়েস বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ মনে হয়। এখনো সুশ্রী, দেহের কাঠামোয় যৌবনশ্রী অনুপস্থিত বলা যাবে না। একটু ঝুঁকে দু'হাত জোড় করে ব্রিজমোহনের উদ্দেশে সামান্য আনত হল, মিষ্টি অভ্যর্থনা জানালো, আহ ঠাকুর সাহাব আ-হ, সব-কোই রহুয়াকা প্রতীখ্-সাকা খাতির বৈঠল রহল।

হাসি মুখে ব্রিজমোহন দাওয়ায় উঠল। দেরিতে আসার জন্য কোন-রকম কৈফিয়ত দাখিল করল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হমারা দোস্ত শাওন ভার্মা, হম্ তোঁহারা তরফসে নেওতা ভেজি-রহুয়া কিরপা করকে আগইল···আর এ তিতলিকি ফুফু হীরা মল্লা।

শাওনের মনে হল হীরা মল্লার কটাক্ষে বিদ্যুৎ খেলে গেল একপ্রস্থ। তারপর আরো আনত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো, এ বহুৎ সৌভাগ্ হামারি, পরদেশী বাবুকা দিলো কা খবর কওন্ ন জানথ—আইয়ে আইয়ে—

সামনের বড় একটা ঘরে আলোর ফোয়ারা। চমৎকার গালচে পাতা। সেখানে, আট ন'জন ভদ্রলোক ছড়িয়ে বসে। দেখলেই বোঝা যায় এরা পয়সা-অলা মানুষ। এর মধ্যে তিনজন শাওনের পরিচিত। তারা পঞ্চের কর্তাব্যক্তি মহাদেও প্রসাদ, জগদেও মিশির। ব্রিজমোহন ভিতরে ঢুকতে ঘরের সকলেই একটু বিশেষ সম্মান দেখিয়ে হাঁটুর ওপর বসে দু'হাত জুড়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো, তারপর সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি শাওন ভার্মার দিকে।

আবার তারা গালচের ওপর বসল। একটি অল্পবয়সী মোটামুটি সুশ্রী মেয়ে গান গাইছিল। তার অদূরে বসে একজন তবলা বাজাচ্ছিল। আরো

কেউ কেউ অন্য বাজনা বাজাচ্ছিল। কিন্তু তার গানের দিকে কারো মন আছে মনে হয় না। অতিথিদের সামনে সারি-সারি ট্রে, তাতে মদের গেলাস আর পানের রেকাবি। নবাগত তিনজন বসতেও তাদের সামনে ট্রেতে করে দু'জন লোক পান আর মদের গেলাস রেখে গেল। তোতারাম সঙ্গে সঙ্গে গেলাস তুলে এক লম্বা চুমুক। আয়েসী মেজাজে ব্রিজমোহনও তার গেলাস তুলে নিল। শাওনের এ-সব চলে না। তোতারাম তার পাশেই বসে, সে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, ও যেমন আছে থাক, সময় বুঝে আমি সাবড়ে দেব।

কেন যেন এখন তাকে একটুও বে-সামাল মনে হল না শাওনের। সে আবার ঝুঁকে বলল, তোমার চেনা মুখ ছাড়া আর যাদের এখানে দেখছ, তারা সকলেই নানা গাঁওয়ের ছোট-বড় ভূ-স্বামী।

বেচারী মেয়েটা গেয়েই চলেছে। তার গানের দিকে কারো মন নেই।

হীরা মল্লা এসে ব্রিজমোহনের কানে কানে কি বলতে সে মাথা নেড়ে সায় দিল। হীরা দ্রুত ভিতরের দিকে যেতে যেতে গান করছে যে মেয়েটি তাকে কি ইশারা করে ভিতরে চলে গেল। তবলা আর বাজনা থেমে গেল, কারণ গান থামিয়ে ওই মেয়েটিও উঠে ভিতরে চলে গেল।

একটু বাদে এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরে যাকে নিয়ে ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকল, সে কে আঁচ করে শাওন স্থান-কাল ভুলে হতবাক। ঘরের অন্য সকলেও নির্বাক।

তিতলি।

মাথায় খুব লাল রেশমের ওড়নার ঘোমটা। কিন্তু এত আলোয় ঘোমটা সত্ত্বেও কে বোঝা যাচ্ছে, মুখ দেখা যাচ্ছে। কারণ গায়ে মাথায় ওই রেশমের চাদর যেমন পাতলা তেমনি স্বচ্ছ। পরনে জরির কাজ করা আকাশী রঙের বেনারসী। শাড়ি আর রেশমের চাদরের ভিতর দিয়েও অন্তর্বাসের আভাস চোখে পড়ে। আলতা-পরা পায়ে লাল ভেলভেটের চটি, আঙুলে রূপোর আঙ্গুঠা, দুই গোড়ালি ঘিরে রূপোর বিছুয়া, কোমরে কোমর-ধ্বনি, হাতে বাহুতে সোনার ঠেলা অনন্ত বিছা বাজু, দশ আঙুলে ছ'টা অঙ্গুঠা। গলায় হার কণ্ঠা হাঁসুলি, কানে বড় ঝুমকা মাথায় কানো-

লাগানে মন্‌টিকা, নাকের গোল বড় নথনির মুর্গা লাগানো চেন কানের সঙ্গে জড়ানো, মুখে হালকা অভ্রের প্রলেপ, চোখে কাজল, কপালে লাল সিঁদুরটিপ, দুই ঠোঁট হালকা লাল রঙে রাঙানো, হাতের তালুতে মেহেন্দির ফুলের ছাপ, নখে নখর-নজনি।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখার পরেও শাওন হাঁ করে চেয়ে আছে: …দু'হাত জোড় করে কারো দিকে না চেয়েই তিতলি সকলের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানালো। জানু মুড়ে পিছনে দু'পা রেখে আস্তে আস্তে বসল। এবারে অভ্যাগতদের দিকে চোখ। তারপরেই রেশমী-চাদরের আড়ালে তার দুই চোখ স্তব্ধ, বিস্ময়াহত। বিহ্বল বিভ্রান্ত চাউনি শাওনের মুখের ওপর। ব্রিজমোহন বা অন্যদেরও লক্ষ্য না করার কথা নয়। সকলের অলক্ষ্যে তোতারাম শাওনের হাঁটুতে একটু চাপ দিল। শাওন অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

এরপর হীরা মল্লা একটু ঝুঁকে অভ্যাগতদের উদ্দেশে অভিবাদন জানিয়ে খুব মিষ্টি করে তার বক্তব্য পেশ করল। …নানা গাঁও থেকে নেওতা পেয়ে এতসব মানী জনেরা এসে এই আসর রোশন করেছেন বলে সে ধন্য। শুধু মানুষ কেন, স্বর্গের দেওতারাও এ-রকম আনন্দের আসরের শরিক। তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্যেই সর্ব-কলায় বিদূষী উর্বশী-মেনকা-রম্ভার সৃষ্টি। দেবতাদের মতো মানুষও এই আনন্দের অধিকারী। সেদিকে চোখ রেখেই হীরাবাঁদী মর্ত্যের দেবতুল্য মানুষদের মনোরঞ্জন আর চিত্তবিনোদনের জন্য ওই অপ্সরাদের মতোই একটি কলাবতী রূপসী মেয়েকে এই আসরে উপস্থিত করেছে। এই আদরের মেয়েকে রাজরানীর মতো রাখার শর্তে রহুয়া মহারাজদের মধ্যে কে একে গ্রহণ করবেন সেটা তাঁরাই বিচার করুন।

আবার অভিবাদন জানিয়ে হীরা মল্লা তিতলির পাশ ঘেঁষে বসে তার রেশমী ওড়নার ঘোমটা মাথার ওপর তুলে দিল।

সকলের জোড়া-জোড়া লুব্ধ চোখ ওই মুখের ওপর অনড়। তিতলির আয়ত দু চোখ শাওনের দিকে নির্বাক ভর্ৎসনায় স্থির কয়েক পলক। বলতে চায়, এই নেকড়ের দলের আসরে সে কেন?

কে জানে কেন, শাওনের দু'চোখ এবার ঠাকুর ব্রিজমোহনের দিকে ঘুরল। তার চাউনি থেকে নেশা ছুটে গেছে, লোভের নীলচে আগুন ঠিকরোচ্ছে। সে-ও শাওনের দিকে ফিরল। হাসছে অল্প-অল্প। এমন মজা যেন আর জীবনে পায়নি।

হীরা মল্লা তিতলির কানে কি বলতে সে দু'হাত জোড় করে অভ্যাগতদের উদ্দেশে ঈষৎ মাথা নোয়ালো, তারপর হাত-দুটি জোড় করে রেখেই গান শুরু করল। তবলচি ঠেকা দিতে লাগল, অন্য বাজনাতেও সুরের ছোঁয়া লাগল।

'পাঁইয়া পড়ু ও গঙ্গা মাইয়া
নিলামওয়া হোত্ হ্যায় বিটিয়া তুঁহার
মিলা দে সাজন মেরা,
পাঁইয়া পড়ু বার বার ও মাইয়া'

গানের সুললিত সুরে এতবড় ঘরে একটা কান্না যেন গুমরে গুমরে উঠছে। সকলে নির্বাক। রাগে হীরা মল্লার মুখ লাল।

'দিল্‌বা কো খরিদার না মিলল হমার
পায়েলকা ছনছন, তবলাকা ঠুন-ঠুন
সীতারৌকে ঝুনঝুনৌয়া, ও মাইয়া
শুনে না শুনে হমার এ সাজনৌয়া,
আঁখোকা লালচ শিঙ্গারোকা খুশবু
সিক্কাকা (টাকার) ঠন্‌ঠনৌ
শুনে না বুঝে হমার এ সাজনৌয়া,
তোহি হমার লাজ রাখিও
বার বার পড়ু তেরি পাঁইয়া, ও মাইয়া।'

শাওনের বুকের ভিতরটা কাটছে, কিন্তু অনুভূতিশূন্য মূর্তির মতো বসে আছে। অভ্যাগতরা তখনো নির্বাক। এই আসরে এ-রকম গান শোনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। তিতলির দিকে একটা রুক্ষ দৃষ্টি হেনে হীরা মল্লা ঈষৎ ঝুঁকে সুন্দর করে আবার অভ্যাগতদের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করতে গেল, তোমাদের মধ্যে যে রুহুয়ার সেবা

করার জন্য আমার এই মেয়ে প্রস্তুত, ভিতরে সে কত ধরমশীলা তা মনে রাখার জন্যেই—

মুখের কথা থেমে গেল। হীরা মল্লার বিস্ফারিত দু'চোখ এত বড় ঘরের দরজার বাইরের দিকে। ঘরে আলোর ফোয়ারা তাই প্রথমে চোখ পড়েনি। দরজার বাইরে একটি লোক দাঁড়িয়ে, রোগা পাকানো লম্বা দেহ, রুক্ষ ফর্সা মুখ, অভ্যাগতদের মতোই সাজ-পোশাক। তার পিছনে দু'জন বন্দুক-ধারী লোক। হীরা মল্লার অমন বিহ্বল বিভ্রান্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে সকলেরই জোড়া-জোড়া চোখ এবার বাইরের দিকে। পর মুহূর্তে তারাও যেন মোহাবিষ্ট। দেখেও কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না এই মানুষ এখানে। সক্কলের থেকে হতবাক বোধহয় ঠাকুর ব্রিজমোহন।

তোতারামের আঙুলের খোঁচা খেয়ে শাওনের চমক ভাঙল। কানের কাছে মুখ এনে সে ফিসফিস করে জানান দিল, লোহার গাঁওর ঠাকুর কুন্দন সিং।

এই প্রবল শক্তিমান ভূস্বামীটির কথা শাওন অনেক শুনেছে বটে।

আত্মস্থ হয়ে হীরা মল্লা দরজার দিকে ছুটল। তারপর রাজা বাদশাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার মতো করে ঘরে নিয়ে এলো। বিড়বিড় করে হয়তো নিজের সৌভাগ্যের কথাই বলছে। কুন্দন সিং ঘরে এসে দাঁড়াতে সচকিত হয়ে সক্কলে অভিনন্দন জানালো তাকে। ব্রিজমোহনও। তার মুখে আর হাসি নেই এখন। বিবর্ণ।

কুন্দন সিং আসরে ব্রিজমোহনের পাশে বসল। ম্যাড়মেড়ে দু'চোখ তিতলির মুখের ওপর অপলক। নিষ্প্রাণ মুখে তিতলিও চেয়ে চেয়ে তাকেই দেখছে।

কুন্দন সিং-এর দৃষ্টি এবারে অন্য সকলের দিকে ঘুরল। কারা এসেছে দেখে নিচ্ছে। শাওন ভার্মাকে দেখে চাউনি থমকালো একটু। মাথা নিচু করে ব্রিজমোহনকে জিগ্যেস করল, এ কওন?

ব্রিজমোহন শুকনো চাপা গলায় জানান দিল, খঁনিয়াকা এনজিনিয়ার শাওন ভার্মা···ক্যাম্প ইন-চার্জ।

কুন্দন সিং ঘাড় ফিরিয়ে তাকে আর এক দফা দেখে নিল।

হীরা মল্লা নিজের হাতে কুন্দন সিংয়ের জন্য পানপাত্র নিয়ে এলো। তার চোখে মুখে একটু ভয়ের ছায়া, আবার লোভের জেল্লাও। হাতের ইশারায় কুন্দন সিং পানপাত্র নিয়ে যেতে বলল, এ-সবের দরকার নেই—

হীরা মল্লা প্রস্তাব করল, রহুয়াকা খাতির আওর এক গীত ফরমাই?

কুন্দন সিং-এর ঠাণ্ডা জবাব, বাহারোঁসে গীত শুনলী, বহুত দর্দ্‌ভরি আওয়াজ।

তার দৃষ্টি আবার তিতলির মুখের ওপর। শাওনের মনে হল লোকটার অভিব্যক্তিশূন্য চাউনি নিস্পৃহ হতে পারে আবার ভয়ংকর নিষ্ঠুরও হতে পারে।

সকলের উদ্দেশে হাত জোড় করে হীরা মল্লা বলল, তব রহুয়া লোগনকা হুকুমসে আসর চালু হৈ···।

আসরের সবাই নড়েচড়ে বসল। আবার শাওনের দিকে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে কুন্দন সিং এই প্রথম যেন তোতারামকে দেখল। গম্ভীর কিন্তু গলার স্বরে সামান্য বিস্ময়ের আভাস। বলল, আরে তোতা তু-হি হিয়াঁ! তো পহেলে, তু মুখোল্‌।

আদেশ পেয়ে তোতারাম টান হয়ে বসল। জিভে করে একবার ঠোঁট ঘষে নিয়ে ঘোষণা করল, পান্‌শ' রুপয়া—!

হীরা মল্লার চোখে আর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। মন্তব্য করল, বহুত সুন্দর মিটিয়াকা পুরুয়া মিলব—

ব্রিজমোহন আর কুন্দন সিং ছাড়া আর সকলের মুখে চাপা হাসি। ও-দিক থেকে আর একজন দর হাঁকল, হাজার রুপয়া—

—দো হাজার···

—দো হাজার পাঁন শ'

দর হাঁকা কর্তব্য বোধেই একে একে এরা মুখ খুলছে। কেবল ব্রিজমোহন আর কুন্দন সিং ছাড়া। শাওন ভার্মা রক্তশূন্য মুখে স্থাণুর মতো বসে আছে। এখন গোটা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে।

—তিন হাজার!

—তিন হাজার পাঁনশ!

—চার হাজার।

—পাঁচ হাজার!

—ছে হাজার!

শেষের এই দরটা দিল, ব্রিজমোহনের অনুগত বন্ধু মহাদেও প্রসাদ। এরা সকলেই জানত তিতলি শেষ পর্যন্ত কার দখলে যাবে। কিন্তু কুন্দন সিং এই আসরে এসে উপস্থিত হতে সবই কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তিতলিকে দেখে পাওয়ার লোভ সকলেরই, কিন্তু পাবে না এ-ও জানে বলেই ছ' হাজার পর্যন্ত দর তুলে চুপ সকলে।

…ব্রিজমোহন হীরা মল্লাকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছিল, নথ ভাঙানির আসরে যে দামই উঠুক—সে তাকে দশ হাজার টাকা গুণে দেবে, আর তিতলিকে রানীর হালেই রাখবে। কিন্তু সব অনিশ্চিত হয়ে গেল এই একটা লোক আসাতে।…হার্টের রোগ, ষাটের দিকে বয়েস গড়াচ্ছে—তার এমন লোভ হতে পারে কেউ কল্পনাও করেনি। গোঁ ভরে ব্রিজমোহন প্রতিশ্রুতিরও ঢের বেশি দর হেঁকে বসল। —পন্‌র হাজার।

দর দিয়েই ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত একটু। এই লোকটা ধূর্ত অতি, পনেরো হাজার টাকা দর তুলে সকলের সামনে তাকে বোকা বানিয়ে হয়তো চলে যাবে।

ঠাণ্ডা গলায় কুন্দন সিং বলল, তিশ হাজার।

ব্যাস, এই এক দরেই নিলাম শেষ, নথ্-ভাঙানির আসর শেষ। কুন্দন সিংকে সকলে, এক কথার মানুষ বলে জানে। এর ওপর দর চড়ানোর মুরোদ কারো নেই। তিরিশ হাজারই কল্পনার বাইরে। কিন্তু ব্রিজমোহনের মনের যে অবস্থা, এত দিনের বাসনার যে ব্যর্থ দংশন—তার ইচ্ছে করছিল তিরিশের ওপরে পঞ্চাশ হাজার হেঁকে বসতে। কিন্তু কুন্দন সিং তিরিশের উপর আর এক টাকাও হয়তো বাড়বে না। এরপর ব্রিজমোহনকে কেবল এক নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত করে রাখবে। সেটাই আসল ভয় নয়। রীতি অনুযায়ী যে-দর উঠল তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ সকলের সামনে এই আসরে আগাম দিয়ে যেতে হবে, পঞ্চাশ হাজার দর হাঁকলে এক্ষুনি দশ হাজার টাকা ব্রিজমোহনের সঙ্গে নেই। থাকলেও

তিতলিকে গ্রহণের দিনে বাকি চল্লিশ হাজার টাকা সত্যি দেওয়া হল কিনা বা কোনরকম কারচুপি করা হল কিনা সেটা যে-ভাবে হোক কুন্দন সিং যাচাই করে নেবেই। আসল কথা যত আগুনই মাথায় জ্বলুক, পঞ্চাশ হাজার ছেড়ে তিরিশ হাজারই তার স্বপ্নের বাইরে।

হার মানা বা হাল ছাড়ার রীতি হল দু'হাত জোড় করে প্রতিপক্ষকে নমস্কার জানানো।

মাথা নেড়ে নমস্কার গ্রহণ করে কুন্দন সিং পকেট থেকে একতাড়া নোটের বটুয়া বার করে হীরার সামনে গালচের ওপর ছুঁড়ে দিল।—ছে হাজার, গিন্ লে···

তার যেন জানাই ছিল তিরিশ হাজারে এই কেনা বেচার ফয়েসলা হবে, তাই তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছ' হাজার পকেটে মজুত।

টাকার থলেটা তুলে নিয়ে হীরা মল্লা আ-ভূমি নত হয়ে তাকে কুর্নিশ জানালো। ব্রিজমোহনের মুখের দিকে তাকাতে তার অস্বস্তি, কিন্তু দশ হাজারের জায়গায় তিরিশ হাজার টাকা পাওয়ার আনন্দই বা সে গোপন করে কি করে?

নথ্-ভাঙানির আসল উৎসবের দিন এরপর কুন্দন সিংই ঠিক করবে। সেই উৎসব তার কোন কুঠিতে হবে। সেই দিন বাকি লেন-দেন শেষ হলে তিতলিকে তার এই মালিকের হেপাজতে চলে যেতে হবে।

কুন্দন সিং উঠে দাঁড়ালো। তার সম্মানে হোক বা আসর শেষ বলেই হোক অন্য সব অভ্যাগতরাও কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছে। কুন্দন সিং-এর দু'চোখ আবার তিতলির মুখের ওপর। অন্য সকলেরও, একমাত্র শাওন ভার্মার বাদে। তার রক্তে আগুন জ্বলছে, এমন এক জঘন্য বাসনার বেসাতি তাকে চোখের সামনে বসে দেখতে হল, এখন সেই রাগ। তিতলির দিকে না চেয়ে তার নতুন মালিক কুন্দন সিংকেই দেখছে। যৌবনের আগুনে বার্ধক্যের লোভকে ধ্বংস করার শক্তি কারো কি আছে? শাওন ভার্মার নেই।

···আবার এ-ও দেখছে, এই বেসাতির আসরে অনায়াসে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও কেবল ওই লোকটারই দু'চোখের দৃষ্টি এখনো ভাবলেশশূন্য।

উঠে দাঁড়ানোর পরেও অন্যদের জোড়া-জোড়া লুব্ধ চোখ অপরের পণ্য লেহন করছে। কুন্দন সিং-এর যেন ওই জীবন্ত পণ্যের মালিক হবার পর এটুকুও ববদাস্ত করার ইচ্ছে নেই। রোগা লোকটার গলার স্বর শুধু ভারী নয়, রাশভারী। হীরা মল্লার দিকে চেয়ে হুকুম করল, ছোঁড়ীকে অন্দরমে লে যা!

হীরা মল্লা শশব্যস্তে বাহু ধরতেই তিতলি উঠে দাঁড়ালো। আর কারো দিকে নয়, যাবার আগে একবার শুধু শাওনের দিকে তাকালো। শাওন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

কুন্দন সিং কি এটুকুও লক্ষ্য করেছে? শাওন ঘাড় ফেরাতেই তার চোখে চোখ।

সবার আগে ধীর পায়ে কুন্দন সিংই ঘর ছেড়ে বেরুলো। অন্য সকলে তার পিছনে পিছনে চলল। ঘরে কেবল শাওন, তোতারাম আর একটু দূরে ব্রিজমোহন দাঁড়িয়ে। তার ফর্সা মুখে আগুন লেগে আছে। নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শাওন দেখল, কুন্দন সিং তেমনি ধীর পায়ে গেটের দিকে চলেছে। তার পিছনে দুই সশস্ত্র বরবন্দাজ, তাদের পিছনে অন্য অভ্যাগতরা। গেটের সামনে একটাই সেকেলে মোটর গাড়ি। মালিককে দেখে একজন শশব্যস্তে দরজা খুলে দিল। মালিক উঠে মাঝে বসল। তার দু'দিক থেকে দুই সহচর উঠে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। আওয়াজ তুলে গাড়ি চোখের আড়ালে।

...গাড়িটা যখন এসে এই গেটের সামনে থেমে ছিল তখনো নিশ্চয় শব্দ হয়েছিল। এখানে এই ঘরের সকলে তখন ওই রূপের জীবন্ত বেসাতিকে নিয়ে তন্ময়।...আর শাওন ভার্মা তখনো স্পষ্ট করে না বোঝায় বিস্ময়ে তলিয়ে যাচ্ছিল, তিতলির ওই গানের করুণ আর্তিতে বুকের তলায় মোচড় পড়ছিল। তাই ওই মোটর গাড়ি এসে থামার শব্দ তার বা কারো কানে আসেনি।

অন্যেরা যে-যার বগ্‌গি গাড়িতে উঠে রওনা দিল।

তোতারাম ক্যাল ফ্যাল করে যে-দিকে চেয়ে আছে, ঘুরে দাঁড়াতে

শাওনেরও সেই দিকেই চোখ গেল। মস্ত ঘরের একেবারে উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে। দু'হাত জোড় করে হীরা মল্লা ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আর অস্ফুট স্বরে বলছে কিছু।···ঠাকুর ব্রিজমোহন অপলক কঠিন চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

ওই লোকের গাড়িতেই আবার এতটা পথ ফিরতে হবে ভেবেও শাওনের ভিতরটা বিদ্রোহ করছে। পায়ে পায়ে তোতারামের পাশে দাঁড়ালো। তোতারামের নিষ্প্রাণ দু'চোখ হীরা মল্লার দিকে। মনিব না নড়লে সে নড়ে কি করে। কিন্তু পাশে এসে কে দাঁড়ালো খেয়াল করেছে। প্রায় ফিস ফিস করে টানা গলায় মন্তব্য করল, এই কুঠিয়া আর কুঠিয়ার দুই পাহারাদার। ওই ঠাকুর সাহেবের···শেরের ঘরে এসে আর এক শের তার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেল···আওরত সেয়ানী কত দেখো দোস্ত, ভয়ে সিঁটকে গেছে ভাব দেখাচ্ছে, কিন্তু খুব ভালো করেই জানে লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং এখন তার পিছনে—দুনিয়া ফুঁঃ!

পাথর মূর্তি ব্রিজমোহন ঘুরে দাঁড়াতে সে ব্যস্ত মুখে দরজার দিকে চলল।

তিনজনে আবার সেই বগ্‌গি গাড়িতে। শাওন আর তোতারাম একদিকে, উল্টো দিকে ব্রিজমোহন। ফাঁকা রাস্তায় বগ্‌গি গাড়ি জোরে ছুটেছে। শাওন ঘড়ি দেখল। রাত ন'টাও নয় এখন।···গাড়ির ঝাঁকুনিতে ব্রিজমোহনের পাথরের মূর্তির মতো দেহটা উঠছে, নামছে।

নেশা উবে গেছে। খানিক বাদে বরফ-কাটা ছুরির মতো তার গলা শোনা গেল।--কুন্দন সিংকে নেওতা কওন্ দিহল?

তোতারাম নড়েচড়ে সোজা হল। ফিরে বোকা-বোকা গলায় প্রশ্ন করল,···হীরা নহী!

ব্রিজমোহন মাথা নাড়ল। অর্থাৎ না।—হীরা শিউজীকা কসম খা-কে কহলী ও নহী। তু পতা লে কওন···।

—জি সরকার···।

আবছা অন্ধকারে শাওনের দু'চোখ দিয়ে ব্রিজমোহনের মুখের ওপর

ঘৃণা ঠিকরে বেরুচ্ছে।···ব্রিজমোহন প্রৌঢ়। সে তুলনায় প্রায় বৃদ্ধ একজন তার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। তবু এ-লোকটার দিকে চেয়ে আর তার ক্ষোভ দেখে উৎকট রকমের আনন্দ হচ্ছে শাওনের।

তিতলিও এই লোকটাকে ঘৃণা করত। নিজের অদৃষ্ট সে জানত। সেই অদৃষ্ট হঠাৎ অন্যের হাতে চলে গেল বলে তারও কি আনন্দ হচ্ছে? থাক, তিতলির কথা শাওন আর ভাববে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে এবারে তোতারাম নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, মালিক হামারা মনোয়ামে এক গম্ভীর চিন্তা আওত্ রহল···।

ব্রিজমোহন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে সে উঠে গিয়ে তার পাশে বসল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে দু'চারটে কথা মাত্র বলল।

শাওনের মনে হল তার উপস্থিতির কারণেই গম্ভীর আলোচনাটা আপাতত স্থগিত থাকল। গাড়ির ভিতরের আবছা আলোয় ব্রিজমোহনের বেড়ালের মতো দু'চোখ তার মুখের ওপর স্থির একটু। কেন এমন সমাদরে ওই আসরে তাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা আর শাওনের কাছে একটুও অস্পষ্ট নয়।···যে মেয়ের সঙ্গে এক বছর ধরে এত ভাব-সাব, সেই মেয়ে শেষ পর্যন্ত কার ভোগে যায় সেটা দেখাবার লোভ ওই বীর পুরুষের হতেই পারে। এমন বে-ইজ্জত হবার ফলে শাওনও এখন তার দু'চোখের বিষ বইকি।

রাত্রি।

···তিতলির কথা শাওন আর ভাববে না, চিন্তা করবে না। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই মেয়েই বার বার চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। নেই নেই, তিতলি নেই, তিতলি নামে একটা মেয়ে তার জীবনে মৃত। সম্পূর্ণ মৃত।

তবু সেই মৃত মেয়ে জীবন্ত হয়ে বার বার তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

শাওনের চোখে ঘুম নেই। বাইরে আজ সে-রকম খোলাখুলি বাতাসও নেই। বাতাস না থাকলে মশার উপদ্রব। পা থেকে নাকের নিচ পর্যন্ত একটা পাতলা চাদর টেনে আর একটা রুমালে কপাল থেকে

নাকের ডগা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না, ঘুমনোর চেষ্টাও নেই। সভ্য দেশে এমন এক ইতর প্রবৃত্তির উৎসব কল্পনা করতে পারে না। ভিতরটা সব থেকে বেশি বিষিয়ে ছিল তিতলির ওপর। সে তার এই ভাগ্য জানত, জেনেও বিদ্রোহ করেনি। কেবল মুখে বলেছে তিতলি বেশিদিন বাঁচে না, প্রজাপতির পরমায়ু কম। সে এই মৃত্যুর কথা বলেছিল, দেয়ালির রাতে এই মেয়ে বলির কথা বলেছিল।··কিন্তু একই সঙ্গে কিছু একটা আশংকার ছায়াও শাওনের মনের ওপর দুলছে। সেটা বুদ্ধির গোচরে আনতে না পারার অস্বস্তি। নিবিষ্ট মনে ভাবতে চেষ্টা করল, অস্বস্তিটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে চেষ্টা করল।···তিতলি দেয়ালির রাতে মেয়ে বলির কথা বলেছিল, আবার শাওনকে ঘাবড়ে যেতে দেখে সেই মুখেই আবার জোর দিয়ে বলেছিল, নিশ্চিন্ত থাকো, তিতলিকে বলি দিতে পারে এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই—হল ?

···বলি তো এক-রকম হয়েই গেল তাহলে এ-কথার অর্থ কি ?

আবার কি মনে পড়তে সচকিত।···নদীর ধারে বসে তিতলি একদিন বলেছিল, পুনপু হল আমার গঙ্গা-মাই—আজ তিন বছর ধরে এই মা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আবার আজও নথ-ভাঙানির আসরে এই গঙ্গা-মাইয়ের কাছেই তার করুণ সমর্পণ, তোহি হমার লাজ রাখিও, বার বার পড়ু তেরি-পাইয়া, ও মাইয়া। মনের ওপর অজানার আশংকার ছায়াটা আরো ঘন কালো হয়ে উঠছে। নিশ্চল শুয়ে আছে, কিন্তু একটা অস্থিরতা তাকে ছেঁকে ধরছে।

বাইরের দেয়াল-ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল। অর্থাৎ রাত এখন একটা।

শাওনের দু'কান উৎকর্ণ। বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ির শব্দ কানে

এলো মনে হল। শোনার ভুল ··এত রাতে এখানে আবার গাড়ি কোথা থেকে আসবে। ততক্ষণে শাওনের একটু তন্দ্রার মতো এসেছে। চোখ ভারি। একবার তাকিয়ে আবার চোখ বুঝল। বাইরে দরজার আড়ালে একটা লণ্ঠন ডিম-করা, ঘর প্রায় অন্ধকার।

মেয়ে-গলার আচমকা আর্তনাদে মধ্য রাতের নীরবতা খান-খান। কিছু বোঝার আগে পরের মুহূর্তে কেউ তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল।
—এ তু কা করলী পরদেশীবাবু—কা করলী / উঠ্‌ বাবু উঠ্‌, হম তোঁহার জহর পি লিব—তোকে বিছড় যা নেহী দিব!

বলতে বলতে প্রায় অন্ধকারে দুই বাহুতে তাকে আঁকড়ে ধরে নিজের অধরের জোরে শাওনের ঠোঁট-দাঁত ফাঁক করে যেন জিভ থেকে গলা থেকে পেট থেকে কিছু বার করে নেওয়ার চেষ্টায় মরীয়া হয়ে উঠল কোনো উন্মাদিনী।

শাওন দু'হাতে তাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেও পারছে না, সে প্রাণপণে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে, ঠোঁট দিয়ে মুখ দিয়ে জিভ দিয়ে দেহের অভ্যন্তর থেকে বিষ টেনে বার করে নিতে চেষ্টা করছে।

আলো বাড়িয়ে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকল, তোতারাম।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তিতলি আর্তনাদের সুরে বলে উঠল, তু উঠ্‌ যা পরদেশীবাবু—উঠ্‌! কসম খাকে কহতি তোঁহার তিত্‌লিকা ইজ্জতমে কভু না দাগ লাগব—কভু না—কভু না!

তারপরেই দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। লণ্ঠনের আলোয় ওই লোকের হতবাক মূর্তি। তিতলিকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল। ঠিক দেখছে কিনা তিতলির এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। ঝুঁকে নাকটা প্রায় শাওনের মুখে ঠেকিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে শুঁকল। তার গালে চোখে দুহাত বুলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল একটা সুস্থ মানুষকেই দেখছে কিনা।

শাওনও স্থান-কাল ভুলে চেয়ে আছে। তিতলির পরনে এখনো নথ-ভাঙানির উৎসবের পোশাক। একটু এলোমেলো হয়েছে কেবল। ভেবে পাচ্ছে না যা দেখছে ঠিক কি না। বিমূঢ়ের মতো জিগ্যেস করল, কি

ব্যাপার, এত রাতে তোমরা এখানে ?

তিতলি সরে বসতেও ভুলেছে। তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

—তুমি জহর খাওনি ?

শাওনের স্নায়ুতে এখনো কিছু ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসছে না।

—জ-হ-র···বিষ···আমি বিষ খেয়েছি !

লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে খুব গম্ভীর টানা সুরে এবারে তোতারাম জানান দিল, নথ-ভাঙানির আসর থেকে ফেরার সময় তোমার মুখ দেখে মনে হল তুমি নিশ্চয় জহর খাবে, তোমাকে ক্যাম্পে ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর ব্রিজমোহনকে এ-কথা বলতে রহুঁয়া গম্ভীর চিন্তিত মে কহলী, তোতা তু তুরন্ত যাইকে তিতলিকে লে আয়ে, দেখ্, পেয়ারকা এইসন পরিণাম না দেখল্—হায় রাম, হায় রাম ! মালিকের কথা শুনে তার বগ্‌গি গাড়ি নিয়ে আমি ছুটে চলে গেলাম। তুমি জহর খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ শুনে তিতলি পাগলের মতো ছুটে চলে এলো, আসার সময় আমাকে বার বার বলল, ডাগদার শ্রীবাস্তবকে তার কুঁঠিয়া থেকে তুলে নিতে, আমি বললাম পরদেশীবাবু এতক্ষণে মূর্দা হয়ে গেছে কিনা গিয়ে দেখি, তারপর যা-হয় করব। ঢুলু-ঢুলু দু'চোখ টান করে তোতারাম বড় নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু তাজ্জব কা বাত্, এসে দেখছি এখন পর্যন্ত তুমি জহর খাওনি····।

রাত একটার সময় এমন নাটকের জন্য কে প্রস্তুত থাকতে পারে ? শাওন হাঁ করে তোতারামের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু পরের মুহূর্তের নাটক আরো ভয়াবহ। তিতলি শয্যা থেকে আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েছে। তোতারামের দিকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। রক্তবর্ণ মুখ, হিংস্র চাউনি। পরক্ষণে বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল।—শয়তান—বদমাস ! তোঁহার জিহ্বা হম্ টানত করকে ছিঁড় দেইবু, কট্‌রাসে তোঁহার আঁখ নিকাল লে আইবু !

তোতারাম ওকে এগিয়ে আসতে দেখেই সাবধান হয়েছে। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রাণের দায়ে বাধা দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পেরে উঠছে না, মুখে কয়েকটা আঁচড় চাপড় পড়েইছে, কিন্তু তিতলি সত্যিই দু'হাতের

দশ আঙুল দিয়ে ওর চোখের নাগাল পেতে চেষ্টা করছে। তোতারাম বাধা দিচ্ছে আর চিৎকার করছে, এ বাবুজী বচাও—বচাও!

পিছন থেকে শাওন তিতলিকে এক-রকম জাপটে ধরেই টেনে নিয়ে এলো। তা-ও কি সহজে পারে, হাত ছাড়িয়ে আবার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আক্রোশ। জোর করে ওকে খাটে বসিয়ে দিয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, আঃ, বোসো চুপ করে! রতন জেগে উঠলে বা শোরগোল শুনে ও-দিকের ক্যাম্প থেকে লোকজন ছুটে এলে ভালো হবে?

তিতলির তেমনি রক্তবর্ণ মুখ, হিসহিস করে বলে উঠল, বাবুসাহেব আমার জন্য আমি ভাবি না, কিন্তু ওই শয়তান ব্রিজমোহনের সঙ্গে ষড় করে তোমার কি সর্বনাশ করেছে তুমি জানো না!

ছাড়া পেয়ে তোতারাম মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে। টানা করুণ সুরে বলল, দোস্ত্, তুমি সব শুনে বিচার করো—আমি দোষ করেছি মনে হলে সামনের সাইটে অনেক গাড্ডা আছে, আমাকে একেবারে জিন্দা পুঁতে রেখে এসো। ব্রিজমোহন আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে বটে, কিন্তু আমি যে বিপদের ভয়ে তিতলিকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছি, ব্রিজমোহন তার কিছুই জানে না—

খানিকটা ফারাকে শাওনও শয্যায় বসল। উত্তেজনায় সে-ও শ্রান্ত। ভ্রূকুটি করে বলল, কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো!

তোতারামের আবার ঢুলু ঢুলু চোখ, টানা-টানা কথা।—হীরার ওখান থেকে ফিন্ আমরা যখন বগ্‌গি গাড়িতে উঠি, তুমি হাত-ঘড়ি দেখেছিলে দোস্ত···তখন রাত ন'টাও নয়—ঠিক?

প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝেও শাওন মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ফিন যখন বগ্‌গি গাড়ি নিয়ে ওই আমি কুঁঠিয়ামে গেছি তখন রাত আন্দাজ সাড়ে বারো। আর এখনো দেখো, তিতলি সেই নথ ভাঙানির সাজ পরে বসে আছে—ও ছৌড়ীকে পুঁছো কাঁহে?

তিতলি ঝলসে উঠল, হমারি খুশি!

—আচ্ছা দোস্ত ধীরসে শুনো। তোতারামের কথাগুলো আরো মোলায়েম, আরো টানা-টানা।—ওতনা রাঁতোমে আমি ফিন্ গিয়ে

দেখলাম, কুঠিয়াকা দো পাহারাদার নশাকা নিঁদমে বেহুঁশ, অন্দরে গিয়ে দেখলাম, শরাব খেয়ে হীরা মল্লা ওই আসরের ঘরেই মেঝেতে পড়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে, আর ও কবুতরীকে পুঁছো—নথ-ভাঙানির খুঁশিয়া রাতে সে-ই তার ফুফুকে পিয়ার করে শরাব খাইয়েছিল কিনা, আর পাহারাওলা দুটোকেও তার ভাগ দিয়েছিল কিনা—আওর ভি পুঁছো বাবু, ভিখুয়া-কা মায়ের থেকে নিদ্‌কা দাওয়াই এনে শরাবের সঙ্গে মিশিয়ে তাই ফুফুকে আর সিপাই দুটোকে খাইয়েছিল কিনা ?

তিতলি ধড়ফড করে উঠে দাঁড়ালো।—হম চল্‌লী !

তোতারাম হাসল।—শোচ্‌ বাবু, অব ও ছৌড়ী চার মিল রাস্তা পার হোনেকে লিয়ে খাড়া হুইল !

হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে শাওন বলল, পাগলামো কোরো না ! তোতারামের দিকে ফিরল, কি ব্যাপার, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না !

—কুছ্‌ না বুঝল ? আচ্ছা আগে হমার বাত্‌ শুনো।···হীরা মল্লা বেহুঁশ, দুই পাহারাদারভি বেহুঁশ, কিন্তু তিতলি তখন কুঠিয়াব কোত্থাও নেই ! তিন মিনিট বগ্‌গি গাড়ি ছোটাইকে ওকে রাস্তায় ধবলাম। পুনপুর বাস্তায়··· । ওকে বললাম, পরদেশীবাবু ঘবে ফিরেই জহর খেয়েছে—এতক্ষণে বোধহয় অন্তিম দশা হুইলী—আব্‌ ছৌড়ীকো পুঁছো দোস্ত, তিনজনকে শরাব খাইয়ে বেহুঁশ করে এত রাতে পুনপুর দিকে ও কেন যাচ্ছিল···

শাওন বিভ্রান্তের মতো তাকেই জিগ্যেস করল, কেন যাচ্ছিলে ?

—গঙ্গা মাঁইয়াকি আঁচরোঁয়ামে (আঁচলে) শুতল খাতিরা। অনেক দিন ওর মুখে শুনেছি, তিতলির পরমায়ু বেশি না, অনেকদিন শুনেছি ওই পুনপু ওর মা আজ আসরের গানেও পুনপু মা-কে বলছিল, তোহি হমার লাজ রাখিও।···কহ দোস্ত, তোমার আত্মহত্যার কথা বলে তিতলিকে খুদখুশি থেকে বাঁচিয়ে আমি কি খুব বুরা কাম করেছি ?

দু'চোখ টান করে শাওন তিতলির দিকে তাকালো।···ওরা আসার আগের মুহূর্তের সেই আশংকার কালো ছায়াটা আব দুর্বোধ্য নয়, একটুও

অস্পষ্ট নয়। তার আতঙ্কগ্রস্ত দুই চোখ যেন কিছু একটু দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল। উঠে তাড়াতাড়ি তিতলির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, তিতলি—তিতলি এ তুমি কি করতে যাচ্ছিলে—কেন কেন তুমি আমাকে কিছু বলোনি—আমি ভাবতাম—আমি যা-হোক কিছু ব্যবস্থা করতাম—

তোতারামের এখনকার মুখ দেখলে মনে হবে, সন্ধ্যার নেশার পরে আবার সে ভাং চড়িয়ে এসেছে। ঝিমুনো গলায় বলল, এক্ষুনি ভাবো, এক্ষুনি ব্যবস্থা করো—সকালের কউয়া ডাকার পরে তোমার আর কিছু করার থাকবে না—

শাওনের হাত ছাড়িয়ে তিতলি উঠে দাঁড়ালো, তোতারামের মুখের ওপর এক-ঝলক আগুন ছিটিয়ে বলে উঠল, গঙ্গা-মাইকা কসম বাবুজী, তুমি এরমধ্যে থেকো না, কুন্দন সিং কি ভীষণ লোক তুমি জানো না, আমাকে এখন যেতে দাও—

শাওন বলল, কালকের মধ্যে আমি ভেবে চিন্তে যা হয় করব, দরকার হলে আমি ছ'হাজার টাকা নিয়ে কুন্দন সিং-এর সঙ্গেই দেখা করব, তুমি আর দেরি না করে তোমার ফুফুর কাছেই ফিরে যাও—

তোতারাম টেনে টেনে হেসে উঠল। হাসিটা কুৎসিত মনে হল শাওনের। কিন্তু পরের কথাগুলো কানের পর্দা ছিঁড়ে মগজে ঘা পড়ার মতো।—নথ-ভাঙানির আসরে কুন্দন সিংয়ের কেনা ছৌঁড়ী নিঝুম রাতে তোমার এখানে আসার পর তার ফেরার মতো সিরিফ তিন জায়গা আছে দোস্ত—এক. গিধরকা হাবেলী, কোটেকা নিশানা (ব্রিজমোহনের ঘর, বা বেশ্যা বাড়ির পথে)—নাইতো পুনপুকি আঁচরোঁয়া—তিতলি কোন্ দিকে যাবে জিগ্যেস করো—

তিতলির আবারো ওই তোতারামের ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে। শাওন শক্ত করে তার হাত ধরে ফেলেছে। তোতারামের কথা কেন যেন আর অবিশ্বাস হচ্ছে না। জিগ্যেস করল. তিতলি যদি এই রাতের মতো তার ফুফুর কাছে ফিরে যায়, কুন্দন সিং জানছে কি করে?

তোতারামের নির্লিপ্ত জবাব, শিকার ছুটে গেল বলে ঠাকুর ব্রিজমোহন

রাগে আর অপমানে তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—লেকিন ও তোহার দোস্ত না আছে—আওর হামভি ও-মালিককা চেলা ঠেরে—

অর্থাৎ তিতলি এই রাতে আবার তার ফুফুর কাছে ফিরে গেলে তোতারাম আর ব্রিজমোহনের কাছ থেকেই কুন্দন সিং সব জানতে পারবে।

আবার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে তিতলি হিসহিস করে বলে উঠল, বাবুজী আমাকে ছেড়ে দাও—আমি ওকে খুন করে গঙ্গা-মাইয়ার আঁচরোঁয়ামে শুতল যাই—

তুহাতে ওর তু'হাত ধরে রেখে শাওন বেশ জোরেই একটা ঝাঁকুনি দিল।—তিতলি, এই তোমার হাত ধরে আমি কসম খেয়ে বলছি, তুমি আত্মহত্যা করলে পরদিনই তোমার আত্মা দেখবে আমিও আত্মহত্যা করেছি—আমার কথার নড়চড় হবে না, বুঝতে পারছ ?

আরক্ত ক্রুদ্ধ মুখে মুহূর্তে ত্রাসের ছায়া নেমে এলো।—না, বাবুজী, না না—।

—সাবাস! মোড়ার ওপরে-বসা তোতারাম তুলে তুলে তারিফ করল। ঝিমুনি চোখ শাওনের মুখের ওপর টান করে বলল, এখন এই ইজ্জতের সওয়াল করার মতো হিম্মত থাকে তো ঠাণ্ডা হয়ে বসে তোতাবুলি শোনো—আপাতত কাউকেই তোমাদের খুদখুশি করতে হবে না—সব ব্যবস্থা পাক্কি করে তিতলিকে এখানে তোমার আত্মহত্যার নাম করে ধরে আনতে আমার চার ঘন্টি সময় লেগেছে—

ওর মুখে এই কথা শুনে শাওন শুধু নয়, তিতলি পর্যন্ত থমকে তাকিয়েছে।

টিমে-তালে তার মতলবের সার কথা, পেয়ারের ইজ্জত রাখতে এই রাতের মধ্যে ওদের বিয়ে করতে হবে। বিয়ে দেবে টিকাটি পণ্ডিত—সেই ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। তার বাড়িতেই কিষণজীর মন্দিরে বিয়ে হবে। কিষণজী ছুত অছুত মানে না, তাই সেও মানে না। অছুত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে একমাত্র টিকাটি পণ্ডিত ছাড়া গাঁয়ে আর কে দেবে। দশ ছেলে-মেয়ের বাপ ভোজনলোভী টিকাটি পণ্ডিত অছুতদের কাজ করে তাদের

ছোঁয়া খায় বলে এখানকার উঁচু সমাজে সে-ও অছুত। কিন্তু খবরদার, সে যেন জানতে না পারে কুন্দন সিংয়ের কেনা মেয়ের সঙ্গে এই বিয়ে হচ্ছে। সে কেবল জেনেছে, ঠাকুর ব্রিজমোহনের ইচ্ছেয় এই বিয়ে, তাই খুশি হয়ে রাজি হয়েছে। বিয়ে যে হয়েছে তার সাক্ষীও দরকার, দেয়ালির রাতে সে-রকম সাক্ষীও সহজে জুটেছে।...বিয়ের পরেই তিতলিকে নিয়ে শাওন যে কুঠিয়াতে চলে যাবে সেটা মাসাউরি গাঁও, এখান থেকে ছ'সাত মাইল দূরে। তাই বগ্‌গি গাড়িতে হবে না, দোস্তকে চুপচাপ তার জিপ-গাড়ি বার করতে হবে, তাহলে বিয়ের পরে তিতলিকে মাসাউরির কুঠিয়াতে রেখে দোস্ত সকাল হবার আগেই ক্যাম্পে ফিরে আসতে পারবে, তারপর দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে সে মাসাউরিতে গিয়ে গা-ঢাকা দেবে। সেখানেই ওদের সোহাগ-রাত হবে—।

তিতলি বলে উঠল, না না, ওর কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না বাবুজী, মাসাউরি কুন্দন সিংয়ের লোহার গাঁও থেকে মাত্র পাঁচ-ছ'মাইল দূরে, কুন্দন সিং ওই গাঁয়েরও মাতব্বর—ওরা সক্কলে মিলে তোমাকে ভীষণ বিপদে ফেলবে!

—বুদ্ধিসে চিন্তা করত তিতলি।...লোহার গাঁওয়ে কুঠিয়া মিললে আরো ভালো হত, কুন্দন সিং ভাবতেও পারবে না তুই মাসাউরিতে আছিস—এ-সব বাতাবাতিতে আর দেরি করলে সব...

—বাবুজী বাবুজী তোমার পায়ে পড়ি আমার জন্য তুমি এ ঝুঁকি নিও না, আমি ওদের কাউকে বিশ্বাস করি না!

মোড়া থেকে তোতারাম শিথিল দেহটা টেনে তুলল, তব্ হম্ চলথ—

—দাঁড়াও! শাওনের মাথায় একটাই সংকল্প এঁটে বসেছে। তিতলিকে বলল, শোনো, আর তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না, মরতে হলে দু'জনে একসঙ্গে মরব। তোতারামের দিকে ফিরল, তিতলিকে মাসাউরিতে রেখে ফিরে এলে তখন কোনরকম গণ্ডগোল হবে না তার বিশ্বাস কি?

—তোমরা সেখানকার কুঠিয়াতে গেলেই দেখবে দু'জন পাহারাদার বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে—তাছাড়া তুমি কয়েক ঘণ্টার জন্যে চলে এলে

বিয়ের সাক্ষীদের একজন তিতলির সঙ্গে থাকবে—তার জান থাকতে তিতলির কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

শিকার হাত-ছাড়া হবার ফলে রাগ আর গোঁ-এর বশে ব্রিজমোহন পাহারাদারের ব্যবস্থা করতেও পারে—কিন্তু শাওনের অনুপস্থিতিতে তিতলিকে এমন কে আগলাবে যে জানের পরোয়া করে না! শাওন জিগ্যেস করল, সেই সাক্ষী কে···কোনো আওরত?

তোতারাম খুব বিরক্ত।—না তো কি, কোনো মরদকে আমি ওকে আঁগলাবার জন্য রেখে যাব! শোনো তাহলে, সেই সাক্ষী চুনীলাল মাস্টারজীকা লেড়কি দুলারী—সাদীর সময় তোমরা ওকে না দেখতে পেলে আমার মুখে জুত্তি মেরে চলে এসো।

শাওন যত না, তার চার গুণ তাজ্জব তিতলি। দুলারী বহ্ন ওকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু তা বলে সে এতটা ঝুঁকি নেবে! কোথা থেকে একটু ক্ষীণ আশাও মনের তলায় উকিঝুঁকি দিল।···শুনেছিল, নিষ্ঠুর কুন্দন সিংয়ের মতো লোকও দুলারীকে স্নেহ করে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওই মেয়ের বিয়ে দিযেছিল—যদিও সবাই বলে চুনীলাল মাস্টারের ওপর রাগ করেই এক পাগল ছেলের সঙ্গে বিয়েটা দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু দুলারী বহন নিজেই তা স্বীকার করে না—বলে তার ভাগ্যেই পাগল স্বামী জুটেছে—আর সেই স্বামী না থাকলেও মাঝে মাঝে সে তার ভিটে আর ক্ষেতি দেখাশুনা করতে যায়।

না, এখন পর্যন্ত তোতারাম মিথ্যে বলেনি।···তিতলিকে নিয়ে বেরিয়ে এসে বগ্‌গি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তোতারাম দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। একটু বাদে শাওন নিজেই ড্রাইভ করে এসে তাদের জিপে তুলে নিল। তার পাশে তোতারাম, তিতলি পিছনে। সাত আট মিনিটের মধ্যে তোতারামের নির্দেশে জিপ যেখানে দাঁড়ালো সেটাই চুনীলাল মাস্টারের বাড়ি। হর্ন বাজাতে হল না, জীপ থামার আওয়াজ পেয়েই একটা টিনের বাক্স হাতে দুলারী বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগালো, তারপর তোতারামের ইশারায় সে জিপের পিছনে উঠে বসল। এবারে কোন পথে যেতে হবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তোতারাম জানালো,

তোমার নসিব ভালো, দেয়ালির ছুটিতে দুলারীর বাপ পাটনায় গেছে, সে ফিরে এসে জানবে খামখেয়ালী মেয়ে লোহার গাঁওয়ে তার মরদের বাড়ি গেছে—দুলারী ওই রকমই চিঠি লিখে রেখে এসেছে।

আবছা অন্ধকারে শাওন খুব ভালো করে ঠাওর করতে পারেনি। তার মনে হয়েছে একটু খাটোর উপর মোটাসোটা মিষ্টি চেহারার একটি রমণী। এর আর তোতারামের বিয়ে নাকচের গল্প শাওন তিতলির মুখে শুনেছিল।···শুনেছিল, তোতারাম এখনো ওই মহিলাকে তার পেয়ারের আওরত ভাবে, আর দুলারী রেগে গেলে তাকে দূর-দূর করে তাড়ায়, আবার দরকার পড়লে ডেকে ওকে নোকরের মতো খাটায়। শাওন মুখ বুঁজে জিপ চালাচ্ছে, আর মনে মনে অবাক হচ্ছে, এই লোকের অনুরোধে ওই রমণী এ-ভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে!

আরো মিনিট পাঁচ-সাত বাদে তোতারামের কথায় জিপ থামিয়ে শাওন অবাক। গজ পনেরো দূরে সীতা-লছমী, অর্থাৎ জনার্দন পূজারীর ডেরা। কিছু জিগ্যেস করার ফুরসত না দিয়ে তোতারাম নেমে সেই দিকে চলল। তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। মিনিট তিন-চারের মধ্যে আবার বেরিয়ে এলো। তার হাতে মস্ত বড় একটা ঝুড়ির মতো কি। আর পিছনে আসছে দুটি মেয়ে—একজন সীতা, অন্য জন লছমী। পিছনে ঝুড়ি রেখে আর ওই দু'জনকে তুলে দিয়ে তোতারাম জিপে উঠে আবার পাশে বসল।—এবার এই রাস্তায় চলো···টিকাটি পণ্ডিতের বাড়ি। তোমার বিয়ের তিন সাক্ষী রেডি, বিয়ের পরের পুরী জিলাবী লাড্ডু রেডি—কিন্তু টিকাটি পণ্ডিত শুধু ওতে খুশি হবে না—তোমার পকেটে টাকা আছে তো?

নগদ হাজার দেড়েক টাকা ঘরে ছিল, শাওন সবই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। মাথা নাড়ল, আছে। তারপর জিগ্যেস করল, এদের নিয়ে এলে, জনার্দন পূজারী বাড়ি নেই?

—দেয়ালির রাতে ভাঙ চড়িয়ে নিদ্-এর বিরিজ দিয়ে সে এখন বেহ্স্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তুমি সীতা আর লছমীর সঙ্গে কথা বলে আগেই সব ঠিক করে

গেছলে? তোমার কথা শুনে ওরাও এই বিয়েতে সাক্ষী থাকতে রাজি হল?

—জরুর! তোতার সব কাজ পাক্কিকাজ···। তার পরেই আফসোসের সুরে বলল, কেবল নিজের বেয়ার আগে একটা কাচ্চি কাজ করে ফেলে ও শ্বশুরাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে সব বরবাদ করে দিয়েছিলাম। নসিব খারাপ হলে যা হয় আর কি।

হাসির কথা। কিন্তু জিপ চালাতে চালাতে শাওন অন্য কিছু ভাবছে। ···সীতা আর লছমী তিতলিকে খুব ভালবাসে। তার বিপদের কথা শুনলে সীতার মতো সাহসী মেয়ে এই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেও পারে। তাছাড়া, শাওনের প্রতিও ওদের দু'বোনের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এক বাপ ছাড়া ওদের সকলেরই ধারণা, পাটনার বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে লছমীকে সময়ে অপারেশন করিয়ে শাওনই তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। কিন্তু শাওনের দুর্বোধ্য লাগছে এই একটা লোককে। তোতারামকে।··· জানে, এই লোকটা ব্রিজমোহনের চেলা, মো-সায়েব, তার নেক-নজরের ওপর তার জীবিকা আর জীবন নির্ভর, আজও যা করছে, ওই মালিকের মর্জি বুঝেই করছে। তবু, বার বার মনে হচ্ছে এই একটা লোককে তার এখনো ঠিক-ঠিক চেনা বা বোঝা হয়নি।

টিকিধারী টিকাটি পণ্ডিতের চেহারাখানা দর্শনীয় বটে। বেঁটে, পেল্লায়, মোটা, মিশ কালো গায়ের রং। রাত তখন আড়াইটে। তার আড়াই গণ্ডা ছেলে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। কেবল গৃহিণী জেগে। ব্যবস্থা সব রেডিই ছিল। তার সেই ব্যবস্থা দেখে বোঝা যায় দায়-ঠেকা বিয়ে দিয়ে সে বেশ অভ্যস্ত। ছেলের পরার পট্টবস্ত্র পর্যন্ত তার হেপাজতে থাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বর-কনেকে বিয়ের আসনে বসিয়ে দিল। বিয়ে শুরু হবার একটু বাদেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সকলেই চমকে উঠল। দুলারীর হাতে কাঠের টুকরোয় বাঁধা একটা ম্যাগনেশিয়াম তার জ্বলে উঠল। তারপর বিয়ের আসর দিনের মতো সাদা। সেই আলোয় তোতা একটা বক্স ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। বর কনের উদ্দেশে বলল, ইস্‌মাইল পিলিজ!

বলার সঙ্গে সঙ্গে ফোটো তোলা শেষ।—থ্যাংকু!

টিকাটি পণ্ডিতের ফরমূলা অনুযায়ী এক ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে শেষ। কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানও বাদ গেল না। তাকে খুশি করে সকলকে তাড়াহুড়োর মধ্যে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে তোতারাম সকলকে নিয়ে আবার জিপে উঠল। তিতলিকে এবারে সামনে শাওনের পাশে বসানো হল। শাওনের পরনে আবার প্যান্ট শার্ট, কিন্তু দু'জনের কোমরেই লাল রেশমী চাদরের গাঁটছড়া বাঁধা। রাত সাড়ে তিনটের সময় কে আর দেখছে। তাছাড়া তিতলির মুখ ঘোমটায় ঢাকা। মাঝের ক্যাম্বিসের পর্দাটা এখন তোলা। নিশুতি রাতে জিপ মাসাউরির পথে ছুটেছে। একটা বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু এমন বিয়ে, যে উত্তেজনায় কারো মুখে কথা নেই।

মিনিট দশেক বাদে পিছনে হঠাৎ একটু হাসির শব্দ শুনে শাওন একবার ঘুরে তাকালো। লছমী বলল, তোতাচাচা ঘুমিয়ে পড়েছিল, দুলারী বহিনী বলল, তাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যেতে—

শাওন আবার সামনের দিকে মুখ ফেরালেও তোতারামের ঘুম-জড়ানো টানা-টানা জবাব কানে এলো। —বেয়ার আগেই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে—আর কতবার ধাক্কা মারবে।

সকলের সঙ্গে তিতলিও হেসে উঠলে শাওন খুশি হত। কিন্তু ও কাঠ হয়ে বসে আছে। আসলে সকলেরই টান-ধরা স্নায়ু শিথিল করার চেষ্টা।

আধ-ঘণ্টার আগেই পৌঁছে গেল। রাত তখন চারটে। ফটকের ও-ধারে সত্যি দু'জন পাহারাদার মাচিয়ায় বসেই ঘুমোচ্ছে। জিপের হর্ন কানে যেতে তারা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। একজন ফটক খুলে দিল। তারপর তারা হ্যাজাক দুটো জ্বেলে দিতে দেখা গেল, বাংলোর মতো সুন্দর পাকা দালান। এক-তলা। বড় বড় তিনটে ঘর। চারদিকে জমি, বাগান, গাছ-গাছড়া। একবার দেখে নিয়ে শাওন ভাবল, ব্রিজমোহন তার মিত্র আদৌ নয়, কিন্তু প্রতিশোধের আগুন মাথায় জ্বলছে বলেই আজ সে ওর আর তিতলির জন্য এ-রকম ব্যবস্থা করেছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ফেরার তাড়া। দুলারী থাকবে। বাকী সকলকে নিয়ে ভোরের আগেই শাওনকে ছুপায় ফিরতে হবে। সীতা আর লছমীকে সকলের অগোচরে তাদের ঘরে ছেড়ে দিয়ে তারপর নিজের ভাবনা।

…দিন কতকের ছুটি নিতেই হবে। এটুকু সময়ের মধ্যে ছুপা থেকে পাটনায় গিয়ে মুরুব্বি প্রকাশ দীক্ষিতকে সব বলে আসা সম্ভব নয়। আপাতত যত নিরাপদই মনে হোক, তিতলির জন্য মনে দুশ্চিন্তা আছেই।…একটা চিঠি লিখে কাউকে পাটনায় প্রকাশ দীক্ষিতের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে ছুটির দরখাস্তও। বেলা দশটা এগারোটার মধ্যেই আবাব এখানে ফিরে আসতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু তিতলির জন্যেই আরো পনেরো মিনিটের মতো দেরি হয়ে গেল। সীতা বলল, পরদেশীবাবু, তিতলি তোমাকে কিছুতে যেতে দেবে না বলছে, তার ভয়, ব্রিজমোহন সকালের মধ্যেই ঠাকুর কুন্দন সিংয়ের কাছে খবর পৌঁছে দেবে, হয়তো এই রাতেই সে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে…তা যদি হয়, তাহলে পরদেশীবাবুর বিপদ কেউ রুখতে পারবে না…তাকে সে এখন কিছুতে যেতে দেবে না।

তোতারাম কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাধা দিল দুলারী। এই মেয়ে-লোকটির কলজের জোর আর বিবেচনা দেখল শাওন ভার্মা। দেশোয়ালি ভাষায় ধমকের সুরে সে বলে উঠল, আমাদের ওপর তোর ভরসা নেই—শিউজীর ওপর তোর বিশ্বাস নেই? ঠাকুর কুন্দন সিং বুদ্ধু না ব্রিজমোহনের মতো চুহা? দিন কয়েকের মধ্যে সবাই সব কিছু জানবে। আমরা এতজন তোর বেয়ার সাক্ষী—তোর মরদের কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে আমরা চুপ করে বসে থাকব কিনা সেটা সে জানে না? ঠাকুর কুন্দন সিং-এর হিংসা পশুরাজ সিংহের হিংসার মতো—ব্রিজমোহনের মতো গিধরের (শেয়ালের) হিংসা নয়—বুঝলি? ঠাকুর কুন্দন সিং-কে আমি অনেকদিন ধরে জানি। সে বোকার মতো এক্ষুনি কিছু করবে না তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। সীতার দিকে তাকালো, পথে যেতে যেতে তুই বরং ওই বকরীকে (তোতারামকে দেখিয়ে) সাবধান করে দিস, সে যেন ব্রিজমোহনের মেজাজের খবর রাখে।

এরপর আর কোনো কথা উঠল না। দুলারী আর তিতলিকে রেখে সকলকে নিয়ে শাওন চলে গেল। এরই মধ্যে তিতলিকে আড়ালে ডেকে বলে গেল, আমরা দু'জনে তো একসঙ্গে মরতে প্রস্তুত, তুমি মনে কোনো

ভয় রেখো না।

তিতলি বেপরোয়া মেয়ে। তার চোখে শাওন কখনো জল দেখেনি। এখনো জল না দেখুক দু'চোখ ছলছল, আর বাধা দিল না বলল, শিউজীর কিঁরপা থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে—তুমি যাও, যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো।

ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় বারোটা। ওপরঅলাকে চিঠি লেখা আর সহকারীকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার ফাঁকে বেলা গড়িয়ে গেছে। একলা ফেরেনি, তোতারামও সঙ্গে এসেছে। ঘরে পা দিয়েই সে তিতলিকে একটা খোশ খবর শোনালো। গত রাতে নথ-ভাঙানির আসরের পরে লোহার গাঁওয়ে ফেরার পথেই ঠাকুর কুন্দন সিংয়ের তবিয়ত খারাপ হয়েছে। সেই হার্টের বেমারি। বেশি নয় অবশ্য। তবু লোহার গাঁওয়ের ডাগদার রহুয়াকে বিস্তারায় শুইয়ে দিয়েছে, আর বড় ডাগদারের খোঁজে পাটনায়ও লোক গেছে। এখানে আসার খানিক আগে লোহার গাঁওয়ের দু'জন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হতে তারা এই খবর দিয়েছে।

তিতলির পরনে এখন আটপৌরে বেশবাস। বাড়তি কিছু শাড়ি জামা হয়তো টিনের তোরঙ্গে দুলারীই নিয়ে এসেছিল। এই বেশেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ছোট ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তিতলি লক্ষ্য করল শাওনেরও একটু নিশ্চিন্ত মুখ। কিন্তু সকলেই সচকিত দুলারীর ধমকের গলা শুনে। তোতারামকে বলে উঠল, এ বিছুয়া (বিচ্ছু) এ বাত্ তু ঠিক কহল না ধোঁকা দিহল ?

তোতারামের একটু ঘাবড়ে যাওয়া মুখ।—বাত্ তো ঠিক, লেকিন রহুয়া লোগঁনকা বেমারি প্রচারেঁমে কভু কমতি না রহে—সচমুচ হালত হম্ কা জানে,···

দুলারী আবার একটু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থেকে গম্ভীর মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল। হালছাড়া মুখে তোতারামও সে-দিকে চলল। একটানে ঘোমটা খসিয়ে তিতলি জিগ্যেস করল, ও সত্যি কথা বলছে ?

শাওন জবাব দিল, মনে তো হয় সত্যি, মিথ্যে বলে ওর কি লাভ। তিতলিকে দেখছে। কাল নথ-ভাঙানির আসরের শুরু থেকে ওর ওপর

দিয়ে ধকল যাচ্ছে। তার ঢের আগে থেকে মানসিক ধকল তো ছিলই। গত রাতেও যে মেয়ে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত, নিঃশব্দে তার স্নায়ুর ওপর দিয়ে কি ঝড় গেছে শাওন আঁচ করতে পারে। শুকনো মুখখানা শ্রান্ত করুণ অথচ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। হেসে হাল্কা সুরে বলল, তোমাকে বালকের আসরে কিনে ফেলার পর বুড়োর দিল্‌এ বোধহয় একটু বেশি রসের দোলা লেগেছিল, সেটা আর সামলে উঠতে পারেনি···তুমি আমাকে পাষণ্ড ভাবতে পারো, কিন্তু আমাদের বরাত ভালো হলে এমন লোভের পাপে ব্যাটা এবার শ্মশান যাত্রাও করতে পারে।

তিতলি তার দিকেই চেয়ে আছে। একটু বিমনা। মাথা নাড়ল।—কিষণজী কাকে রাখবে কাকে নেবে সেটা তার বিচার···কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা হলেও ওই ব্রিজমোহন তোমার এক নম্বর দুশমন হয়ে উঠবে—ওই কুন্দন সিংয়ের ভয়ে তার অত্যাচার কিছু বন্ধ হয়েছিল···এরপর সকলের সে হাতে মাথা কাটবে।

ওর ভয় কাটাবার জন্যেই শাওন গোঁ ভবে জোর দিয়ে বলল, তোমার কিষণজী চাইলে এই বড় কাঁটা যদি সরে তো তার দয়ায় ছোট কাঁটাও সরবে। আমরা দু'জনেই মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত যখন, তুমি মনে আর কোন রকম ভয় রেখো না—তোমার কিষণজী কি করে দেখই না—

আয়ত দু'চোখ তার মুখের ওপর অপলক খানিক।—আমি নিজের জন্য কখনো ভয় করিনি···এখন আমার ভয় কেবল তোমার জন্য···।

শাওন চুপচাপ চেয়ে রইলো একটু। তারপরেই কিছু মনে হতে নিশ্চিন্ত মুখ। —দাঁড়াও, আমার কথা যদি শোনো তাহলে আমার জন্যেও তোমার মনে আর কোনো ভয় থাকবে না—

তিতলি উৎসুক।—কি ?

—রোসো বলছি, কেউ যেন না জানতে পারে—। ব্যস্ত মুখে এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা ভালো করে টেনে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে পালঙ্কে ওর পাশ ঘেঁষে বসল। —চলো, এই চিন্তা ভাবনা ছেড়ে এক্ষুনি আমরা পালাই—

তিতলি আরো অবাক। —কোথায়···কি করে ?

—এখানেই আর এই করে।

পলকের অবকাশ না দিয়ে ত্ব'হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের ওপর টেনে নিল। চুমুতে চুমুতে আদরে সোহাগে একেবারে অস্থির করে তুলল। তিতলির হাঁসফাঁস দশা, ছাড়াতে চেষ্টা করতে গিয়ে বুকের ওপর মানুষটার আরো বাড়তি ভারে শুয়ে পড়তে হল। ফলে হামলার সুবিধে আরো বাড়ল। তারপরেই মুখ তুলে শাওন গম্ভীর ধমকের সুরে বলল, তাহলে হবে না, তোমার কিষণজী হঠাৎ মনের ভিতরে বলল, আমার থেকেও অনেক বেশি জোরে তুমি যদি আমাকে তোমার বুকে আঁকড়ে ধরে থাকো—তাহলে কেউ আর আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কথাগুলোতে এমন জাদু আছে শাওনও কি ভাবতে পেরেছে। তার দখলের ওই মেয়ের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল একবার অনুভব করেছে। তারপর ত্বই বাহুতে প্রাণপণে তাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে।

খানিক বাদে হেসে তাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে বলল, তুমি খুব ত্বষ্টু, দেওতার নাম করে কক্ষনো ও-রকম বলবে না—হট যাও—তোতা চাচাকে বিশ্বাস আছে? দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তে পারে।

শাওন হাসতে হাসতে উঠে সরে বসল। বলল, বন্ধ দরজা ঠেলে ঢুকলে তোমার তোতাচাচাও আমার হাতে খুন হয়ে যাবে।

...ত্ব'জনেই লক্ষ্য করছে সেই থেকেই ত্বলারী বেশ গম্ভীর। বিকেলের দিকে তোতারাম বলল, চলি দোস্ত, আবার কবে দেখা হবে জানি না—

তিতলির থেকেও শাওন বেশি অবাক। —সে কি, তুমি তো দিন-কতক এখন আমাদের সঙ্গে থাকবে বলে এলে?

তোতারাম তার স্বভাবসুলভ টানা গলায় বলল, সেইরকমই তো ইচ্ছে ছিল দোস্ত...কিন্তু কি করব, আমি হুকুমের গোলাম, হুকুম হল আজই যেতে হবে—যাচ্ছি।

এরই মধ্যে কার হুকুম হল না বুঝে শাওন আর তিতলি ত্ব'জনেই ত্বলারীর দিকে তাকালো। নির্লিপ্ত মুখে ত্বলারী বলল, ওর যাওয়া দরকার—

ছোট-খাটো দেখতে এই মিষ্টি চেহারার মেয়ের এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে, যার কথার ওপর আর জোর চলে না। যাবার আগে নিস্পৃহ গলায় তোতারাম বলে গেল, কিছুদিন তোমরা এখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, মনে ডর-ভয় না রেখে আনন্দ করতে পারো।

···এই লোকও মিত্র নয়। কুন্দন সিংয়ের মতো না হোক, আর একজন প্রবল শত্রুরই কেনা মানুষ। হুকুম হলে চরম ক্ষতি এর হাত দিয়েও হতে পারে। তবু লোকটা চলে যেতে শাওনের মনে হল সে যেন একটু কম-জোরি হয়ে গেল।

···রাতের স্বর্গ-রচনা দু'জনেই নিবিড় নিশ্ছিদ্র করে তুলতে চায়। কোনো ফাঁক দিয়ে কোন-রকম ভাবনা চিন্তার কালো ছায়া ঢুকতে দিতে চায় না। তিতলি জোর দিয়ে বলে, কিষণজী কক্ষনো দু'জনের এই আনন্দ বরবাদ করে দেবে না, তাদের দুঃখের আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারবে না—কক্ষনো—না। শাওন সঙ্গে সঙ্গে ওর কথায় সায় দেয়, ডবল সাহস দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই স্বর্গ সুখের মধ্যেও অদৃশ্য একটা খড়্গ ঝুলছেই, এ-চিন্তা থেকে নিজেদের তারা মুক্ত করবে কি করে? তিতলি ভাবে কখন না ওই খড়্গ শাওনের ওপর নেমে আসে, আর শাওন ভাবে কখন না ওটা নেমে এসে তিতলিকে রক্তাক্ত করে দেয়।

কি মনে হতে হালকা সুরে শাওন জিগ্যেস করল, তিতলির পরমায়ু কম এ আর তোমার মনে হয় না তো?

ঠোঁট উল্টে তিতলি জবাব দিল, মনে না হওয়ায় কি আছে, তিতলির পরমায়ু আর বেশি কবে হয়···।

বিষণ্ন মুখ করে শাওন বলল, তা বটে, শাওনের পরমায়ুই বা আর কতটুকু, মাত্র দু'মাস···

তিতলি থমকে তাকালো, কিন্তু সে জব্দ হবার মেয়ে নয়। হেসে বলল, দু'মাস হলেও সে ঘুরে ফিরে প্রত্যেক বছরেই আবার আসে।

—এক তিতলি গেলে আবার অন্য তিতলিও তো আসে।

খিলখিল হাসি।—তুমি অন্য তিতলি ধোরো একটা।

—আমি কি করে ধরব। এই শাওন গেলে সে তো আর আসে না,

অন্য শাওন আসে!

সঙ্গে সঙ্গে বিষম রাগ, দেখো বাবুজী, ভালো হবে না বলছি!

এবারে শাওনের মুখে হা-হা হাসি।—তুমি কি এখনো আমাকে বাবুজীই বলবে নাকি?

এ-রকম ভুল তিতলি আগেও বার কয়েক করেছে। করে হেসেছে। কিন্তু এখনো রেগেই আছে।—তাহলে কি বলব?

—কেন শাওন বলবে।

রাগ গিয়ে আবার হাসি। গুণ গুণ করে গেয়ে উঠল, 'যব্ শাওন্ আয়ে তো তিত্‌লি ছুঁপে...'।

হেসে উঠে শাওন ওকে দুই বাহুতে বেঁধে জবাব দিল, এই শাওন এলে তিতলি ধরা দেয় দেখতেই তো পাচ্ছ।

এমন আনন্দের মধ্যেও অদৃশ্য ওই খড়্গ মাথার ওপর ঝুলছেই—এ দু'জনের কেউ ভুলতে পারে না।

চার পাঁচ দিন হয়ে গেল দুলারীর মুখে হাসি নেই। চুপচাপ, বিষণ্ণ। অথচ বড় বোনের মতোই ওদের দেখাশুনা করছে, নিজের হাতে বেঁধে-বেড়ে খাওয়াচ্ছে। তিতলি বার কয়েক তাকে জিগ্যেস করেছে, বহিনী, তোমার কি হয়েছে আমাকে বলছ না কেন?

দুলারী মাথা নাড়ে। ছোট্ট জবাব, কিছু না—এখন আর আমার দিকে তাকাতে হবে না, নিজের মরদকে ছাখ।

কিন্তু তারপরের এক বিকেল থেকে তাকে বেশ খুশি মেজাজে দেখা গেল। তিতলির সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করল। শাওনের জন্য কি মিঠাই বানাবে বলে তাকে ডাকতে তিতলি অবাক হয়ে বলল, আমি তোমাদের রসুই-ঘরে যাব কি! তাই শুনে দুলারী মারমুখী, এখন তুই ব্রাভন হয়ে গেছিস, আর কেউ তোকে অছুত বললে আমি তাকে লকড়ি নিয়ে মারতে যাব—

তার কথা শুনে শাওনও হাসছিল। তিতলিও হাসি মুখেই বলল, দুলারী বহিনী, চার দিন বাদ, তোমার খুশি মুখ দেখলাম আর মিঠা বাত শুনলাম, মনে হচ্ছে যেন কোনো ভালো খবর পেয়েছ—

হালকা ঠেসের সুরে দুলারী বলল, পেলেও তোরা জানবি কি করে,

বিকেল পর্যন্ত তো দরজা বন্ধ করে ঘুমোলি।

দুলারী তিতলির থেকে বয়সে কম করে দশ এগারো বছরের বড়, শ্রদ্ধার পাত্রী। কিন্তু মুখ খুললে এমনি মুখরা। তিতলিও সমান তালে জবাব দিল, তেমন ভালো খবর থাকলে দরজা নিশ্চয় বন্ধ থাকত না, তোমার ভালো খবর বলতে আমি কেবল তোমার মরদের ঘরে ফেরা বুঝি।

এবারে নির্লিপ্ত মুখে দুলারী জবাব দিল, সে-ই এসেছিল, মোটামুটি ভালো খবর দিয়ে চুপায় চলে গেল।

শাওন অবাক, আর তিতলি হাঁ খানিক।—তুমি কার কথা বলছ বহিনী—আমি তো তোমার আপনা আদমীর ফেরার কথা বললাম।

দুলারীর চোখে মুখে পলকা রাগ।—তোর সাহস তো কম নয় ছোঁড়ী, আপনা আদমী না তো কি আমি পরের আদমীকে নিজের মরদ বলব!

তিতলির বুদ্ধির ধার কম নয়, কিন্তু এ-কথার পরেও সে হতভম্বের মতো চেয়ে রইলো। শাওন চুপ করে থাকতে পারল না। দুলারী তার থেকেও বছর দুই আড়াই বড় হবে। বলল, দিদি এতকাল বাদে ওই মানুষ ফিরে এলো আর তুমি তাকে যেতে দিলে, আমাদের একবার ডাকলেও না!

দুলারীর হাসি-চাপা বিরক্ত মুখ।—তোমাদের সবে বিয়ে হয়েছে ভাই-সাব তাই চার-পাঁচ দিনকেও এতকাল ভাবছ। তিতলির দিকে ফিরল, তেমনি ধমকের সুরেই বলে উঠল, হাঁ করে চেয়ে আছিস কি, পুনপুর জলে ডুবে মরতে গেছলি, সেখান থেকে তোকে ভাঁওতা দিয়ে ভাই সাহেবের কাছে নিয়ে এলো, তারপর আমাকে আর সীতা-লছমীকে তুলে এনে টিকাটি পণ্ডিতের বাড়িতে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোদের বিয়ে দিল—সেই লোক আমার আপনার আদমী না হলে রাত দুপুরে তার কথায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এখানে এসে পাঁচদিন ধরে তোদের পাহারা দিচ্ছি? আর এত-সবের পরেও আমার আপনার আদমীকে তোদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?

হাসি চাপা অসম্ভব হয়ে উঠতে সে দ্রুত রসুই ঘরের দিকে চলে গেল। শাওন আর তিতলি দু'জনে দু'জনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। তারপরেই তিতলি রসুই ঘরের দিকে ছুটল।

মিনিট পনেরো বিশ পরে খুব হাসতে হাসতে ফিরে এলো। জানালো,

ছুপার তোতারামই লোহার গাঁওয়ের রামভরোসা—দুলারী বহিনীর দিওয়ানা ঘর-ছাড়া মরদ তোতাচাচা। চুনীলাল মাস্টার বিয়ে বন্ধ করে দিতে দুলারী বহিনী লোহার গাঁওয়ে পালিয়ে যায়, পরে তোতাচাচা যেতে কুন্দন সিং দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দেয়। তারপর মরদের নামে এ-রকম না রটিয়ে উপায় কি? চুনীলাল মাস্টার ব্যোমভোলানাথ আদমী না হলে এতদিনে সব ফাঁস হয়ে যেত, বাপেরই যখন সন্দেহ হয়নি তখন এমন সন্দেহ আর কে করবে? মাঝখান থেকে গাঁয়ের লোক এখন শুধু ভাবছে তোতাচাচার সঙ্গে দুলারী বহিনীর তলায় তলায় বেশ রসের কারবার চলছে।···তোতাচাচাকে লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের কাছে পাঠিয়েছিল দুলারী বহিনী, এবারে আবার বুকের বেমারি হতে সে নাকি বলেছে, এ-সব আর গোপন রাখার দরকার নেই, চুনীলাল মাস্টারকে সে ডেকে পাঠিয়েছে—নিজেই সব বলে দেবে।

যেমন আশ্চর্যের কথা তেমনি আনন্দের কথাই বটে। কিন্তু লোহার-গাঁওয়ের প্রবল প্রতাপ কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে এদের এই যোগাযোগটাই কেবল তিতলির বা শাওনের ভালো লাগেনি। ষাটের দিকে বয়েস গড়াতে চলেছে, তবু এমন চরিত্র যে মেয়ের থেকেও ছোট এক অদ্ভুত মেয়ের লোভে সে ছুপার সেই জঘন্য নথ-ভাঙানির আসরে গিয়ে তিরিশ হাজার টাকার কড়ারে তাকে কিনে দু'হাজার টাকা বায়না ফেলে এসেছে। দু'জনেই মনে মনে ভাবে, এর মধ্যেও ওপরঅলার মঙ্গলের ইচ্ছে কিছু আছে কি না কে জানে। দু'জনের মধ্যে ব্রিজমোহন এই মেয়েকে কিনলে ষড়যন্ত্র করে রাত একটায় তোতারাম তিতলিকে আনতে যেত না, আর তিতলিও পুনপুর জলে ডুবে মরতই। অন্য দিকে এমনি খেলা যে ওই মেয়েকে কিনল যে, ফেরার পথেই তার ছোট-খাট হার্ট অ্যাটাক হয়ে বসল। সে ভালো হয়ে উঠলে ভবিতব্য কি, আর না হলে ব্রিজমোহন কোন মূর্তি ধরবে—দু'জনের কেউ জানে না।

শাওন জিগ্যেস করল, তোতারাম ভালো খবর কি দিয়ে গেল···কুন্দন সিং-এর কেনা মেয়ে হাত-ছাড়া হয়ে গেছে সে জানে?

তিতলি জবাব দিল, হয়তো জানে না, কারণ এ সম্বন্ধে তোতাচাচার

সঙ্গে নাকি কোনো কথাই হয়নি। আর তোতাচাচাও তো নিজের কীর্তি তাকে সেধে জানাতে যাবে না, তাহলে সবার আগে তো তারই গর্দান যাবে। তুলারীবহিনীকে সে কেবল বলে গেছে, কুন্দন সিংয়ের বেশি বেমারি কিছু হয়নি, তবু পাটনার বড় ডাগদার তাকে বিস্তারা থেকে নামতে বারণ করে দিয়ে গেছে, আর কোনরকম উত্তেজনায় মাথা দিতে নিষেধ করেছে—তাই দোস্ত আর তিতলি যেন আপাতত নিশ্চিন্ত থাকে আর ফুর্তিতে থাকে—কিষেণজীর সামনে বিয়ে হয়েছে যখন, দেওতার যা ইচ্ছে তা-ই হবে।

দশ দিনের ছুটি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এমন অনিশ্চিত মানসিক অবস্থা নিয়ে শাওন কাজে যোগ দেয় কি করে। বাড়িতে দু'দুটো পাহারাদার আছে বটে, কিন্তু ব্রিজমোহনের পাহারাদার তাদের নিরাপত্তা দেখছে না নজরবন্দী করে রেখেছে? কাজে জয়েন না করে শাওন খুব ভোরে উঠে পাটনা চলে গেল। গিয়ে হতাশ। তার ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিত আগের দিন কলকাতা চলে গেছে। পনের বিশ দিনের আগে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা নেই।

তাঁর নিচে যে ভদ্রলোক সে অন্য মেজাজের মানুষ। না বলে কয়ে হঠাৎ দশদিনের ছুটি নেওয়ার জন্যেই সে অসন্তুষ্ট। আবার তিন সপ্তাহের ছুটির নামেই তিরিক্ষি হয়ে উঠল। শাওন ভার্মা তাকে ঠাণ্ডা মুখে জানালো, পারিবারিক কারণে তার এখন জয়েন করা সম্ভব নয়। তার আপত্তি সত্ত্বেও ছুটির মেয়াদ আরো তিন সপ্তাহ বাড়ানোর দরখাস্ত দিয়ে চলে এল। এই মুরুব্বিটি আরো চটে গেল কারণ, ছুটি কেন চাই-ই, শাওন ভার্মা সে রকম সন্তোষজনক কোনো কারণ দেখতে বা বলতে পারেনি।

শাওনও তিক্ত মন নিয়েই মাসাউরি ফিরেছে। কিন্তু তিতলিকে দেখা-মাত্র এই মনের ওপর ঠাণ্ডা প্রলেপ। ও জানলায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখেই ছুটে এসে দরজা খুলেছে। এক মুখ হাসি। তারপরেই চোখে শংকার ছায়া। জিগ্যেস করেছে পাটনার খবর ভালো না বুঝি?

—ভালো না তোমাকে কে বলল?

—তোমার মুখ শুকনো।

শাওনের মনে হল তিতলির ভিতর থেকে সমস্ত ভয়ের ছায়া সরিয়ে দিতে পারলে তার এই পৃথিবীতে আসা সার্থক হয়। হেসে বলল, সকাল থেকে এই প্রায় বিকেল পর্যন্ত তোমাকে দেখিনি, মুখ শুকনো ছাড়া সরস দেখবে কি করে ?

এটুকুতেই খুশি।

গত পাঁচ ছ'দিন ধরে শাওন তোতারামের অপেক্ষায় আছে। ছুপার আর লোহার গাঁওয়ের খবর একমাত্র সেই দিতে পারে। পাটনার ব্যাঙ্ক থেকে নগদ আট হাজার টাকা তুলে এনেছে। এর থেকে ছ'হাজার টাকা নিয়ে তোতারামের সঙ্গে গিয়ে কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে। আজ হোক, ত্ব'দশ দিন পরে হোক, ফয়সালা একটা করতেই হবে। ভালো হোক বা মন্দ হোক—এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আর কত দিন থাকা চলে। কিন্তু লোহার গাঁওয়ে গিয়ে কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার সংকল্প তিতলিকে বলেনি। তার কাছে যেতে দেওয়া আর বাঘের মুখে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে তিতলি তফাৎ দেখে না।

তোতারাম এলো আরো দিন পাঁচেক বাদে। অর্থাৎ বিয়ের পনেরো ষোল দিনের মাথায়। অনেক খবরই নিয়ে এসেছে। প্রথম খবরটা তাব নিজের। শ্বশুর চুনীলাল মাস্টার কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেছে, আর খুশি হয়েই দামাদকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। কিন্তু খবর শুনে তোতারামকে একটু বিপাকে ফেলেছে ছুপার দোস্তরা। আড় চোখে একবার ত্বলারীকে দেখে নিয়ে মুশকিলের কথাটা বলেছে। দোস্তদের বায়না, ছুপায় একটা সোহাগরাতের উৎসব করতে হবে, তাহলেই তারা তোতারাম আর ত্বলারীর বিয়ে মেনে নেবে।

শাওন আর তিতলি অন্য খবর শোনার জন্য উতলা। কিন্তু তোতারামের এ-কথা শুনে ত্বলারী নিঃশব্দে এমন একটা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছে যে এরা ত্বজন হেসেই ফেলেছে।

এর পরের খবরেও তেমন উতলা হবার মতো নয়। তিতলির ফুফু হীরা মল্লা কাঁপতে কাঁপতে লোহার গাঁওয়ে এসে ঠাকুর কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেছে। তার সামনে আগাম পাওয়া সেই ছ'হাজার টাকার

পুঁটলি রেখে হাত জোড় করে নিবেদন করেছে, নথ-ভাঙানীর রাতেই তার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে—ডাকাতরা তিতলিকে তুলে নিয়ে গেছে, আজও তার সন্ধান মেলেনি।

লোহার মতো মুখ করে কুন্দন বলেছে, টাকা ফেরত পাবার জন্যে সে টাকা দিয়ে আসেনি, তার কাছে খবর আছে আরো বেশি টাকার দাদন পেয়ে হীরা তিতলিকে সরিয়েছে—পনেরো দিনের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনার খবর না পেলে হীরা মল্লা যেন নিজের প্রাণ আর ইজ্জতের কথা ভাবে। এ-কথা বলে টাকার বটুয়াটা তার মুখে ছুঁড়ে মেরে সাগরেদ ছাবুয়া আহিরকে হুকুম করেছে, আওরতকা নিকালনেকা দেউড়ি দেখা দিহ!

এর অর্থই অপমান করে বার করে দেওয়া। ছাবুয়া আহির তাকে নাকি বাইরে এনে তার গা থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে সেটা মেয়েদের মতো গায়ে মাথায় জড়িয়ে হাত ধরে তাকে বেরুবার রাস্তা দেখিয়েছে, আর নিজের হাতে চাদরটা আবার ওকে পরিয়ে দেবার সময় অসভ্যতা করেছে, আর হেসে হেসে বলেছে, রহুয়াকা চিড়িয়া ঘরে ফিরল কিনা শিগগীরই খবর নেবার জন্য তার ঘরে যাবে। অপমানে, তার থেকেও বেশি ভয়ে কাঁটা হয়ে হীরা মল্লা ঘরে ফিরেছে। তারপর ঘর পাহারা দেবার জন্য ভীম হাবালদারকে খবর দেবে কি না ভেবেছে। খবর দিলেই সন্ধ্যে থেকে পাহারা দেবার নামে সে আসবে। কিন্তু লোকটা ঘন ঘন তামাক খায়। কলকেয় টিকে-তামাক সাজিয়ে আগ্ লাগিয়ে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে দিতে হীরাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই তার আবার কলজেতে আগ্ লাগে। সেই আগ্ ঠাণ্ডা করার জন্য সমস্ত রাত হীরার ঘরেই থেকে যাওয়ার বায়না ধরে, পীড়াপীড়ি করে—

—কাহে ঝুট বাত্ কহতানি? দুলারী বেশ জোরেই ধমকে উঠল।

—রহুয়াকা কুঁঠিয়ামে হীরা এইসন বেইজ্জত কভু না হো সকতি!

গোবেচারা মুখ করে তোতারাম শাওনের দিকে তাকালো। —দুঃখ করে হীরা মল্লা নিজের মুখে আমাকে যা বলেছে আমি কেবল তাই বলছি?

তিতলি আর শাওন দু'জনেই চুপ। এই বয়সেও মেয়ে কেনার জন্য যে লোক লোহার গাঁও থেকে ছুপায় ছোটে তার সম্পর্কে দুলারীর এই শ্রদ্ধার উক্তি ওদের ভালো লাগার কারণ নেই। এর পরের খবর শুনে দু'জনেই উৎকর্ণ।···তোতারামকে সঙ্গে নিয়ে মালিক ব্রিজমোহন ঠাকুর কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবিয়ত্ বেশি খারাপ শুনলে আসা কর্তব্য। আগের বারের হার্ট অ্যাটাকের সময়ও এসেছিল, দু'দিন থেকে তাকে সুস্থ দেখে তবে গাঁয়ে ফিরেছে—

দুলারী ধমকে উঠল, ফিন্, ঝুট? লোহার গাঁওমে ব্রিজমোহন কাহে গইল হম্ না জানে? ওক্‌রা মনোয়ামে আশা লেইকে গইল যে রহুয়া কুন্দন সিংকা অন্তিম দশা ভৈলি—লেকিন সুস্থ দেইখে দুখ্ লেকর আপন ঘর ওয়াপস আইল।

শাওন আর তিতলির দিকে চেয়ে বেজার গলায় তোতারাম মন্তব্য করল, দুলারী আমার মালিক ব্রিজমোহনের সবই খারাপ দেখে।

শাওন ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু একটু। —তারপর কি হল?

—তারপর কুন্দন সিং মালিককে বলল এবারের বেমারি বেশি কিছু না, আর দশ পনেরো দিনের মধ্যেই বেরুতে পারবে।

পরের সমাচারটুকুই খবর। এরপর তিতলি আর শাওন ভার্মার সম্পর্কে কথা হয়েছে। তিতলির ফুফুর ঘর থেকে পালানো শুধু নয়, শাওন ভার্মার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে তা-ও কুন্দন সিং আগেই জেনেছে। ব্রিজমোহন তাকে বলেছে, তারা এখন ছুপায় নেই, কাছাকাছির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে, এখন রহুয়ার মনের ইচ্ছে জানলে সেই অনুযায়ী সে তাঁকে সাহায্য করতে পারে।

···এই শুনে কুন্দন সিং-এর সমস্ত মুখ ভীষণ কঠিন হয়ে উঠেছিল। বলেছে, ওদের দু'জনের সমস্ত খবরই সে রাখে, কারো কাছ থেকে তার কোনরকম সাহায্যের দরকার নেই। ওরা দু'জন তার কবুতর কবুতরী। ফয়েসলা যা করার, সেরে উঠে ধীরে সুস্থে সেই করবে, এমন কিছুই করার ইচ্ছে তার যা এ-দিকের দশ-বিশখানা গাঁওয়ের কেউ কোনদিন ভুলবে না—কিন্তু তার জন্য কিছু সময় লাগবে। ব্রিজমোহনকে সে এক রকম

সাবধানই করে দিয়েছে, তার হয়ে কেউ যেন ফয়েসলা করতে না যায়, শাওন ভার্মা বা তিতলির গায়ে যেন এতটুকু আঁচড় না পড়ে। ওদের দু'জনকে খুব নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেই তাকে সাহায্য করা হবে।

একটু চুপ করে থেকে আর ইতস্তত করে তোতারাম টেনে-টেনে বলল, দেখো, ব্রিজমোহনের আমি হুকুমের নোকর হলেও তোমরা আমার আপনার জনের মতো হয়ে গেছ···আর দুলারীর তো আমার থেকেও তোমরা বেশি পেয়ারের। তাই মালিকের সঙ্গে ঠাকুর কুন্দন সিং-এর আর যা কথা হয়েছে তা-ও বলে দিই। ···কুন্দন সিং-এর বেশি সময় নিয়ে ফয়েসলার প্রস্তাব মালিক ব্রিজমোহনের খুব পছন্দ হয়নি। কুন্দন সিংকে সে বলেছে, ক্যাম্প-ইন-চার্জ শাওন ভার্মার সঙ্গে তার নিজের কিছু পুরনো হিসেব বাকি আছে, ওই লোকের অনেক খারাপ কাজের প্রমাণ তার হাতে আছে, গায়ে হাত না দিয়েও সে ওকে নানাভাবে নাজেহাল করার ব্যবস্থা করেই ফেলেছে—তাতে রহুয়া কুন্দন সিং-এর ফয়সলার জমিন আরো ভালোভাবে তৈরি হবে। জবাবে কুন্দন সিং বলেছে, নিজের ফয়সালার জমিন তৈরি করতে সে নিজেই জানে, কিন্তু কারো পুরনো হিসেব যদি বাকি থাকে তাতে আর সে বাধা দিতে যাবে কেন। তবে সরকারি অফসারের সঙ্গে লাগতে গেলে সে যেন একটু হুঁশিয়ার হয়ে লাগে।

···আজও তিতলির নিজের জন্য ভয়-ডর নেই। তার সব ভয় আর দুশ্চিন্তা শাওনকে নিয়ে। তিতলি তাকে বুকে আগলে এমন কোথাও পালাতে চায় যেখানে কোনো দুশমন তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু শাওন পালাতে চায় না। গোঁ-ভরে বলে, কি অন্যায় করেছি যে লোক হাসিয়ে এখান থেকে চোরের মতো পালাবো? সে ঠিক করেছে, এবার ছুটি ফুরোলেই কাজে জয়েন করবে। আর সতর্কতার জন্য ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিতকে সব জানিয়ে রাখবে। শাওনের বিশ্বাস, সব জানলে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তিনিই নেবেন। আর সে-রকম বিপদ মনে হলে আগাম ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

শাওন বুঝতে পারে তিতলি তবু তার জন্য সন্ত্রস্ত ভয়ার্ত। তাকে

তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়তে হয়। —আমরা তু'জনে তো একসঙ্গে মরতে প্রস্তুত, তাহলে তোমার অত ভয় কেন। এমন কথা বলে শাওন নিজেই অবাক হয়ে যায়। নিজেকে সে বরাবর ভীতু মানুষ জানত। কিন্তু সত্যি মনে এত জোর তার এলো কোত্থেকে।

এত কথার পরেও তিতলির মনের ভাব বুঝে সে রাগ দেখায়। তিতলি নিজে মরতে প্রস্তুত, কিন্তু ওকে মরতে দিতে রাজি নয়। শাওন বলে, তুমি এত স্বার্থপর—তুমি চলে গেলেও আমি পড়ে থাকব, এই চাও?

জবাব না দিতে পেরে তিতলি তাকে তুই বাহুতে আঁকড়ে ধরে থাকে।

না, ব্রিজমোহনের হুমকির কথা শুনে তিতলি তেমন বিচলিত নয়। তার পুরনো হিসেবটা কি জানা আছে। জমি খালাস পাবার ষড়যন্ত্রে শাওন রাজি হয়নি। তার থেকেও বড় হিসেব তিতলি নিজে, যা ব্রিজমোহন কখনো প্রকাশ্যে বলবে না। ওদের তু'জনের প্রেম ভালবাসা দেখে দেখে এক-দেড় বছর ধরে তার দিল জ্বলেছে। শেষে কুন্দন সিংকে জব্দ করতে গিয়ে তোতাচাচার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই লোকের হাতে তিতলিকে সে নিজেই তুলে দিয়েছে। কিন্তু গায়ের জ্বালা যাবে কোথায়?

শাওন তাকে বলেছে, ব্রিজমোহন তার নামে নালিশ করে ওপর-ওয়ালার কাছে বড় জোর তুই একটা উড়ো চিঠি চাপাটি ছাড়তে পারে। কিন্তু ওপরওয়ালা প্রকাশ দীক্ষিতের হাতে সে চিঠি পড়লে তিনি তা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। কুন্দন সিং-এর হুমকির ভয়ে পিছন থেকে শাওনের ওপর ছুরি চালাবার জন্য লোক লাগাবে না যখন, ওই লোককে নিয়ে তিতলির অত তুশ্চিন্তা নেই।

তার আসল ভয় লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ কুন্দন সিংকে। এই লোকের কি মতলব কিছুই হদিস পাচ্ছে না।

কালবোশেখীর ঝড় বন্যা নামায় না, কিন্তু ক্ষণিকের তাণ্ডবে অতর্কিতে মানুষকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। জীবনের নৌকো নোঙর-ছাড়া করে ওলট-পালট করে দিতে পারে।

অফিসে জয়েন করার আগেই শাওন ভার্মার কর্মজীবনে সেই রকমই এক ঝড়। এতটার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

যেটা এলো তুই প্রধান সাগরেদসহ ঠাকুর ব্রিজমোহনের দিক থেকে। মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশিরকে সঙ্গে করে এক মস্ত অভিযোগের খতিয়ান নিয়ে সে পাটনায় শাওন ভার্মার অফিসে এসেছে। লিখিত অভিযোগ পত্রে গ্রামের মান্যগণ্য জনেরাই শুধু স্বাক্ষর দেয়নি, শ-দেড়েক শ্রমিক কর্মচারী এবং শান্তিপ্রিয় নিরীহ গরিব আর অছুত মেয়ে-পুরুষের টিপ-ছাপও আছে। ছুপা গাঁওয়ের মানুষেরা বিচার প্রার্থী।

পাটনার অফিসে তখন প্রকাশ দীক্ষিত নেই। তাঁর জায়গায় যে দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে সেই ভদ্রলোক ছুটি-ছাটার ব্যাপার নিয়ে শাওন ভার্মার ওপর আদৌ খুশি ছিল না। এখন তার বিরুদ্ধে আপাত প্রমাণসহ অভিযোগের ফিরিস্তি দেখে তার চক্ষুস্থির। দ্বিতীয় দফায় ওই লোক কেন আবার তিন সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত করেছিল তা বুঝে নিতে সময় লাগল না। বিপক্ষ দল আট ঘাট বেধেই নেমেছে। লম্বা সই, টিপসই, আর ফোটোসহ অভিযোগ পত্রের এক কপি পাটনা অফিসে এবং দ্বিতীয় কপি কলকাতার হেড অফিসে পাঠানোর জন্য আনা হয়েছে। টাইপ-করা কাগজে অনেক দফা অভিযোগ।

প্রথমেই অচ্ছুত এলাকার দরিদ্র নিরীহ পরিবারবর্গের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটানোর নালিশ। যে গ্রামে এতদিন পর্যন্ত ছুত-অচ্ছুত পরস্পরকে বিশ্বাস করে পরম শান্তিতে বাস করে এসেছে, একজনের ব্যভিচারী আচরণে সেই বিশ্বাস আর শান্তিতে ভাঙন ধরেছে। বলাবাহুল্য এর সবটাই

মেয়েঘটিত কারণে। অচ্ছুত এলাকার দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্যবতী বা রূপসী মেয়েদের শাওন ভার্মা নির্লজ্জ ভোগদখলে টেনে এনেছে। সেই এলাকার মানুষদের বিশ্বাস উদ্রেকের জন্য শাওন ভার্মা সরকারের টাকায় সরকারের মজতুরদের বিনা পয়সায় খাটিয়ে এত তারিখ থেকে এত তারিখের মধ্যে পাকা গভীর কুঁয়ো করে দিয়েছে। (সেই কুঁয়োর ছবি অভিযোগ পত্রের সঙ্গে যুক্ত।) ভোগের মেয়েদের বশে আনার জন্য ওমুক-তমুক তারিখে সর্বসাকুল্যে তাদের এতজন আত্মীয় পরিজনকে খনির কাজে লাগিয়েছে (তাদের নাম-ধাম অভিযোগ-পত্রে সংশ্লিষ্ট)। এইভাবে বশীভূত করে শাওন ভার্মা অছুত মেয়েদের দিনে তুপুরে তার অফিস-ক্যাম্পে পর্যন্ত টেনে এনেছে—তার চাক্ষুষ সাক্ষী সরকারী ডাক-পিওন চলতরাম।

…এরপর একটিই অছুত মেয়ে ক্যাম্প ইনচার্জ শাওন ভার্মার ভোগের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। মেয়েটি যথার্থ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, ছুত-অছুত সকল গ্রামবাসীরই স্নেহের পাত্রী। শিশু অবস্থায় মা-মরা মেয়ে, বাপ পাগল, কন্যার স্নেহে আদরে লালিত এক পিসির কাছে। নিঃসন্তান পিসি হীরা মল্লার চোখের মণি সেই মেয়ে। এক বছরের চেষ্টায় নানা প্রলোভন দেখিয়ে শাওন ভার্মা সেই মেয়েকে বশ করেছে। মেয়েটির নাম তিতলি। ওই মেয়ের অনুরোধে পঞ্চ-এর মুরুব্বি এবং মহাবীরজিউর প্রধান সেবায়েত জনার্দন পূজারীর এক অসুস্থ মেয়েকে ওমুক তারিখে পাটনায় নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে জরুরী অপারেশনের অছিলায় শাওন ভার্মা বাপের আপত্তি সত্ত্বেও ওই অসুস্থ মেয়ের সঙ্গে স্ত্রীসহ তার জ্যেষ্ঠ মেয়েকে আর তিতলিকে সরকারের জিপে তুলে সরকারের তেল পুড়িয়ে পাটনায় নিয়ে গেছে। পঞ্চের মুরুব্বি জনার্দন পূজারী অনায়াসে পঞ্চের অন্যান্য সতীর্থদের সাহায্যে অসুস্থ মেয়েকে পাটনার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারতেন। শাওন ভার্মা জনার্দন পূজারীর স্ত্রী ও বড় মেয়েকে রোগিনীর সমূহ বিপদের কথায় ভুলিয়ে আর ব্রাহ্মণ পূজারীকে কোর্টে টেনে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে তাদের নিয়ে সরকারের জিপে পারোপকার করতে বেরিয়েছে। অসুস্থ মেয়েকে পাটনার হাসপাতালে আর স্ত্রী ও বড় মেয়েকে তাদের আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে শাওন ভার্মা পরদিন অর্থাৎ ওমুক তারিখে

রাত্রিতে একা তিতলিকে নিয়ে ছুপায় ফিরেছে। শেষে দিনের পর দিন ওই সরল মেয়েটাকে ভালবাসার অভিনয় করে এক গভীর রাত্রিতে তার অসহায় পিসির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। (অভিযোগের এই পর্বে সেই অসহায় পিসি হীরা মল্লা আর তিতলির ফোটো পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে। ফোটোর হীরা মল্লা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছে।) শাওন ভার্মা পিসিব কাছ থেকে তিতলিকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই বাতেই (তারিখ) এক পতিত ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে একটা লোক-দেখানো বিয়েব অনুষ্ঠান করে তাকে নিয়ে মাসাউরি গাঁয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সবল মেয়েটাব এই সর্বনাশের ফলে গাঁয়েব সমস্ত অছুতবা এমন ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ যে শাওন ভার্মা আজও সাহস করে খনির কাজে ফিবে আসতে পারেনি। গাঁয়ের ছুত অছুত সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষই শাওন ভার্মাব এই নির্দয় দুষ্কর্মের বিচাবপ্রার্থী।

এ ছাড়াও গাঁয়ের অভিযোগকারীদের আবেদন, খনির কাজে বেশি লোকেব হাজিরা দেখিয়ে টাকা চুরি হচ্ছে কিনা, এবং মজদুরদের চুক্তি-মতো টাকা দেওয়া হয় কিনা—পঞ্চের নিঃস্বার্থ কল্যাণময়ী সভ্যদের দিযে যেন যাচাই করে নেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, এব ফলে ক্যাম্প ইন চার্জ শাওন ভার্মার আরো অনেক দুষ্কর্ম প্রকাশের আলোয় আসবে।

প্রকাশ দীক্ষিতেব জায়গায় সাময়িকভাবে যে মানুষটি এখন কর্তা-ব্যক্তি, সেই ভদ্রলোক রুক্ষ প্রকৃতির শুধু নয়, ভীতুও। অভিযোগেব আদ্যোপান্ত পড়ে তার চক্ষুস্থির। অবিশ্বাস করার কিছু নেই, ফোটোগুলো আব শাওন ভার্মাব ছুটি নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকাটাই তার বিবেচনায় অকাট্য প্রমাণ। তাব আরো দুশ্চিন্তা, জাত-পাত আর অছুত গরিবদের ওপর অত্যাচার নিয়ে দিল্লীও এখন দস্তুর মতো মাথা ঘামাচ্ছে। এই সময় এ-খবর তাদের কানে গেলে সোরগোল উঠবেই। ফলে নিজেদের নির্বিঘ্ন থাকাটাই জরুরী প্রয়োজন এখন।

ভদ্রলোক তড়িঘড়ি ফোটো সমেত অভিযোগের প্রতিলিপি কলকাতায় পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে কড়া নোট, পত্রপাঠ ক্যাম্প ইন চার্জ শাওন ভার্মাকে সাসপেণ্ড করে তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের বিশেষভাবে তদন্ত হোক।

অভিযোগের গুরুত্ব অপরিসীম এবং তা ভিত্তিহীন নয় শাওন ভার্মার সাম্প্রতিক আচরণে এ-রকম বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কলকাতার হেড অফিসের প্রধান কর্তা ব্যক্তিরও এই দারুণ অভিযোগ আর পাটনার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নোট হাল্কা করে দেখার কোনো কারণ নেই। তদন্ত সাপেক্ষে শাওন ভার্মার সাময়িক বরখাস্তের হুকুম আসতে সময় লাগল না।

শাওনের দ্বিতীয় দফা ছুটি ফুরোতে তখনো আট ন'দিন বাকি। ছুপা থেকে এসে তোতারাম তাকে আড়ালে ডেকে জানালো শাওন যাকে সাইটের ভার দিয়ে ছুটিতে আছে, সেই লোক খোঁজখবর করে তার কাছে এসে ক্যাম্প ইন চার্জ কোথায় আছে হদিস পেতে চেষ্টা করেছিল। জানিয়েছে অফিসের ব্যাপারে বড় রকমের কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, তাকে পাটনায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল, সেখান থেকে তার মারফৎ কলকাতা হেড অফিসের একটা খুব জরুরি চিঠি ক্যাম্প ইন চার্জকে দেবার হুকুম হয়েছে।

কি হতে পারে ভেবে না পেয়ে তোতারামকে সঙ্গে নিয়ে শাওন তক্ষুনি ছুপায় রওনা হল। তিতলিকে বলে গেল, একটু দরকারে বেরুচ্ছে, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ফিরে আসছে। তোতারামই দুটো সাইকেল জোগাড় করল।

সহকারী বিমর্ষ মুখে তার হাতে কলকাতার হেড অফিসের জরুরী মোটা খামটা দিয়ে সই করিয়ে নিল। শাওন ভার্মা ক্যাম্পের অফিস ঘরে বসে সেই খাম খুলল। সামনে তোতারাম বসে।

সাময়িক বরখাস্তের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অভিযোগ এবং বিচারের দাবির চিঠি। সব পড়ার পর তার পাথর-মূর্তি দেখেও তোতারাম হালকা সুরে জিগ্যেস করল, হালত আচ্ছা না হই?

শাওন ঠাণ্ডা গলায় ফিরে জিগ্যেস করল, তুমি ইংরেজি পড়তে পারো?

—থোড়া থোড়া। তবে কষ্ট করে পড়ার দরকার নেই।...পঞ্চ আর গাঁওয়ের মানুষদের কি নালিশ আমি জানি, তাছাড়া মালিক বলছিল তোমাকে সাসপেণ্ড করা হবে, তোমার বিচার হবে...সেই চিঠিটি তো?

শাওন ভার্মা কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক।—সব জেনেও আমাকে কিছু বলনি···মালিকের লোক বলে চুপ করে ছিলে?

একটা আঙুল কপালে ঠেকিয়ে নিস্পৃহ গলায় তোতারাম জবাব দিল, নোকরের নসিব এই রকমই।

আধঘণ্টার মধ্যেই শাওন ফিরল। প্রাণপণে সাইকেল চালিয়েও তোতারাম তার সঙ্গ ধরতে পারল না।

···তিতলি শুনল কি হয়েছে। দুলারী শুনল। তোতারাম বোকা মুখ করে বসে।

রাগে দুঃখে তিতলি প্রথমে শাওনের ওপরেই ঝলসে উঠল।—আমার মতো খারাপ নসিবের মেয়ের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে কেন তোমার এই সর্বনাশ করলে—এর থেকে পুনপুর আঁচরোয়া আমার অনেক ভালো ছিল — অনেক ভালো ছিল!

তার আগুন-পানা মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে শাওন বলল, তিতলি, এরা যা করছে তার জন্য আমারও কম রাগ হচ্ছে না, কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে আমি দুঃখ পাচ্ছি···এ চাকরির আমি পরোয়া করি না, যে-কোনো মুহূর্তে ছেড়ে দেব—কিন্তু তুমি কি আমার ছেড়ে দেবার জিনিস?

থমথমে মুখে তোতারামের দিকে ফিরল। যার লোকই হও, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ··দিন-কতকের জন্য আর একটু উপকার করতে পারো? তোমার মালিকের এই আরামের বাড়িতে আমি তিতলিকে নিয়ে আর একদিনও থাকতে চাই না, তুমি এখানে বা যেখানে হোক আজকের মধ্যে দুখানা ঘর যোগাড় করতে পারো? ভাড়া বেশি হলেও আপত্তি নেই।

তোতারাম ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইলো, তারপর ফিরে বলল, এ কুঠি আমার মালিক ব্রিজমোহনের তোমাকে কে বলল?

শাওনের গলার স্বর নীরস।—এটা ঠাট্টার সময় নয় তোতাজী!

তোতারামের পালিশ করা মুখ।—হায় রাম, সক্কালের বুরা বাত শোনাই আমার বরাত দেখছি। সাচ বাত্ শোনো দোস্ত, ঠাকুর ব্রিজমোহন

শুধু জানে তোমাদের আমি মাসাউরির কোনো কুঠিতে এনে তুলেছি, কোন্ কুঠি কার কুঠি সে জানেও না—এইসব আরামের কুঠিয়াঁতে তোমরা আছ জানলে মালিক আমার ওপরেও গোঁসা হবে—তুমি তোমার কোনো চেনা লোকের কুঠিতেই আছ, কিন্তু কার কুঠি জিগ্যেস করে আমাকে মুশকিলে ফেলো না—ব্রিজমোহন জানতে পারলে যার কুঠি তারও অসুবিধে হবে।

শুনে তিতলিও আকুল, আর শাওন বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তোতারামের দিকে চেয়ে আছে। চাকরিতে এমন একটা হীন চক্রান্তের গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে শুনে দুলারীও দুঃখ হয়েছে। এবারে সে কোমল গলায় বলল, ভাইসাব, ব্রিজমোহনের ওই চামচা আমাকে অন্তত তার কুঠিয়াঁতে এনে রাখতে সাহস করবে না—এটা ব্রিজমোহনের কুঠি নয় তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

শাওন প্রথমে ভেবে পেল না তার আর কোন্ চেনা লোকের বাড়ি হতে পারে এটা, যেখানে দুজন সশস্ত্র পাহারাদার মজুত। ভাবতে গিয়ে ইঁট সিমেন্ট-বালি লোহা-লক্কড়ের কারবারের মালিক গণপত লালার কথা মনে পড়ল। ছুপা ছাড়াও অন্যত্র তার গোটা দুই বাগান বাড়ি আছে শুনেছিল।···ওই লোক নিজের স্বার্থেই এতদিন তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করেছে, কথা-বার্তায় বিনীত, ভদ্র। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযোগ পত্রে সরকারের টাকার ইট বালি সিমেন্ট দিয়ে অচ্ছুত পাড়ায় কুঁয়ো করে দেবার নালিশ আছে বটে, কিন্তু শাওনের মনে পড়ল পঞ্চের মাতব্বরদের মধ্যে অভিযোগ পত্রে কেবল ওই একজনেরই স্বাক্ষর নেই। আগেও সেটা লক্ষ্য করেছিল, আর ভেবেছিল, ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের নাম জড়াতে চায়নি বলেই তার স্বাক্ষর নেই—নইলে সে তাদের দলেরই একজন হবে। এখন বুঝল, তোতারাম যে-ভাবেই হোক তাকে বুঝিয়ে ওদের এই বাড়িতে এনে তুলেছে, আর এটা জানাজানি হয়ে গেলে পঞ্চএর মুরুব্বিদের কাছে তার একটু বেকায়দায় পড়ারই কথা।

শাওন ভিতরে ভিতরে একটু নিশ্চিন্ত। গণপত লালাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে যতদিন এখানে থাকবে তার ভাড়া জোর করেই তাকে গছিয়ে

দিতে পারবে।

…তদন্তের ফল কি হবে শাওন জানে না। যাই হোক, এরপর এ চাকরি সে আর করবে না। তার একটাই আক্রোশ এখন, ব্রিজমোহন আর তার সাগরেদদের আর লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং-এর মুখোশ সে কি করে খুলে দিতে পারে। তিতলিও যেচে বলেছে, তার অফিসের বড় সাহেবদের কাছে সে-ও যাবে, এখানকার সক্কলের বজ্জাতি আর দুশমনির কথা সে জোর গলায় বলে আসবে।

দু'দিন ঘরে বসে শাওন তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের জবাব সাজালো। …মেঘ না চাইতে জলের দেখাও কোনো কোনো সময় মেলে বোধহয়।

ঘরে বসে শাওন সামনের গেটের দিকে চেয়েছিল, বিমনার মতো অনেক কিছুই ভাবছিল। তাদের সাইটের জিপটা এসে ফটকের সামনে দাঁড়ালো। প্রথমে নামলেন তার প্রধান মরুব্বি প্রকাশ দীক্ষিত। পিছন থেকে নামলো তোতারাম।

শাওন তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। দু'দিন ধরে কেবল এই একজনের কথা বার বার মনে পড়ছিল। প্রথম দফায় তাঁর কাছে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে চিঠিতে লিখেছিল, সামনাসামনি তার অনেক কথা বলার আছে, যত শিগগিব হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলবে। দ্বিতীয় দফায় ছুটি নেবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলার জন্য পাটনায় গিয়ে দেখে তিনি নেই, বেশ কিছুদিনের জন্য কলকাতায় গেছেন।

…কিন্তু তিনি কাছে আসতে শাওনের মুখে খুশির হাসি মিলিয়ে গেল। প্রকাশ দীক্ষিতের থমথমে গম্ভীর মুখ। শাওন হাত জোড় করে নমস্কার করতেও মাথা পর্যন্ত নাড়লেন না, রুষ্ট চাউনি।

ঘরে এনে বসাতে প্রথমেই তোতারামকে বললেন, তুমি বাইরে অপেক্ষা করো, আমার এর সঙ্গে কথা আছে।

তোতারাম সরে গেল। শাওন কর্তব্য করার সুরে বলল, আগে একটু চা দিতে বলি স্যার?

প্রকাশ দীক্ষিত মাথা নাড়লেন। বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে

তদন্তের ভার নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছি, চায়ের দরকার নেই বোসো—

অপমানে শাওনের মুখ লাল। চুপচাপ বসল।

—তুমি এখানে আসার সময়েই সাবধান করেছিলাম, এখানকার জাত-পাতের ব্যাপারে অনেক গণ্ডগোল, তুমি তাতে কান দেওয়ার দরকার মনে করোনি ? একটা ছোট জাতের মেয়ের সঙ্গে নিজেকে এ-ভাবে জড়িয়েছ ?

শাওন ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, আমি জড়াইনি, আমি তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছি। আমি আশা করব আপনি তার সম্পর্কে একটুও অসম্মান করে কথা বলবেন না।

প্রকাশ দীক্ষিত থমকালেন একটু। কিন্তু তাদের জাতের লোকেরাই তোমার সম্পর্কে এ-সব কি লিখছে ?

—তাদের এলাকার একজনেরও কোনো অভিযোগ আছে কিনা আপনি তদন্ত করুন।

প্রকাশ দীক্ষিত চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে আছেন। একটু বাদে বললেন, শোনো, আমি কাল থেকেই ছুপায় এসে তোমার ক্যাম্পে আছি। প্রথমেই ব্রিজমোহনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তার বক্তব্য শোনার পর অন্য সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে সব জানার জন্য সে ওই তোতারাম না কে, সঙ্গে দিয়েছে। আমি অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি, তারা তারই শেখানো পড়ানো লোক এটা বোঝা গেছে। জনার্দন পূজারীর সঙ্গে আর আলাদা করে তার দুই মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেছি।...সীরিয়াস অপারেশনের জন্য পরের দিন না গিয়ে ওদের নিয়ে আগের দিন তুমি পাটনায় গেছলে, এ-কথা সেখানে গিয়ে তুমিই আমাকে বলেছিলে। এর মধ্যে ভাঁওতার ব্যাপার কোনগুলো তা মোটামুটি আঁচ করতে পারছি। ...ইট সিমেন্টের কারবারী গণপত লালার সঙ্গে দেখা হয়নি, ইচ্ছে করেই সরে আছে কিনা জানি না—সরকারি টাকায় জিনিস কিনে খনির মজুর খাটিয়ে কুয়ো করে দেবার ব্যাপারটা কি ?

সকলের থেকে আপনার জন যাকে ভাবত, তাঁর ওপরেই শাওনের এখন সব থেকে বেশি অভিমান। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, কুঁয়োর জন্য মাল-মশলার সব টাকা আমি নিজে দিয়েছি, সে-সব রিসিট আমার কাছে

আছে—সাইটের কাজের জন্য যেমন পাই তেমনি ডিসকাউণ্টে পেয়েছি শুধু।···আর সেই এলাকায় অচ্ছুতদের মধ্যে দিনে যারা খনির কাজ করে রাতের পর রাত জেগে তারাই কুঁয়োর কাজ করেছে—আর বিনে পয়সায় কাজ নিজেদেরই স্বার্থে বলে কত আনন্দ করে করেছে আপনি খোঁজ করুন।

—কিন্তু তুমি উদার হয়ে নিজের টাকায় ওদের জন্য কুঁয়ো করে দিতে গেলে কেন?

আত্মজনের ওপর অভিমানের পরিণাম ক্রোধ। তবু সংযত মুখেই শাওন জানালো কেন নিজের টাকায় কুঁয়ো করে দিয়েছে। ভালো জলের অভাবে ওই এলাকার কত লোক কলেরায় মারা যায়, আর সমাজের ভদ্র এলাকায় ওদের মেয়েরা কি-ভাবে বেইজ্জত হয় জানিয়ে বলল, আমি যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছি, তার অনুরোধে এই কুঁয়ো করে দিয়েছি এটা সত্যি কথা।

—কিন্তু যে-মেয়েকে তুমি বিয়ে করেছ তার পিসী হীরা মল্লার সঙ্গে দেখা করতে সে তো কান্নাকাটি করে বলল, তুমি তাকে ভুলিয়ে চুরি করে নিয়ে এসেছ?

শাওন থমকে চেয়ে রইলো একটু, তারপর ক্রুদ্ধ শ্লেষের সুরেই বলল, বাইশ বছরের মেয়েকে ইচ্ছে করলেও ভুলিয়ে চুরি করে আনা সহজ নয় সার। তারপরেই ভিতরের দরজার দিকে চেয়ে হাঁক দিল, তিতলি—!

তোতারামের মুখে খোদ বড় সাহেব তদন্তে এসেছেন শুনে তিতলি আর দুলারী কাছাকাছিই ছিল। ঘরের কথা কিছু কিছু কানে এসেছে। ডাক শুনে তিতলি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। মাথায় খাটো ঘোমটা। দু'হাত জোড় করে বড় সাহেবকে নমস্কার করল।

জবাবে প্রকাশ দীক্ষিত বিমূঢ় মুখে চেয়েই রইলেন। অভিযোগ পত্রের সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়া হীরা মল্লা আর তার সঙ্গে তিতলির ফোটো আছে। কিন্তু সেই ফোটো দেখে তিনি ধারণাও করতে পারেন নি মেয়েটা এত সুন্দর। তাছাড়া ওটা ছিল ঘাগরা-পরা এক উচ্ছল মেয়ের ফোটো। কিন্তু শাড়ি-পরা এই দিব্যাঙ্গনা যেন আর কেউ, আর একজন। দেখা-মাত্র

ভেতরটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এমন এক মেয়ের জন্য যে-কোনো ছোকরার মুণ্ডু ঘুরতে পারে বটে। একটু ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ দীক্ষিত বললেন, বয়েঠ্ যাও মায়ি, বয়েঠ্ যাও—

শাওন বলল, আপনি বাংলা বললে ও বুঝতে পারবে। তিতলির দিকে ফিরল, বোসো।···ইনি আমার বড় সাহেব শ্রীপ্রকাশ দীক্ষিত, আমার বিরুদ্ধে ছুপার মানুষদের নালিশের তদন্ত করতে এসেছেন। তোমার ফুফু হীরা মল্লা এঁর সামনে কান্নাকাটি করে বলেছেন, আমি তোমাকে ভুলিয়ে চুরি করে এনেছি। এর জবাব তুমি দেবে না আমি দেব ?

তিতলির তপতপে মুখ। পতির অপমানে সতীর ক্রোধ দেখলেন প্রকাশ দীক্ষিত। তিতলি তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে বসল। মিষ্টি গলার দৃঢ় জবাব, আমি বলব···তুমি কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে গেলে ভালো হয়।

শাওন, গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো।—তুমি কোনো রকম অনুরোধ করতে যাবে না, তোমার ব্যাপারে যা সত্যি আর কি ভাবে আমার কাছে এসেছ সেটুকুই শুধু বলবে। তারপর প্রকাশ দীক্ষিতের দিকে তাকালো, আমি আপনার কোনো অনুগ্রহের প্রত্যাশায় ওকে ডাকি নি সার, যা সত্যি সেটুকু কেবল জেনে নিন···আমি ওকে বলে রেখেছি আপনাদের তদন্তের ফল যা-ই হোক, আমি আর এ চাকরি করব না—

এবারে ধমকের সুরে প্রকাশ দীক্ষিত বলে উঠলেন, ডোণ্ট বি অ্যান অ্যাস্—

এই ধমকে আগেকার সেই স্নেহের সুর বাজল মনে হতে একটু থমকে দাঁড়িয়ে শাওন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

আধঘণ্টা বাদে তার ডাক পড়ল। তিতলির লালচে মুখ আরো গনগনে, কিন্তু কালো চোখে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। প্রকাশ দীক্ষিত যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। তেমনি গম্ভীর। বললেন, তোমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তার একটা লিখিত জবাব আমাকে দেবে—

শাওন ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা লম্বা খাম এনে তাঁর হাতে দিল।—অফিসে যাচ্ছি না, তাই টাইপ করার সুবিধে হয়নি।

সেটা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করলেন গণপত লালার সেই সব রিসিট

এতে আছে ?

—ক্যাম্পে আছে।

—ওগুলোর দরকার হবে, লেবার রেজিস্টার চেক্ করার সময়ও তোমাকে দরকার হতে পারে, জিপ্ পাঠালেই চলে আসবে···এখন আমি লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি···সে-ই বোধহয় এখন তোমার সব থেকে বড় শত্রু ?

—মনে হয়। শাওনের ঠাণ্ডা জবাব।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও প্রকাশ দীক্ষিত ঘুরে দাঁড়ালেন। তিতলির দিকে চোখ পড়তে গম্ভীর মুখ কোমল একটু, কিছু যেন বলতে গিয়েও বললেন না। শাওনের দিকে ফিরলেন।—আমার জিপ না এলে দিনকতক এখন বাহাদুরি করে বাড়ি থেকে বেরিও-টেরিও না। সঙ্গে যে লোকটা এসেছিল তাকে ডেকে দাও—

দালান থেকে নেমে ফটকের বাইরে এসে জিপে উঠলেন। পিছনে তোতারাম।

জিপ চোখের আড়াল হতে শাওন জিগ্যেস করল, সব শুনেছেন ?

সব—সব, মনোয়াঁমে যা ছিল সব কহলী—ফুফু ব্রিজমোহন আর কুন্দন সিং-এর মুখোশ খুলে দিয়েছি—তোঁহার বড়াসাব খুব মন দিয়ে সব শুনল, আর রাতে পুনপুব জলে ডুবে মরতে গেছলাম শুনে খুব বকল, বলল, ঘর ছেড়ে বোকার মতো ও-দিকে না গিয়ে সোজা তোমার কাছে চলে এলাম না কেন। তারপর ফিক করে হাসল একটু, আর যা বলল শুনলে তোমার দিমাগ হবে—বলব না।

শাওন কিছু জিগ্যেস না করে শ্রান্ত মুখে বারান্দার মাচিয়ায় বসল। এই লোক তাকে কত স্নেহ করেন রাগে আর ক্ষোভে তা-ও মনে ছিল না।

তিতলি এগিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।—না বললেও ভালো লাগছে না, বলেই ফেলি। ·সব শোনার পর বড়াসাব বলল, তোমাদের দিন খুব খারাপ যাচ্ছে এখন, তবু মনে রেখো যে আদমীকে পেয়েছ তুমি, দশ-বিশ হাজারোর মধ্যে এ-রকম একজন হয় না।

শাওন অখুশি নয়। একটু হেসেই মন্তব্য করল, তা তো হল, কিন্তু

উনি এখন যাচ্ছেন কুন্দন সিং-এর কাছে—সে তাকে বলবে দশ-বিশ হাজারের মধ্যে এ-রকম একজন দুশমন হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে তিতলি ঝলসে উঠল, কিষণজীকা মরজি হো তো ওক্‌রা নতিব পরভি আগ্‌ লাগি।

বেলা বারোটার পরে তোতারাম একলা ফিরল। শুকনো মুখ, ক্ষুধার্ত। এসেই জানান দিল, রহুয়া কুন্দন সিং এখনো সে রকম সুস্থ নয়, তাই সেখানে তার খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হল না। খবর তেমন বিশেষ বলতে পারল না, দীক্ষিত সাহেবের সঙ্গে কুন্দন সিং-এর যা কথাবার্তা হয়েছে, তোতারামকে ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে ভিতর থেকে দুই একবার ইট-সিমেণ্টের কারবারী গণপত লালার নামটা তার কানে এসেছে। আর দীক্ষিত সাহেবকে বিদায় দেবার সময় বাইরে এসে রহুয়া কুন্দন সিং তাঁকে বলছিল, ওই ক্যাম্প ইন-চার্জ শাওন ভার্মা আর তিতলির খবর দিল্লীতেও পৌঁছে গেছে।

এটুকু শুনেই শাওন গুম। এরা বেশ আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে।

পরের চার দিনের মধ্যে দু'দিন জিপ এসে শাওনকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। সেখানে প্রকাশ দীক্ষিতের বিচারকের মুখ।

এর পরের দিনটা ছুপার এক স্মরণীয় দিন। মহাবীর জিউর আঙিনায় পঞ্চএর বড় বৈঠক বসেছে বিকেল চারটেয়। বিচার সভা নয় কিছু, অনেকটা সামাজিক বৈঠক গোছের সমাবেশ। সরকারের তরফের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা গ্রামের মানুষদের সুখ দুঃখের খোঁজ খবর নিতে এলে পঞ্চের মুরুব্বিরা তাঁকে নেওতা দিয়ে থাকে। গ্রামের দরিদ্র শ্রমিক মজুরেরা আসে, অচ্ছুতরা আসে, তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলে। এই বৈঠকেরও বাইরের হাওয়া তেমনি। কিন্তু সকলেই জানে, খনিয়ার কাজে সব থেকে বড়া সাহেবের সম্মানে এই বৈঠক ডাকার বিশেষ একটা লক্ষ্য আছে।··· প্রকাশ দীক্ষিত এসেছেন এবং সমাদরে আসন গ্রহণ করেছেন। পঞ্চের মুরুব্বিদের মধ্যে একমাত্র ইট-সিমেণ্টের কারবারী গণপত লালা ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত। অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও ঠাকুর ব্রিজমোহনের বিশেষ

অনুরোধে লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং‌ও এসেছে। তার ছুই সহচর লছমন, আহির আর ছাবুয়া আহির মালিককে ছু'দিক থেকে ধরে এনে বসিয়েছে। সে আসাতে ব্রিজমোহন আর তার সতীর্থরা খুব খুশি। তার ভূমি সেনারাও দল বেঁধে এসেছে। কিন্তু ব্রিজমোহন একটু খুঁত-খুঁত করছে অন্য কারণে। দরিদ্র শ্রমিক মজুর আর অচ্ছুতরা যে-ভাবে দল বেঁধে আসবে ভেবেছিল, তেমন আসেনি। এর চারগুণ লোক হবার কথা। আর এমন দিনে অনুপস্থিত ইট-সিমেণ্টের কারবারী গণপত লালাও। এ-সব কারণেই ব্রিজমোহন অসহিষ্ণু চোখে ভাইপো বাবুয়ার দিকে এক-একবার তাকাচ্ছে। চাচার ক্ষোভের কারণ বুঝে বাবুয়াও এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। নিজের দলের লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

জনসাধারণের তরফ থেকে ছু'জন আর পঞ্চের তরফ থেকে মহাদেও প্রসাদ, জগদেও মিশির প্রকাশ দীক্ষিতকে স্বাগত জানালো। তারপর একে-একে তিন-চারজন অচ্ছুত আর দরিদ্র শ্রেণীর লোক এসে জানালো, পঞ্চের মুরুব্বিদের সহৃদয়তায় তারা কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে।…কিন্তু সরকারের খনিয়ার কাজের একজন বড় নোকর তাদের মেয়েদের মান ইজ্জত নষ্ট করছে, তাদের জাত-পাতের সংস্কারে নানাভাবে আঘাত করছে।

তিন চারজনের মুখে এ-রকম শোনার পর প্রকাশ দীক্ষিত বললেন, খনির কাজের ওই লোকটি যে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছে বলে গ্রামের লোকের নালিশ—সেই অচ্ছুত এলাকার কারা এখানে উপস্থিত আছে—তাদের বক্তব্য কি?

সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজমোহনের ইশারায় বাবুয়া নতমুখি ছুঃখে ম্লান হীরা মল্লাকে এগিয়ে নিয়ে এলো। প্রকাশ দীক্ষিত বললেন, আমি নিজে ওর ঘরে গিয়ে ওর সব কথা শুনেছি, ওই এলাকার আর যারা এখানে উপস্থিত আছে আমি তাদের এখানে ডাকছি—একে দরকার নেই।

সকলের উদগ্রীব প্রতীক্ষা, কিন্তু দেখা গেল কেউ এগিয়ে আসছে না। ব্রিজমোহনের ঈষৎ বিস্মিত রুষ্ট দৃষ্টি আবার ভাতিজা বাবুয়ার দিকে। সে চিৎকার করে বার কয়েক ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও কেউ এগিয়ে এলো না।

তাদের বদলে যে কালো আর মোটামুটি সুশ্রী এক মেয়ে এগিয়ে

এলো তার বয়েস কম করে তিরিশ। মাথায় রুক্ষ কেশ উগ্র চাউনি, বেশ-বাসেও তেমন যত্ন নেই। যারা চেনে, ওকে মান্যগণ্যদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বিষম অবাক। কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু অবাক ব্রিজমোহনও। তার নাম রামকেলী, কিন্তু পরিচিত গেঁয়ো লোকদের মুখে সে রামকোল। সদর্পে সত্যিই সে কাছে এগিয়ে আসছে দেখে মাতব্বরদের দিক থেকে কে একজন বলে উঠল, চুড়েলকো (পেত্নী) হটা দো!

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে মেয়েটাকে সটান এসে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিজমোহনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, বোল্ বাবুয়াকে চাচা, এ তো লোগঁন্‌কা বিচার কৈসন বা দিনমে হাম লোগঁনকে অছুত দেখাই দি, আজ এ ভরে পঞ্চমে চুড়েল কহল—লেকিন রাতমে শরীরকা কোণে কোণে ছুত্ দেখাইকি কহল, ফুলছড়ি, দিল্‌কা রাণী, পেয়ারকা কবুতরী—ও রোজ তু হম্‌কে তোঁহার বাগান-কুঠিয়ামে লে আইলী, পরশু তোঁহার ভাতিজা বাবুয়া হমারী দরওয়াজা খিট্‌খিটাইল—বোল ঠাকুর বোল্, হম ক ভইলি—মা বহু না কসবী (বেশ্যা)?

সভা স্তব্ধ মূক বিমূঢ়।

এমন দুঃসাহসের প্রহসন এই গ্রামে জন্মে কেউ দেখেনি, কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ব্রিজমোহনের ফর্সা মুখ রক্তবর্ণ।

কেউ কিছু বলার আগেই অসুস্থ কুন্দন সিং-এর চাপা গর্জন শোনা গেল। দুই সহচর লছমন আর ছাবুয়া আহিরকে হুকুম করল, ওই নষ্ট ছৌড়ীকে পাকড়ে নিয়ে আমার ভুঁই সেনাদের হাতে দিয়ে এসো!

আদেশ শুনে ক্রুদ্ধ ব্রিজমোহন আঙুলের ইশারায় বাবুয়াকে ডাকতে যেতেই কুন্দন সিং আবার বাধা দিল, তু শান্ত্ রহ, হম্ এ বৈঠককা সভাপতি, এ অপমানকা সওয়াল হামারা পর ছোড় দিহ।

ব্রিজমোহন চুপ, নির্বাক। মেয়ে লোকটাকে নিয়ে গিয়ে আদেশ পালন করে মিনিট তিনেকের মধ্যেই লছমন আর ছাবুয়া তাদের মালিকের পিছনে এসে দাঁড়ালো। ওই পতিতা মেয়েটার কথা শুনে প্রকাশ দীক্ষিতের দু'কান লাল হয়ে উঠেছিল। এখন ভেবাচেকা-খাওয়া ঘাবড়ে যাওয়া মুখ। এর পর নৃশংস কোনো রক্তারক্তি কাণ্ড হবে কিনা ভেবে

পাচ্ছেন না। এই ভয়েই হয়তো বৈঠকের ভিড় হালকা হতে শুরু করেছে, গরিব আর অচ্ছুতরা অনেকে সরে পড়ছে।

প্রকাশ দীক্ষিতও এখন তাড়াতাড়ি সভা ছাড়তে পারলে বাঁচেন। কিন্তু তাঁর একটি বিশেষ প্রশ্ন এখনো বাকি। ব্রিজমোহনকে জিগ্যেস করলেন, ইট সিমেন্টের কারবারী গণপত লালা এখনো অনুপস্থিত কেন··· বিশেষ করে তার ব্যাপারটাই আমার জানতে বাকি।

ব্রিজমোহন ধৈর্যহারা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। দু' চোখে নীল আগুন ঠিকরোচ্ছে। আবার বাবুয়ার খোঁজেই হয়তো এ-দিক ও-দিক তাকালো। কিন্তু কুন্দন সিংই তাকে টেনে বসিয়ে দিল। তার কানে কানে বলল কিছু। তারপর আমন্ত্রিত অতিথির দিকে ফিরল, মিস্টার দীক্ষিত, গণপত লালা ব্যবসায়ী মানুষ, হয়তো কোনো বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে··· কালকের মধ্যে যে কোনো একসময় আমি তাকে আপনার ক্যাম্পে গিয়ে দেখা করার ব্যবস্থা করব।

প্রকাশ দীক্ষিতের মুখভাবে স্পষ্ট যে এই দিনে গণপত লালার সভায় না আসাটা তাঁর মনঃপূত হল না। তিনি কুন্দন সিং-এর দিকেই ফিরলেন, এবার আপনার কি বলার আছে?

কুন্দন সিং দু'বার মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে বলল, আমার অন্য মামলা, আর তা ফয়েসলা করার হিম্মত আমি নিজেই রাখি—ব্রিজমোহন আমার ছোট ভাইয়ের মতো, তার অনুরোধে তার সম্মান রাখার জন্য অসুস্থ শরীর নিয়েও এখানে এসেছি···এখন আবার অসুস্থ লাগছে, আপনার হুকুম হলে আমি এক্ষুনি ফিরব—

পাংশু ব্যস্ত মুখে ব্রিজমোহন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। —রহুয়া, এ বাত তো সাহাবকো সমঝাই দিহ যে গাঁওকি ছৌড়ীলোগকো শালে শাওন ইজ্জত আবরুপর আঁখমিছলি করতারে—

উঠে দাঁড়িয়ে কুন্দন সিং তেমনি বিড় বিড় করে জবাব দিল, লোহার গাঁওমে যব তু সাহাবকো ভেজাথা ম্যাঁয় উনকো হামারা বাত কহি থি, আব হামারা হিসাব তু হমার পর ছোড় দিহ।

সভা শেষ। প্রকাশ দীক্ষিতকে ধন্যবাদ আর নমস্কার জানিয়ে দুই

সহচরের কাঁধে ভর দিয়ে কুন্দন সিং ধীরে ধীরে তার গাড়ির দিকে চলল। ঘামছে। কিন্তু ব্রিজমোহন বা অন্য কেউ বুঝল না লোকটা সত্যি অসুস্থ বোধ করছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। সভা ভেঙেছে, কিন্তু মাতব্বরদের নিয়ে ব্রিজমোহন সেখানেই পরামর্শে বসেছে। তার সামনের আসনে জনার্দন পূজারী, মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশির। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে তো :রাম। আর হুকুমের অপেক্ষায় জনাকতক বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে অদূরে অপেক্ষা করছে বাবুয়া। তাদের ধমনীর রক্ত ফুটছে। এখন মুরুব্বিদের সংকেত পেলেই তারা যা করার করতে পারে।

মাতব্বরেরা এটুকু অন্তত বুঝেছে, তদন্তকারী অফিসারকে অভিভূত করার মতো পরিবেশ তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু তারা ভেবে পাচ্ছে না গণপত লালা কেন এলো না। কুন্দন সিং অবশ্য ব্রিজমোহনের কানে কানে বলেছে, সরকারের কাজ করে যে কারবারীরা মুনাফা লোটে, সরকারের ব্যাপারে তারা সামনাসামনি লড়াইয়ে আসতে চায় না, পরে ব্যবস্থা করা যাবে। মাতব্বররা আরো ভেবে পাচ্ছে না, হীরা মল্লার এলাকার আর কোনো অছুতের এখানে না আসার মতো সাহস হল কি করে! আর, তাদের কাছে সব থেকে অবাক ব্যাপার, চুড়েল রামকেলি সভায় এসে মাতব্বরদের মুখে এ-ভাবে চুন-কালি দিয়ে গেল কোন্ সাহসে, কার প্ররোচনায়? ছুপা গাঁওয়ের এ কি দুর্দৈব আজ!···সভাপতি হিসেবে কুন্দন সিং এ অপমানের ব্যবস্থার ভার নিয়েছে। তার মতো রাশভারা প্রতিপত্তির মানুষের এমন অপমান বরদাস্ত না করারই কথা। কিন্তু এর দরকার কি ছিল। যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা তো ব্রিজমোহন এই রাতের মধ্যেই করতে পারত। জনা কুড়ি জোয়ান ভূমিসেনা তাকে রাতের অন্ধকারে পুনপুর ধারে ধরে নিয়ে পুরুষের অত্যাচার শুরু করলে দেহের খাঁচা থেকে তার প্রাণটুকু বার করে দিতে কতক্ষণ লাগত? কেউ জানতেও পারত না, পরদিনের মধ্যে তার মৃতদেহ পুনপুর স্রোতে কোথায় ভেসে যেত ঠিক নেই।

সকলকে সচকিত করে ভটভট আওয়াজ তুলে একটা মোটর সাইকেল

আসছে। এ তল্লাটে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায় একমাত্র গণপত লালা। সে এতক্ষণে আসছে!

কিন্তু আবছা অন্ধকারে মোটর সাইকেলটা এসে দাঁড়াতে সকলেই হতভম্ব। মোটর বাইকের পিছন থেকে যে নামল তার অচেনা মুখ, পরনে পুলিশের পোশাক। আর সামনে থেকে নামল প্রধান থানাদার জোগীন্দর চৌবে। এই থানাদারটি চেনা এবং পেটোয়া লোক। সময়ে অসময়ে এক জনার্দন পূজারী ছাড়া অন্য মাতব্বরদের অনেক কাঁচা টাকাই তার পকেটে আসে। সকলের উদ্দেশে অভিবাদন জানিয়ে জোগীন্দব চৌবে যে খবর জানালো তা সচকিত হবার মতোই। শহর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ফারমান এসেছে, ছুপা আর লোহাব গাঁওয়ে গণ্ডগোল হতে পারে, কিছুদিনের জন্য ওই তুই গাঁয়ে যেন বেশি পাহারাদার রাখা হয়, আর তুই গাঁয়েরই মাতব্বরদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়, তারা যেন কোনরকম হামলার প্রশ্রয় না দেয়।

ব্রিজমোহন বিমূঢ়। —কেন, গণ্ডগোল হতে যাবে কেন?

—কা মালুম মালেক, এইসব হুকুম আগইল। আবো জানালো, লোহার গাঁওয়ের দায় তার নয়, হুকুম-মাফিক এই গাঁওয়ের হুজুবদের সে বলে গেল।

সবিনয়ে আর তুই একটা সাধারণ কথা বলে সঙ্গীকে নিয়ে আবার সে মোটর বাইকে চেপে প্রস্থান করল।

মাতব্বরদের কারো মুখে কথা নেই খানিকক্ষণ। ··এই রাতেই ভূমিসেনা পাঠিয়ে হীরা মল্লার এলাকা সরগরম করে আসার প্ল্যান মাথায় ঘুরছিল তাদের। তার মধ্যে এ কি অবাক কাণ্ড!···আগে থেকে খবর পেলে এ-রকম হুঁশিয়ারি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে ব্রিজমোহনের এম এল এ ভাগ্নে পবনকুমার। হয়তো গাঁয়ের কারো যোগসাজশে কিছু খবর পেয়েছে। ···কিন্তু ঠাকুর কুন্দন সিং তো তার মিত্র, তার গাঁওকেও এই সঙ্গে জুড়ল কেন! তারপর ভাবল, পোলিটিক্যাল আদমীরা এই রকমই, এই মুহূর্তে যে পরম মিত্র, পরের মুহূর্তে সেই পরম তুশমন।

যা-ই হোক, এই দিনটা খুব অনুকূল নয়, মাতব্বরেরা এটুকু বুঝেছে।

ব্রিজমোহন বাবুয়াকে ডেকে তার অনুচরদের নিয়ে চলে যেতে বলল। আপাতত তাদের কিছু করার নেই—কারো সঙ্গেই কোনরকম হামলা বা গণ্ডগোলের মধ্যে যাবার দরকার নেই।

রাত্রি।

তিতলি শাওন দুলারী তিনজনেই স্তব্ধ নির্বাক।

তোতারাম আজকের পঞ্চের বৈঠকের আদ্যোপান্ত বলেছে। একটু চুপ করে থেকে সে মন্তব্য করল, আজ মাতব্বরদের নসিব খারাপ বলতে হবে, কোনো কিছুই তাদের মনের মতো হয়নি। সেদিক থেকে ভাবলে দোস্ত-এর (শাওনের) নসিব হয়তো ভালো—

তিতলি আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল, কিন্তু ওই রামকেলির কি হবে, কুন্দন সিং-এর ভূমি-সেনার দল তাকে নিয়ে গিয়ে কি মেরে ফেলবে?

রামকেলিকে তিতলি চোখেও দেখেনি কখনো। কিন্তু তার জন্য বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। সাদা-মাটা গলায় তোতারাম বলল, মেরে না ফেলে তাকে স্বর্গসুখেও রাখা হতে পারে।

এক এক করে বারোটা দিন কাটল তারপর। প্রকাশ দীক্ষিত পঞ্চের সেই বৈঠকের পরদিনই পাটনা ফিরে গেছেন। তারপর থেকে আর কোনো খবর নেই। এই অনিশ্চিত ভাগ্যের মোহনায় বসে থাকতে থাকতে শাওনের ভিতরটা এক এক সময় বিদ্রোহ করে ওঠে। পাটনায় গিয়ে চাকরি রিজাইন করার জন্য প্রস্তুত হবে কিনা ভাবে। তিতলি তাকে আগলে রাখে। এই জীবনে সে-ই সম্বল, সান্ত্বনা। তার মনের অবস্থা দেখে দরজা বন্ধ করে নাচে, গান শোনায়, তার বুকে নিজের চিবুক ঘষতে ঘষতে বলে, কিষণজীর কিরপায় সব ঠিক হয়ে যাবে—তুমি কিছু ভেব না—এখান থেকে চলে যদি যেতে হয় আমরা মাথা উঁচু করেই যাব!

শাওনের তখন মনে হয়, এই একটি মেয়ের জন্য জীবনের সব দুর্যোগ সহ্য করা যায়।

এই ক'দিন ধরে একটাই খবর মাসাউরিতেও ভেসে আসছে। লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং-এর বুকের ব্যামো এবারে ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে জ্ঞান থাকছে না। পাটনাতে তিন বড় ডাক্তারের কমিটি বসেছে লোহার গাঁওয়ে। অক্সিজেন চলছে। দিল্লিতে টেলিগ্রাম করে তার এম পি ভাইকে আনানো হয়েছে।

শাওন ভার্মার এটা কোনো নিদারুণ খবর ভাবার কারণ নেই। মুখে না বললেও তিতলি এর পিছনে কিষণজীর কিরপাই ভাববে না ব্রিজমোহনের আরো ভীষণ অত্যাচারের পূর্বাভাষ দেখবে জানে না। লোহার গাঁওয়ের ওই মানুষ ভয়-ডর জানে না। আর ছুপার এই মানুষ বিপাকে পড়লে ভীতত্রস্ত, এটুকুই যা ভরসার কথা।

ছ'দিন আগে খবর এলো কুন্দন সিং-এর অবস্থা আরো খারাপ। তোতারাম এসে বিষণ্ণ তুলারীকে লোহার গাঁওয়ে নিয়ে চলে গেল। ফলে শাওন আর তিতলি স্বস্তি বোধ করল একটু। কুন্দন সিং-এর অবস্থা খারাপ শোনার পর থেকেই তুলারীর উতলা মুখ, বেশি খারাপ শুনলে মুখে শোকের ছায়া। তার এই মনের সঙ্গে শাওন বা তিতলি মন মেলায় কি করে? আর মন-রাখা কপট উদ্‌বেগই বা প্রকাশ করে কি করে?

তেরো দিনের দিন ওদের ছ'জনেরই জীবনে আবার যেন নতুন সূর্যোদয়। অভাবিত সূর্যোদয়।

সকাল আটটায় ফটকের সামনে সাইটের জিপটা এসে দাঁড়ালো। জিপ থেকে নামল শাওনের সাইটের সহকারী, যে এতদিন তার হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। তার হাতে একটা বড় খাম, আর ক্যালেণ্ডারের মতো কাগজে মোড়ানো কি। এসে হাসি মুখে জানালো, খুব ভোরে পাটনা থেকে সে সোজা এখানে আসছে। প্রকাশ দীক্ষিত তাকে তাগিদ দিয়ে সকালেই চলে যেতে বলেছেন। খুব ভালো খবর আছে।

তাকে বসতে দিয়ে শাওনও বারান্দায় বসল। তার হাত থেকে বড় খামটা হাতে নিল। ভালো খবর শুনে তিতলিও পায়ে পায়ে না বেরিয়ে এসে পারল না।

—হ্যাঁ, ভালো খবরই বটে। তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার হেড অফিস তাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দিয়ে সসম্মানে আবার কর্ম-ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছে। গাঁয়ের যে মাতব্বরদের হীন

চক্রান্তের ফলে মিথ্যা অভিযোগ এনে ভারত সরকারের একজন সৎ পদস্থ কর্মচারীকে অপদস্থ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার জন্য রাজ্য সরকারকে লেখা হবে, এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এটুকু কোনো চমকের খবর নয়।

ক্যালেণ্ডারের মতো মোড়ানো কাগজ খুলে সহকারী এবারে যা শাওনের হাতে দিল, আসল চমক সেটাই।

একই তারিখের খবরের কাগজের দুটো কপি। আজকের নয় গত কালের কাগজ। নিচের দিকে শাওন ভার্মা আর অচ্ছুত-কন্যা তিতলির বিয়ের ছবি। যে-ছবি বিয়ের রাতে "ইসমাইল প্লীজ" বলে তোতারাম তুলেছিল। কিন্তু খবরটা এখানকার নয়, দিল্লির। ওপরে হেডিং, জাত-পাতের সমাধির নজির! ছবির নিচের খবর, ভারত সরকারের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ব্রাহ্মণ সন্তান শাওন ভার্মা একটি অচ্ছুত কন্যাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে দীর্ঘ দিনের এক অন্ধ সংস্কারের মূলে আঘাত করেছেন। নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এর আগে আপদে বিপদে সমাজের ওই অপাংক্তেয় অচ্ছুতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, নিজের টাকায় নিজের পরিশ্রমে গভীর কুঁয়ো খনন করে দিয়ে বিস্তৃত একটি অচ্ছুত এলাকার দীর্ঘকালের পরিশ্রুত জলের অভাব দূর করেছেন। জাত্যাভিমানের যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এতকাল ধরে ছুত, আর অচ্ছুতদের মধ্যে হিংসার স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়েছিল, আশা করা যায় এমন একটি উদার বিবাহের বীজের মধ্যে তার ধ্বংসের ঘোষণা শোনা যাবেই। পরের খবর, জাতের মানুষ মর্যাদা দিয়ে কোনো অচ্ছুতকে বিয়ে করলে ভারত সরকার যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী শ্রীশাওন ভার্মাকে শিগগীরই পুরস্কৃত করা হবে। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট ভূ-তত্ত্বের দপ্তরও এই উদার দায়িত্বশীল কর্মীটিকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করার কথা চিন্তা করছেন।

খবরের কাগজের এক কপি শাওন পড়ছিল, অন্য কপি তিতলি। পড়া শেষ হল। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালো। দু'জনেরই চোখের কোণ শিরশির করছে। বিস্ময়ে অভিভূত। এ খবর দিল্লি পৌঁছুলো কি করে, এই বিয়ের ছবি কাগজের দপ্তরে গেল কি করে?

সহকারীটি হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। জানালো প্রকাশ দীক্ষিত নিজে পঞ্চাশ কপি কাগজ কিনে তার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। বলেছেন দু' কপি এখানে দিয়ে বাকিগুলো ছুপা আর লোহার গাঁওয়ে বিলোতে হবে। ছুপায় বিলি করা শুরু হয়েছে, আর বাকি কপি লোহার গাঁওয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

পরে হবে বলে জলযোগের অনুরোধ না রেখে সে চলে গেল।

শাওন আর তিতলি এমনি অভিভূত যে তারা হাসবে নাচবে না কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এই রকম একটা ব্যাপার কি করে ঘটতে পাবে তাদের মাথায় আসছে না।

সকাল দশটা নাগাদ আর একটা গাড়ি ফটকের সামনে দাঁড়ালো। খুব পুরনো ধরনের ঝরঝরে অথচ নামকরা গাড়ি। গাড়ি থেকে যে নামল তাকে দেখে দু'জনে আরো অবাক। তোতারাম। এটা তাহলে লোহার গাঁওয়েব কুন্দন সিং-এর গাড়ি!

নেমেই তোতারাম ছুটতে ছুটতে চলে এলো। তারপরেই এরা দু'জন বিমূঢ়, হতভম্ব! তোতাবাম দাওয়ায় বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্না, সেই সঙ্গে আর্তনাদ।—তিতলি শাওন! হাম লোগঁনকা দেওতা, লোহার গাঁওকি দেওতা, গরিব আওর অছুত্‌কা দেওতা ঠাকুর কুন্দন সিং চল্‌ গইলঅ—ঠাকুর সাহাব গুজর গইল্‌অ, আর কভু না বাত করবু—তোতা-তোতা বোল্‌কে আর কভু হামে না বোলাইবু—শুন্‌ তিত্‌লি শুন্‌, রহুয়া মহা-নিদ্‌মে গইলী—তোঁহার পালন-পিতাকা ভোরো চার বাজে অন্ত্‌কাল হো গইলে!

তিতলি কলের পুতুলের মতো তার পাশে বসে পড়ল। সে কেবল বুঝতে পারছে কুন্দন সিং আর নেই—কিন্তু ব্রিজমোহনের চামচা তোতাচাচা এ-রকম কাঁদছে কেন! পাগলের মতো সে এ-সব কি বলছে! তিতলি কিচ্ছু বুঝতে পারছে না কিন্তু কি এক অজানা আশংকায় বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে।

শাওন নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

তোতারাম আবার আর্তনাদ করে উঠল, তিতলি তু হমার মু পর্‌ কা

দেখতানি? তোঁহার বাইশ বরষোয়াকা পালন্-পিতা ঠাকুর কুন্দন সিং গুজর গইল্ আর তু আভিতক পুকারকে না রোলি! আভিভি দৌড়কে উনহেকে পাস্ যানে না চাহিলি?

তিতলি বিমূঢ় বিভ্রান্ত। চিত্রার্পিতের মতো বসে। তোতা চাচা কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল!

এবার শাওনও মেঝেতে উবু হয়ে বসল। দু'হাতে তোতারামের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তোতাজী, তুমি এ-সব কি বলছ? তুমি তো ব্রিজমোহনের লোক, কুন্দন সিং তো তোমার শত্রু।

—ঝুট্ ঝুট্! ও ব্রিজমোহন চুহা ঠেরে, হম্ ঠাকুর কুন্দন সিংকা গোলাম, হমারী জিন্দেগী উন্‌হেকে চরণ পর—তু চল্ তিতলি—জল্‌দি চল্!

শাওন তাড়াতাড়ি উঠল। তোয়ালে কাঁধে এক মগ জল নিয়ে ফিরল। তোতারামের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাকে ঘরে এনে বসালো।

—আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার খুব শোক হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি···কিন্তু কুন্দন সিংকে তুমি তিতলির পালক পিতা বলছ কেন?

ঘোলাটে শোকার্ত চোখে তার দিকে চেয়ে তোতারাম জবাব দিল, হাঁ তিতলির দেড় বরষ বয়েস থেকে রহুয়া কুন্দন সিং তার পালক পিতা।

—কিন্তু নথ-ভাঙানির আসরে সে তো তাকে কিনতে এসেছিল, কিনেও ছিল···।

হ্যাঁ, তিতলি বিটিয়াকে রক্ষ্‌সা করার জন্য সে তাকে কিনতে এসেছিল, কিনেছিল।

উন্মুখ আগ্রহে তিতলি তার দিকে ঝুঁকল।—কে তাকে নেওতা দিয়েছিল, কে তাকে নথভাঙানির আসরের খবর দিয়েছিল?

—হম্। আজ উনিশ বরষ যাবত তোহার সব খবর আমিই রহুয়াকে দিয়ে আসছি, আর কেবল এই জন্যেই লোহার গাঁও ছেড়ে ব্রিজমোহনের

চামচা সেজে এখানে পড়ে আছি—কেবল তোঁহার খাতির।

এরা দু'জনেই স্তব্ধ খানিক। শাওন ভার্মার মনে পড়ল নথ-ভাঙানির আসরে কুন্দন সিং দু'তিনবাব নিবিষ্ট চোখে ওকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। সাগ্রহে বলে উঠল, তোতাজী, আমরা এখনো যে কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি আরো একটু খুলে সব বলো আমাদের!

তোতারাম আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। আবার তার চোখে জল। বলল, হাঁ, এখন সব বলার সময় হয়েছে।

এরপর ক্লান্ত টানা গলায় তোতারাম ঘটনা পরম্পরায় যে চিত্রটি তাদের সামনে তুলে ধরল, শুনতে শুনতে শাওন আর তিতলি নির্বাক, নিস্পন্দ। তাদের স্নায়ুগুলো শুধু থেকে-থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

...এই যে কুঠিয়াতে এখন শাওন আর তিতলি বাস করছে, এটা রহুয়া কুন্দন সিং-এর। উইল করে এই কুঠি এখন সে তার মেয়ে-জামাই তিতলি আর শাওনকে দিয়ে গেছে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিতলির মা বসন্তীয়া কুন্দন সিং-এর আশ্রয়ে এসে তার এই কুঠিতেই ছিল। এখন যে ঘরে শাওন আর তিতলি থাকে বসন্তীয়া সেই ঘরেই থাকত। বলদেওর দোস্তদের মধ্যে বসন্তীয়ার গানের সব থেকে বড় ভক্ত ছিল কুন্দন সিং। বলদেও তা জানত। টাকার দরকার হলে, মদের দরকার হলে জোর করেই বসন্তীয়াকে তার কাছে ঠেলে পাঠাতো। তোতারাম নিজের চোখে বসন্তীয়াকে অনেক দেখেছে, তার স্নেহ পেয়েছে। বসন্তীয়ারও খুব গোঁ ছিল। টাকার জন্য বা মদের জন্য কুন্দন সিং-এর কাছে কিছুতে যেতে চাইত না। ফলে বেদম মার খেত। হঠাৎ-হঠাৎ এসে সেই মার তোতারাম স্বচক্ষে দেখেছে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে কুন্দন সিংকে খবর দিয়েছে। তক্ষুনি টাকা এসেছে, মদ এসেছে।

...হাঁ, কুন্দন সিং বসন্তীয়াকে ভালবাসত। এত ভালো পৃথিবীর কোনো মরদ কোনো আওরতকে বেসেছে কিনা তোতারাম জানে না। তার আশ্রয়ে এসে বসন্তীয়াও তাকে কম ভালোবাসেনি। কিন্তু তার ভালবাসার আর একটা দিক পড়ে আছে তার মেয়েব বাপ বলদেওর দিকে। এই ভালবাসাও কম কিছু নয়। মরদকে ছেড়ে তার আশ্রয়ে আসার পরেও

কুন্দন সিং সেটা বুঝতে পারত।

…এই কুঠিতে লোহার মানুষ কুন্দন সিং-এর আনন্দের এক অদ্ভুত সুন্দর উৎস তিতলি। তার সঙ্গে খেলা করার সময় অমন জাঁদরেল পুরুষ একবারে বাচ্চা ছেলে হয়ে যেত। নিজে ঘোড়া হয়ে তিতলিকে পিঠে চড়িয়ে এই বাংলোর চার দিকে ঘুরে বেড়াতো। কুন্দন সিং-এর হাঁটু ছড়ে যেত, বসন্তীয়া রাগ করত, হাঁটুতে ওষুধ লাগিয়ে দিত। কিন্তু কুন্দন সিং-এর ঘোড়া হয়ে তিতলিকে পিঠে চাপিয়ে ওর খিলখিল হাসি না শুনলে মোটে ভালো লাগত না। মাকে লুকিয়েও মেয়েকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো।

তিতলির সাড়ে তিন বরষ বয়েস পর্যন্ত এইভাবেই কেটেছিল। বসন্তীয়ার মলিন মুখ দেখে কুন্দন সিং বুঝতে পারত তার মনটা এখনো ঘরের মরদের দিকে পড়ে আছে। তাদের দু'জনের ভালবাসার মধ্যেও সত্যিকারের ময়লা কিছু ছিল না এ কুন্দন সিং জানত। কিন্তু বসন্তীয়া আর তিতলিকে ছেড়ে সে থাকে কেমন করে? শেষে বসন্তীয়া একদিন মন স্থির করে ফেলল। সে মেয়ে নিয়ে তার মরদের কাছে ফিরে যাবে। বলদেও তখন ছুপায় থাকে। মেয়ের জন্য, মেয়ের ভবিষ্যত ভেবেই বসন্তীয়াকে যেতে হবে। মরদ যদি তাকে না নেয়, তাহলে তিতলিকে বাপের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে। কিন্তু তিতলির জীবন পরিচ্ছন্ন রাখতেই হবে।

কুন্দন সিং-এর বুক ভেঙে গেল। কিন্তু সে বাধা দিল না। তিতলি আর বসন্তীয়াকে নিয়ে তোতারামই ছুপায় এলো। গ্রামে ঢুকেই বসন্তীয়া তোতারামকে বয়েল গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে সন্ধ্যের মুখে একলা মরদের ঘরে চলল।

…পরদিন। টেবিলের ড্রয়ারে কুন্দন সিং বসন্তীয়ার ছোট্ট একটা চিঠি পেল। কোন কারণে তার যদি কোনরকম অঘটন ঘটে, রহুয়া যেন তার মরদকে তিতলির বাপকে ক্ষমা করে, তার মাথায় যেন বদলার আগুন না জ্বলে।

চিরকুট পেয়ে কুন্দন সিং-এর মাথা খারাপ হবার দাখিল। ওটা যখন পেয়েছে তখন রাত। করার কি আছে। তার পরদিন সকালে তোতা-রামকে পাঠালো খবর নিতে। তোতারাম এসে দেখল বলদেওর ঘর তালা-

বন্ধ। সে বা বসন্তীয়ার কোনো পাত্তা নেই। তিতলির মৌসির হদিস পেয়ে সেখানে গিয়ে তিতলিকে পেল। শুনল, বসন্তীয়া এসে তিতলিকে বাপের কাছে রেখে সেই রাতেই ফিরে গেছে। আর তারপর থেকে বলদেও মল্লা নিজেও নিপাত্তা।

শোনামাত্র কুন্দন সিং বুঝেছে বড় রকমের অঘটন কিছু ঘটে গেছে। সে পাগলের মতো হয়ে উঠল। বলদেওর খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠালো। পুলিশকে খবর দেবে দেবে করেও দিল না। বসন্তীয়ার শেষ অনুরোধ মনে পড়েছে।

একদিন বলদেও নিজেই কুন্দন সিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালো। পাগলের মূর্তি, পাগলের চোখ। বলল, শুনলাম আমাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, আমিও ভাবলাম বোকার মতো পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ কি, তাতে আরো যন্ত্রণা। চলে এলাম।

পালা-গান লেখায় সিদ্ধহস্ত এই গুণী মানুষটাকে কুন্দন সিং এককালে ভালোবাসত। বসন্তীয়ার ওপর অত্যাচারের ফলে সেই ভালোবাসা ঘৃণায় এসে ঠেকেছিল। রুদ্ধশ্বাসে জিগ্যেস করল, বসন্তীয়া কোথায়?

—জঙ্গলে ঘুমোচ্ছে।

কুন্দন সিং আর্তনাদ করে উঠল, কোথাকার জঙ্গলে?

—ছুপার জঙ্গলে।

—তুমি তাকে খুন করেছ—বসন্তীয়াকে তুমি খুন করেছ?

—বসন্তীয়াই যে ভুল করল···আমি তার সঙ্গে একটাও কথা বলছিলাম না, গুম হয়ে বসেছিলাম। সে তিতলিকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখে একটা শরাবের বোতল এনে আমার সামনে খুলে দিল। সেই বোতল শেষ হতে আমার মাথায় খুন চাপল।··আমি তাকে বেশি কষ্ট দিলাম না, এই দুই হাতে আর দশটা আঙুলের চাপে দুই এক মিনিটের মধ্যেই যা হবার হয়ে গেল। রাতের আন্ধেরিতে তাকে কাঁধে করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুঁতে রেখে এলাম।

এ-পর্যন্ত শুনে তিতলি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাতের মৃদু চাপে শাওন তাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করল।

তোতারামকে জিজ্ঞেস করল, তারপর?

—কুন্দন সিং-এর মাথায় খুন চেপে গেল। মালিকের মন বুঝে ছাবুয়া আহির প্রস্তাব করল, একে এখন হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে চুনা কুটুরিতে ফেলে রাখা হোক, রাতের আন্ধেরিতে কোথাও গিয়ে কুঠার দিয়ে ওর হাত পা সব জিন্দা কেটে বস্তায় পুরে শেষে পুনপুন জলে ফেলে দিলেই হবে।

বলদেও আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। মিনতির সুরে কুন্দন সিংকে বলল, আমি তোমার হাতে মরার জন্য তৈরী হয়েই এসেছি—কিন্তু এত কষ্ট দিয়ে মেরো না, বসন্তীয়া এখনো আমাকে পেয়ার করে, তার আত্মা কষ্ট পাবে।

সঙ্গে সঙ্গে কুন্দন সিং ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল একটা। বসন্তীয়ার চিঠির সেই কথাগুলো যেন ফিসফিস করে কানে বাজছে।···রহুয়া যেন তার মরদকে—তিতলির বাপকে ক্ষমা করে, তার মাথায় যেন বদলার আগুন না জ্বলে।

কুন্দন সিং রাগে কাঁপছে আবার ঘেমেও উঠছে। আস্তে আস্তে তার গলা দিয়ে আগুনের ফুলকি ঝরল।—তোমাকে আমি এর থেকে ঢের বেশি কষ্ট দেব, তোমাকে আমি কিছুই করব না···তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাবে, তোমার ভিতরে যে আর্টিস্ট আছে সে তোমাকে কুরে কুরে খাবে বিবেকের আগুনে সারে জিন্দ্‌গী তুমি জিন্দা জ্বলবে, তিলে তিলে মরবে—ছাবুয়া, নিকাল দে উসকো!

তোতারাম জানালো, পরে রহুয়া কুন্দন সিং তাদের বলেছে, বলদেওর কি দোষ, বসন্তীয়ার মতো বহু ঘর ছাড়লে যে কোনো মরদের মাথায় আগ জ্বলবে, তাকে গলা টিপে মারবে—কুন্দন সিং নিজে হলেও তাই করত।

···এর পরেই কুন্দন সিং তোতারামকে লোহার গাঁওয়ে পাঠিয়েছে। তার পিয়ারের লোককে টেনে নিয়ে জব্দ করার জন্য ব্রিজমোহন তোতারামকে খুশি মনেই আশ্রয় দিয়েছে। কুন্দন সিং-এর হুকুমে ছুপায় তোতারামের আসল কাজ একটাই। তিতলির ওপর চোখ রাখা, কাউকে বুঝতে না

দিয়ে তার দেখাশুনা করা, তার প্রত্যেক দিনের খবর রাখা। সে এ-যাবৎ তাই করে আসছে। কুন্দন সিং জানত বসন্তীয়ার এই রূপের মেয়ে বড় হলে অনেক গিধর আর হাঙরের তার দিকে চোখ যাবে। সেই বাচ্চা বয়েস থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত তিতলির সমস্ত খরচ ঠাকুর সাহেবই চালিয়ে আসছে। তিতলির তেরো চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত হীরা মল্লা ভাবত খরচ তিতলির বাপের কাছ থেকে আসছে এক-কালে তো কম রোজগার করেনি, কাউকে জানতে দিতে চায় না বলেই তোতার হাত দিয়ে খরচ পাঠায়। কিন্তু তিতলির বয়েস চৌদ্দ পার হয়ে যেতে যেতে হীরা বুঝেছে বলদেওর সর্বস্বান্ত দশা, টাকাব আর মদেব জন্য সে-ই উল্টে তার ঘরে এসে ঝামেলা বাধায়। অথচ তখনো তিতলির খরচের বাবদ ফি মাসে আবো অনেক বেশি টাকা হাতে পাচ্ছে। ধূর্ত হীরা মল্লা তক্ষুনি ধরে নিয়েছে এখন এই টাকা আসছে ব্রিজমোহনের কাছ থেকে। ...কারণ ততদিনে তার পেয়ারের ভাতিজা বাবুয়ার শ্যেনচক্ষু তিতলির দিকে পড়েছে। কিন্তু আরো দু'তিন বছর যেতে হীরা মল্লার সেই ধারণাও বদলেছে। সে বুঝেছে, ব্রিজমোহন টাকা দিয়ে চলেছে নিজের লোভেই। এমন মেয়ে বয়েসকালে কি-রকমটি হবে সে-চোখ কি আর ঠাকুর ব্রিজমোহনের নেই। ফলে তিতলিকে নিয়ে হীরার লোভও দিনে দিনে বেড়েছে। ব্রিজমোহন তো আব কোনো শর্ত বা চুক্তি কবে টাকা দিয়ে যাচ্ছে না—টাকা যে পাচ্ছে হীরা মল্লার তা স্বীকার করারই দরকার কি? পুরুষের মন তার খুব ভালো জানা আছে।

...তিতলির বছর উনিশ বয়সের সময় তোতারামের মারফৎ হীরার কাছে ব্রিজমোহনের প্রস্তাব এসেছে। তিতলিকে সে রানীর হালে রাখবে, কত টাকা পেলে ওকে সে তিতলিকে ছেড়ে দেবে? হীরাব মাথায় ততদিনে নথ-ভাঙানির আসর বসানোর প্ল্যান এসে গেছে। বাইশ বছর পর্যন্ত তিতলিকে ঘরে রাখার একটা অজুহাত দেখিয়ে সে জানিয়ে দিয়েছে, ওই বয়সের পর নথ-ভাঙানির আসরে ঠিক হবে তিতলির মালিক কে হবে। হীরার আশা সেই আসরে রহুয়া ব্রিজমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সামর্থ্য কারো থাকবে না। ব্রিজমোহনও মোটামুটি নিশ্চিন্ত। এরপর তোতা-

রামেরই মারফতে ব্রিজমোহনের বাগান বাড়িতে গোপনে হীরার সঙ্গে যোগাযোগ আর কথা-বার্তা হয়েছে।

তিতলির খরচ শুধু নয়, তার বাপ বলদেওর খাওয়া-পরা মদের খরচ, বর্ষার ঘর ছাওয়ার খরচও সব কুন্দন সিংই দিত। একমাত্র সে-ই জানত, পালক পিতার মতো তিতলির সমস্ত খরচ কে চালিয়ে আসছে। এই জন্যেই মেজাজ বিগড়লে বলদেও মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিত তার মেয়েকে সুখে রাখা হয়েছে কিনা—সন্দেহ হলে হীরার ওপর হম্বি-তম্বি করত। কিন্তু ভুল করেও কখনো কুন্দন সিং-এর নাম প্রকাশ করে নি। তোতারাম তাকে সমঝে দিয়েছিল, কুন্দন সিং-এর নাম একবার ফাঁস হয়ে গেলে রহুয়া টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দেবে।

···এ-দিকে হীরা মল্লার নথ-ভাঙানিব আসর বসানোর প্ল্যান রেডি, তার ঢের আগেই তোতারাম আর কুন্দন সিংয়ের পাল্টা প্ল্যানও রেডি। কুন্দন সিং ততদিনে তোতারামের কাছ থেকে তিতলি আর ক্যাম্প ইন চার্জের সমস্ত খুঁটিনাটি শুনেছে। তোতারামের সজাগ দৃষ্টি তখন সর্বদাই শাওনের ওপর। ওদের দু'জনের পেয়ার খাঁটি কি মেকি সেটা বোঝার ওপরেই ভবিষ্যত নির্ভর করছে। তিতলির কথায় সাইটের কাজে লোক নেওয়া, তিতলির অনুরোধে নিজের খরচে শাওনের অছুত এলাকায় পাকা গহেরা কুঁয়া করে দেওয়া, তিতলির কথাতেই জিপে করে লছমীকে পাটনায় নিয়ে গিয়ে সময়ে অপারেশন করিয়ে তাকে বাঁচানো, শাওনের গুটি-রোগের সময় তিতলির নিঃসংকোচ সেবা—এ-সব শুনে কুন্দন সিং-এরও বিশ্বাস হয়েছে, ওদের পেয়ার খাঁটি বটে। নথ-ভাঙানির আসর বসার দিন-কতক আগেই টিকাটি পণ্ডিতকে জানতে বুঝতে না দিয়ে দেয়ালির রাতে সেখানে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এমন কি দু'দিন আগে টিকাটি পণ্ডিতের বাড়িতে ম্যাগনেসিয়াম তার আর কুন্দন সিং-এর বক্স ক্যামেরা পর্যন্ত মজুত। কুন্দন সিং-এর কতদূর পর্যন্ত মাথা যায় এই থেকেই বোঝা গেছে। ওকে হুকুম করেছিল, বিয়ের ফোটো তুলে নিবি, দরকার হবে···।

··তোতারামের বদ্ধ বিশ্বাস ছিল ব্রিজমোহন রাগে আর হিংসায় তার

ফাঁদে পা দেবেই। দিয়েছে। আক্রোশ মাথায় চেপে বসতে প্রথমে কুন্দন সিংকে জব্দ করা, পরে শত্রুকে দিয়েই শত্রু শাওন ভার্মাকে ঘায়েল করার উৎসাহে আত্মহত্যাব কথা বলে তিতলিকে তুলে আনার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। তার আগে তোতারাম অবশ্যই পুরো একবোতল শরাব ব্রিজমোহনের পেটে চালান করেছিল।....আর তারপর তোতারাম যে প্রস্তাবই করেছে তাতেই ব্রিজমোহনের প্রচণ্ড উৎসাহ।

···ব্রিজমোহনকে কুন্দন সিং সাবধান করে দিয়েছিল তাব হয়ে কেউ যেন ফয়েসলা করতে না যায়, বলেছিল, অন্যেব সাহায্যের দরকার নেই—ফয়েসলা যা করার সেরে উঠে ধীরে সুস্থে সে নিজে করবে—ততদিন পর্যন্ত শাওন ভার্মা বা তিতলির গায়ে যেন এতটুকু আঁচড় না পড়ে—ওদের দু'জনকে খুব নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেই তাকে সাহায্য করা হবে। এরপর কেউ ওদের শারীরিক ক্ষতি করতে সাহস করবে না এ-বিশ্বাস কুন্দন সিং-এর ছিল। কারণ ব্রিজমোহনের দল ধরেই নিয়েছিল রত্নুয়া সময় বুঝে ভীষণ বকমের কিছু প্রতিশোধই নেবে। তারা কোন্ দিক থেকে শাওন ভার্মাকে ব্যতিব্যস্ত এবং অপদস্থ করার জন্য তৈরি হচ্ছে, তোতারামের মুখে এ-খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়েই কুন্দন সিং দিল্লিতে তার এম পি ভাইয়ের কাছে লম্বা চিঠি লিখে বিস্তারিত জানিয়েছে, সেই সঙ্গে শাওন ভার্মা আব তিতলির বিয়েব ফটো পাঠিয়েছে, আর সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাওন ভার্মাকে যাতে পুবস্কৃত করার ব্যবস্থা হয় সেই চেষ্টা অবশ্যই করতে বলেছে। তারপর পাটনা থেকে ব্রিজমোহনের ভাগ্নে পবনকুমারকে ডেকে পাঠিয়ে তাকেও সব বলেছে, তার হাতেও শাওন আর তিতলির বিয়ের এক কপি ফোটো দিয়ে সময়ে ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে।

···প্রকাশ দীক্ষিত তদন্তে আসার পর কুন্দন সিং-এর পরামর্শ মতো তোতারামই ব্রিজমোহনকে প্রস্তাব দিয়েছে সাহেবকে লোহার গাঁওয়ের রত্নুয়ার কাছে নিয়ে যেতে। ব্রিজমোহন সানন্দে দীক্ষিত সাহেবকে সেই অনুরোধ তো করবেই। শাওন ভার্মা আর তিতলির সব থেকে জাঁদরেল শত্রু তো ঠাকুর সাহেবই··লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিং-এর কাছে আসার

পরেই দীক্ষিত সাহেব যা বোঝার জলের মতো বুঝে গেছেন। তার সঙ্গে রহুয়ার এক ঘণ্টার ওপর পরামর্শ হয়েছে। তোতারাম সারাক্ষণই সামনে উপস্থিত ছিল। দিল্লির থেকে এই বিয়ের জন্য শাওন ভার্মাকে পুরস্কৃত করার চেষ্টা হচ্ছে দীক্ষিত সাহেবকে রহুয়া তা-ও জানিয়েছে। আর ইট-সিমেণ্টের কারবারী গণপত লালাকে সত্যি কথা কবুল করানোর ভারও সেই-ই নিয়েছে।

দীক্ষিত সাহেব এই লোকের সঙ্গে দেখা করেই সব থেকে খুশি। ফেরার সময় জিপে দু'তিন বার বলেছেন, একজন মানুষের মতো মানুষ বটে।

···এরপর গণপত লালাকে ডেকে পাঠিয়ে কুন্দন সিং কি বলেছেন তোতারাম জানে না। কেবল এটুকু জানে সেই রাতেই সে ক্যাম্পে প্রকাশ দীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করে সত্যি কথা কবুল করে গেছে।

পঞ্চ-এর বৈঠকের আগে প্রকাশ দীক্ষিত আরো একবার লোহার গাঁওয়ে এসে কুন্দন সিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করে গেছেন। তখন অবশ্য তোতারাম ছিল না কারণ সে তখন খুব সংগোপনে কুন্দন সিং-এর ভূমি সেনাদের নিয়ে ছুপার মানুষদের তৈরি করতে ব্যস্ত। ঠিক হয়েছে, তিতলিদের অছুত এলাকার সকলে বৈঠকে আসার আর শাওন ভার্মার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার প্রতিশ্রুতি দেবে—কিন্তু একজনও আসবে না। এখন থেকে রহুয়া কুন্দন সিং আর তার সমস্ত ভূমি-সেনার শক্তি তাদের সহায়—ভয় পাবার কি আছে! আর দুঃসাহসের নজির দেখিয়েছে রামকেলি! মিথ্যে আদৌ বলেনি। এক সময় ব্রিজমোহন তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তার বাগান-বাড়িতে ওকে একাধিকবার আনা হয়েছে। আর এখনো তার প্রতি আসক্ত ব্রিজমোহনের ভাতিজা বাবুয়া।

সভায় দাঁড়িয়ে অপমানের ওই চূড়ান্ত প্রহসন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ক্রুদ্ধ মুখে রহুয়া তার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে তাকে নিজের ভূমি-সেনাদের হাতে গছিয়েছে। তারা পূর্ব ব্যবস্থা মতো তাকে সোজা লোহার গাঁওয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছে। কুন্দন সিং-এর দয়ায় রামকেলিকে আর পতিতার জীবন যাপন করতে হবে না।

শেষে তোতারাম আবার ভেঙে পড়ে বলল, তিতলি, অসুস্থ শরীর নিয়ে ঠাকুর কুন্দন সিং সেদিন ছুপার ওই বৈঠকে না এলেও হয়তো এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যেত না। ডাগদার বারণ করেছিল, রহুয়া কান দিল না। কেবল বলত, হামারী তিতলি বিটিয়াকা জিন্দেগীসে কাঁটা হটাইকে ফুঁলোসে ভর্ দেইকে যাইবু—স্বরগ্‌সে বসন্তীয়া দেখ্‌বু ওকরা বেটী খুশ রহে, আনন্দমে রহে। তিতলি শেষের ক'দিন রহুয়া কেবল তোদের দু'জনের কথাই ভেবেছে, তোদের দু'জনের কথাই বলেছে—আমি তার গাড়ি নিয়েই তোদের নিতে এসেছি—সকলে অপেক্ষা করছে—আর দেরি ক'রিস না, চল—যাবার আগে ছুপা থেকে তোর বাপকেও তুলে নিয়ে যেতে হবে—

তিতলির বুকের ভিতরটা কাঁপছে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে, দুই ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে···মা গো! সমস্ত পৃথিবীটাই এমন কাঁপছে কেন!

বুকের তলার কান্না বন্যার মতো চোখের পথে ধেয়ে আসছে, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। তিতলি কাঁদতে পারছে না।

...একটু আগে আনন্দ করতে করতে হীরা মল্লা কুন্দন সিং-এর মৃত্যুর খবর দিতে এসেছিল। বলেছিল, লোহার গাঁওকা ঠাকুর কুন্দন সিংকা অন্তিম কাল ভইলা—খুশিসে হমারা অন্তরাত্মা এত্‌না খুশ হইলন যে তুহাকে কইসন বুঝাই—

বলদেও খানিক হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের কোণের দিকে গেছে—জঙ্গলে যাবার সময় যে ডাণ্ডাটা তার হাতে থাকে সেটা তুলে নিতেই হীরা মল্লা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।

লাঠিটা ফেলে দিয়ে খানিক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলদেও জঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছে।

কুন্দন সিং-এর গাড়ি তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজা খোলা। ভিতরে কেউ নেই।

তোতারামের নীরব ইশারায় তিতলি আর শাওন তার পিছনে পিছনে জঙ্গলের দিকে চলল। তিতলির সমস্ত শরীর আবার শিরশির করে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠল। বাপু কেন এত জঙ্গলে যায়, কখনো সমস্ত রাত

কাটিয়ে আসে, এ কৌতূহল অনেক দিনের। আজ আর কোনো কৌতূহল নেই। কিন্তু ভিতরটা এত উন্মুখ যে এত ধীরে নয়, ছুটে ভিতরে যেতে ইচ্ছে করছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেশ কষ্ট করে অনেকটা আসার পর সামনে একটা বড় ঝোপ। খুব সন্তর্পণে সেটা পেরিয়ে এসে তিনজনেই থমকে দাঁড়ালো। নির্বাক, নিস্পন্দ। সামনে একটা উঁচু টিপির মতো। পরিচ্ছন্ন। টিবির চারপাশও তকতকে। এই সকালেরই অনেক আধ-শুকনো ফুল চারপাশে ছড়ানো।

টিপির দিকে মুখ করে মাটির ওপর বসে আছে তিতলির বাপু বলদেও মল্লা। মনে হচ্ছে না এই নির্জনে সে একলা বসে আছে। বসে আর কোন একজনের সঙ্গে যেন কথা কইছে। এত তন্ময় যে পিছনে তিনজন দাঁড়িয়ে টেরও পায়নি। —এ বসন্তীয়া, তু ধরতি মাইয়াকা গোদমে শুত্‌ রহলী···শুনথই হীরা কা কহল? কুন্দন সিং চলবসে তু শুনথই বসন্তীয়া? উকার সাথ হমার আখেরি খেল্‌ না হইল, উ জিত্‌কে তেরা মেরা রাজা রহল—তোঁহার তিত্‌লিকা জিন্দেগী ও সোনাসে বনা দিহল আওর হমারকে আখেরিবার মুসকরাইকে চল্‌ গইল্অ—

অতবড় দেহের মাথাটা খানিক বুকের ওপর ঝুলে রইলো। ওই মাথা তুলে তারপর পিছনে ঘুরে তাকালো। দুই চোখ জবা ফুলের মতো লাল।

রাগ নয়, খুব ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, তোহলোগ্ন হামে ঠাকুর সাহাবকা পাস লেনে আহল?

তিতলির বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো চোখে জল আসছে না। টিবিটার দিকে চেয়ে আছে। ওখানে তার মা ঘুমোচ্ছে।

তোতারাম মাথা নাড়ল, এগিয়ে এসে বলদেওর একখানা হাত ধরল। —আওর দের না কর, ঠাকুর কুন্দন সিং তিতলি শাওন আর তোঁহার খাতির বহুত্‌ সময়সে শুত্‌ রহল্অ।

কোনরকম বাধা না দিয়ে বলদেও মল্লা উঠল। লাল আর ঘোলাটে অপলক চোখে শাওন ভার্মাকে খানিক দেখল।

হুপুর প্রায় তিনটে তখন। কুন্দন সিং-এর হাবেলীর সামনে বিশাল জনতা। আশ-পাশের সমস্ত গাঁয়ের মানুষ হাবেলীর সামনের এই বিশাল প্রান্তরে এসে মিশেছে। এদের বেশীরভাগই অতি সাধারণ মানুষ, গরিব মেহনতী মানুষ। এই জনতায় ছুত-অছুত মিলে-মিশে একাকার। সব গাঁয়েরই গণ্যমান্য জনেরা এসেছে, ভূস্বামীরা এসেছে। তারা হাবেলীর ছাওয়ায় লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষকে শেষ বিদায় জানানোর অপেক্ষায় আছে।

হাবেলীর বাইরে সামনের দরজার সামনেই সাজানো চালিতে কুন্দন সিং-এর দেহ শয়ান। দর্শনার্থীদের সুবিধের জন্যে তাকে এখানে রাখা হয়েছে। এখানে ভিড় করতে দেওয়া হচ্ছে না, সার বেঁধে মেয়ে পুরুষেরা আসছে, দেখছে, শেষ প্রণতি জানিয়ে চলে যাচ্ছে।

খাটের হাত-কতক সামনে মাইক ফিট করা। বিশেষ কে এলো না এলো মাঝে মাঝে ঘোষণা করছে চুনীলাল মাস্টার। এ ছাড়া থেকে থেকে কেউ কেউ হু'চার মিনিটের জন্য মাইকে শোক-বার্তা জানাচ্ছে, কেউ বা একটু আধটু স্মৃতিচারণ করছে। এ-গাঁয়ের ভূমিসেনাদের অনেকেই মাইকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলছে।

হাবেলী ঘেঁষে ঠাকুর কুন্দন সিং-এর অতিপরিচিত গাড়িটা আস্তে আস্তে আসতে দেখে সামনের বিশাল জনতা খানিকক্ষণের জন্য থমকে চেয়ে রইলো। ভূমিসেনাদের তরফ থেকে হু'তিনবার ঘোষণা করা হয়েছিল, ঠাকুর কুন্দন সিং-এর বিশেষ একজন আপনার জন আসছে, সকলে যেন শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়তো আঁচ করতে পেরেছে কে আসছে। কানাঘুষায় শুনে থাকবে তোতারাম কোথায় কাকে আনতে গেছে। কিন্তু সামনের ওই বিষণ্ণ জনতার কারোরই ধারণা নেই রহুয়া কুন্দন সিং-এর এমন কে আত্মজন আছে যার আসার খবর হু'তিনবার মাইকে ঘোষণা করা হল। রহুয়ার আত্মজন বলতে এম পি ভাই আর তার পরিবারবর্গ। তারা তো হু'দিন আগেই এসে গেছে। পাটনা থেকে এসেছে রহুয়ার স্নেহাস্পদ এম এল এ পবনকুমারও—সে-ও ঠাকুর সাহেবের সম্পর্কে কত দর্দ-ভরি কথা শুনিয়েছে সকলকে।

কিন্তু এখন ঠাকুর সাহেবের গাড়িতে কে এলো? কোথা থেকে এলো?

গাড়ি থেকে নামল তিতলি, বলদেও মল্লা, শাওন ভার্মা, তোতারাম।

জনতার মধ্যে বেশ কাছে যারা, তাদের চোখে তুটি মুখ কেমন চেনা চেনা লাগল। একটি মেয়ের মুখ আর একটি ছেলের মুখ কোথায় যেন দেখেছে। আজই যেন দেখছে। হ্যাঁ আজই সকালের কাগজে দেখেছে। ঠাকুর কুন্দন সিংয়ের ভূমি-সেনারা আজই কতগুলো খবরের কাগজ বিনে পয়সায় লিখি-পড়ি জানা লোককে বিলি করেছে। তাতে এক অছুত মেয়ের সঙ্গে এক ব্রাভন বড় অফ্‌সর ছেলের বিয়ের ছবি ছিল। বিয়ের খবর ছিল। দিল্লির সমজদারির কথা ছিল। ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে অনেকটা সেইরকমই তো লাগছে!

…খাট ঘেঁষে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তিতলি তু'চোখ টান করে চির-ঘুমে শয়ান ওই মানুষটাকে দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে। লম্বা পাতলা দেহ, ফর্সা মুখ, পাকানো গোঁপ, ঠোঁটের ফাঁকে একটু চাপা হাসির আভাস।…এ কি হল তিতলির! এ কবেকার দৃশ্য বিস্মৃতির অতল থেকে তার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠল?

…হ্যাঁ, মাসাউরির যে বাড়িটাতে তারা এখন বাস করছে, সেই বাড়ির সেই ঘর আর দাওয়াই তো বটে। একটা লোক, ঠিক এইরকম দেখতে—তুই হাঁটু আর তুই হাতে ভর দিয়ে মাটিতে ঘোড়া হয়েছে—তার পিঠের চেপে বসে আছে সাড়ে তিন বছরের এক মেয়ে, মুখে হ্যাট হ্যাট করছে ছোট ছোট তু'পা দিয়ে তার পাঁজরে মারছে আর খিলখিল করে হাসছে। ওই মানুষ / ঘোড়া তাকে নিয়ে ঘরে আর বারান্দায় চক্কর দিচ্ছে।

—উতর যা বিটিয়া, হমার ঠেওনা (হাঁটু) ছিঁড় গইল।

কিন্তু সেই তুষ্টু মেয়ে নামতে রাজি নয়।

কোথা থেকে একজন ছুটে এলো, সেই একজনের মুখও চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল তিতলির—ওই ছোট্ট মেয়ের মা—রাগত মুখে একটানে তাকে লোকটার পিঠ থেকে ধুপ করে মাটিতে নামালো। ওই লোকের তুই হাঁটুর কাপড়ের ওপর রক্ত দেখে মেয়েটার মা আরো ক্রুদ্ধ।

…পরের দৃশ্য। ওই ঘোড়া-মানুষ বসে। তার ঠোঁটের ফাঁকে ঠিক এইরকম একটু হাসির রেখা।…মা তুলো দিয়ে তার তুই অনাবৃত রক্তাক্ত

হাঁটুতে দাওয়াই লাগাচ্ছে—ওই লোক আর ছোট্ট মেয়েটার দু'জনেরই ওপর রাগে গজগজ করছে।

ধড়ফড় করে তিতলি যেন কোথা থেকে আবার এখানেই ফিরে এলো। আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে মাটিতে অন্তিম যাত্রীর পায়ের কাছে বসল। খুব সন্তর্পণে রাশীকৃত ফুলের স্তূপ সরিয়ে তার পা দু'খানা নিজের বুকের কাছে টেনে নিল। ওই পায়ের ওপর কপাল আর মাথা রাখল। অনড়, নিশ্চল, এতক্ষণের রুদ্ধ কান্না চোখের আগল ভেঙে মুক্তির পথ পেল। চোখের জলের ধারায় মৃতের দু'পা ভিজে যেতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে তিতলি মুখ তুলল। দুলারী। হাত ধরে তাকে তুলল। ভূমিসেনারা দুলারী বহিনকে বলছে কিছু। দুলারী তিতলিকে এনে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। শাওন ভার্মাকে ধরে আর একজন তার পাশে নিয়ে এলো।

দুলারী তিতলির কানে কানে বলল, সামনের এই হাজার হাজার লোকের বেশিরভাগই অছুত আর গরিব মানুষ। এদের তুই কিছু বল—

তিতলি সামনে তাকালো। চোখের জলে তখনো দু'গাল ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু অনন্য সুন্দর মুখখানা তপতপে লাল হয়ে উঠতে লাগল, জলে-ভরা দু'চোখ ঝকঝক করে উঠতে লাগল। মাইকে তার গলা মৃদু, তারপর ধীর নিটোল পরিপুষ্ট।

—কোই দেশপ্রেমিক কহা থা, দেশকা আত্মা গাঁওমে বাস করি। ও সাচ কহা থা। তো-লোগঁনকা মু পর ও আত্মাকা রূপ হম্ দেখতানি···

··হমারী অছুত আওর গরিব মা-বাপুলোগঁন, হমারী অছুত ভাই আওর বহিন,—ম্যাঁয় তিতলি হুঁ। ছুপা গাঁওকি এক অছুত লেড়কি তিতলি। কোই কভু না জানল দেড় সাল উমরোঁয়াসে কওন্ হামে লালন করল কোই না জানল আজতক কওন হমার ইজ্জত আবরু রক্ষসা করল। ও হমারী পালন-পিতা লোহার গাঁওকি এ হি ঠাকুর কুন্দন সিং সাহাব! কোই না জানে সমাজকা গিধর আওর মগরকা (কুমীর) লোভী কালা হাতোঁসে রক্ষসা করকে মহাত্মা ঠাকুর সাহাব এ ব্রাভন কুমার শাওন ভার্মাকা সাথ হমার সাদী দিহল, সাহারা দিহল নয়ি জিন্দেগী বসাইলঅ

—এক অছুত লেড়কিকা খাতির জাত-পাত ছোঁয়া-ছুঁতকা লড়াইমে সারে অছুত লোগঁনকে জিতাইকে নয়ি জিন্দেগীকা ডাগরোঁয়ামে (পথে) চড়াইল।

জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগল। তিতলি / শাওন! আজ আকবরমে তোঁহারা ফোটো দেখলী! খবর পড়লী! খবর শুনলী!

তিতলির কান্না-ভেজা মুখ আরো উদ্ভাসিত, আরো রক্তাভ। তার গলার আওয়াজ আরো হৃদয়স্পর্শী।—হাঁ মা-বাপুলোগঁন—হাঁ ভাই আর বহিন, হম্ ও অছুত কন্যা তিতলি আর এ ব্রাভন কুমার শাওন। এ যুদ্ধ মে অছুত লোগঁনকা জয়কা লিয়ে ঠাকুর কুন্দন সিং আজ শহীদ দানব-কুলোআমে প্রহ্লাদ বন গইলন। ইতিহাসোঁমে প্রহ্লাদ আওর হ্যায় কি নাহী—হম না জানথ, না জানিলা।···আজ ঠাকুর সাহাবকা দেহান্ত হইলন, লেকিন শহীদ কুন্দন অমর-রহলন। হমার মা-বাপু ভাই-বহিন, তো আপন জনমকা কসম খাইকে শপথ লিহ—অছুত লোগঁনকা গরিব লোগঁনকা এ বিজয়-ঝণ্ডা খাড়া রহে, উঁচা রহে—চাঁদ সূরযোয়াকা সাথী হইকে! উঁচা জাতকা গিধর আওর মগরোয়াকা ডরসে লালচোয়াসে এ ঝণ্ডা কভু না নিচে ঝুঁকে। তোঁহারা শপথ লিহ—ঠাকুর কুন্দন সিং হামলোগঁনকা আন্ধেরি জিন্দেগীমে যো নয়ি দিয়া জ্বলা দিহল্অ, উস রোশনী দিকে দিকে ছোটে! শপথ লিহ, এ রোশনী কভু না বুতে—কোই না বুতায়—কভু না, কভু না!

সভা স্তব্ধ। জনতা স্তব্ধ।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অশিক্ষিত উৎপীড়িত নির্যাতিত দরিদ্র আর নিচু জাতের মানুষদের বুকের তলায় হাজার বছরের অন্ধকার জীবনে এক বিচিত্র আলোকপাত হয়ে গেল বুঝি। মুখোশ-পরা অন্ধকারের হিংস্র শাবকরা সচকিত ভয়ার্ত। এই আলোর ঘায়ে তারা পালাবার পথ খুঁজছে।

তারা নিঃশব্দে পালাচ্ছে।

ব্রিজমোহনেরা পালাচ্ছে। জনার্দন পূজারীরা পালাচ্ছে। মহাদেবও প্রসাদরা পালাচ্ছে! জগদেও মিশিররা পালাচ্ছে। বাবুয়ারা পালাচ্ছে।